মহামনীষী

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

অদীনপুণ্য, তাত্ত্বিক, সাধক ও বিবিধ বিদ্যাপারঙ্গম মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের জীবনচরিতের প্রারম্ভভাগে সংযুক্তির জন্য আমাকে ভূমিকা লিখিতে আহ্বান করা হইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়। সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহার মনস্বিতার আলোকে প্রদীপ্ত, যিনি তত্ত্ব ও সাধনার শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় মুমুক্ষু ব্যক্তি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিত শুধু চরিতকথা নহে, তাহা 'চরিতামৃত'। সেই অমৃতসরোবর হইতে অঞ্জলি ভরিয়া অমৃতবারি আহরণ করিয়া আমিও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে ভূমিকা লিখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রথমেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রাখি। তাঁহাদেরই আনুকূল্যে একটি পুণ্যক্ষেম শুভ মুহূর্তে দিব্য পুরুষীয় অন্তরে স্পর্শ লাভ করিয়াছি।

ইংরেজীতে জীবনচরিত-সংক্রান্ত দুইটি শব্দ আছে, একটি Biography, অপরটি Hagiography, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনকথা এবং সন্তচরিত্র। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাহিনী তথ্যসঙ্গতরূপে বিবৃত করিয়া আলোচ্য ব্যক্তির প্রতীতিগম্য জীবনকথা রচনা করিতে পারিলেই জীবনীকার প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। কিন্তু সাধক-জীবনী স্বতন্ত্র ব্যাপার। অলৌকিকতাই এই জীবনচরিতের মূল উপাদান, পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত লোকোত্তর উপলব্ধি এই সন্তসাধকজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আনন্দের কথা, মহামহোপাধ্যায়ের জীবনীকার এই দুই দিকেই পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। লৌকিক অলৌকিক, স্থূল ভূতপঞ্চক ও সূক্ষ্ম তন্মাত্র, অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা—এই সমস্ত বিরোধ ও বিরোধাভাসের মধ্যে সমন্বয়দর্শন সম্ভব না হইলে শ্রীমৎ গোপীনাথ কবিরাজের বিচিত্র জীবনকথা এবং ততোধিক বিচিত্র তত্ত্বসাধনার গভীর ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা দুরূহ। এই বিষয়ে জীবনীকার অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে দুই প্রান্তের মধ্যে সেতু রচনা করিতে পারিয়াছেন। অনেক সময়ে ভক্তি-রসার্দ্র দৃষ্টির দ্বারা গুরুর চরিত্রচিত্র আলোচনা করিতে হইলে ভক্ত-শিষ্য-অনুরাগী লেখক ভক্তিভাজন মহাপুরুষের যথার্থ স্বরূপ ধরিতে পারেন না। কখনো অতিপরিচয়-জনিত তথ্যাদি হারাইয়া যায়, কখনো-বা অধ্যাত্ম সাধনার নিগূঢ় সংকেত জীবনীকারের চিন্তা-চেতনায় ততটা পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, যিনি এই জীবনগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি তটস্থ লক্ষণে নির্লিপ্ত মানসিকতার অধিকারী হইয়া গোপীনাথের জীবনরহস্যের যথাস্থানে আলোকপাত করিয়াছেন, কারণ তিনি মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় সত্তার সান্নিধ্য লাভ করিয়াও আলোকচ্ছটায় বিভ্রান্ত হন নাই। যিনি যথাস্থানে যথাবস্তুকে দর্শন করিতে পারেন তিনি স্থিতধী।

বস্তুতঃ জীবনী রচনা অতি দুরূহ ব্যাপার, বিশেষতঃ গোপীনাথের মতো সিদ্ধ সাধকের জীবনকথা উপস্থাপনা। আচার্য গোপীনাথ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার গুরুর জীবনী 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসংগ'-এর ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "জীবনচরিত রচনা বড় কঠিন জিনিস; কঠিন কেন, বোধ হয় একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজনের জীবন আর একজনে ঠিক ঠিক বুঝিয়া লিখিতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। নিজের জীবন নিজেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না, অন্যে তাহার কতটুকু বুঝিবে!...জীবনের চরমতত্ত্ব যেখানে রহস্যময়, সেখানে জীবনচরিত রচনার ব্যর্থ প্রয়াস উপহাসাস্পদ।" কিন্তু মহাপুরুষের জীবন-চরিত না হইলেও আমাদের চলে না, কারণ তাঁহার জীবনের মধ্য হইতেই আমরা আত্মার খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করি। মাটির আমে আমত্ব উদ্দীপিত হয়, হয়তো রসাস্বাদের সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু আমাদের জীবনীলেখক রসাস্বাদের প্রতি আমাদের চেতনাকে উন্মুখ করিয়াছেন, এই স্থানেই তাঁহার কৃতিত্ব। বাংলা ১২৯৪ সালের ২২ ভাদ্র (ইং ১৮৮৭, ৭ সেপ্টেম্বর) গোপীনাথের জন্ম হয়। মর্তজীবন সমাপ্ত হয় ১৯৭৬, ১২ জুন। আর পাঁচটি শিশু ও বালকের মতো তাঁহার পৌগণ্ড-জীবন অতিবাহিত হয়। পাঠে অদ্ভুত আকর্ষণ, বিচিত্র জগতের প্রতি উন্মুখ জিজ্ঞাসা, শিল্প-সাহিত্য-কাব্যপ্রীতি প্রভৃতি পার্থিব ব্যাপারের প্রতি তাঁহার প্রথম জীবনে আদৌ কোনপ্রকার অনীহা ছিল না। রোগে ভুগিয়া, কখনো আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। জ্ঞানের প্রতি ছিল অতন্দ্র নিষ্ঠা, রোগজীর্ণ শরীরেও যাহা স্তিমিত হইয়া যায় নাই। বিচিত্র জীবনের ঘাটে ঘাটে ভিড়িয়া তিনি প্রথম যৌবনেই ভূয়োদর্শী হইয়া উঠেন; ঢাকা, কলিকাতা, জয়পুর, বারাণসী ঘুরিয়া চলে তাঁহার পথপরিক্রমা। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা—উভয় বিদ্যাই তাঁহার হস্তামলকে পরিণত হইয়াছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জ্ঞানবিতরণ তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। ক্রমে তিনি ভারতদর্শন, তন্ত্র, যোগ, অদ্বয়তত্ত্ব, পরিশেষে তান্ত্রতত্ত্বে নিষ্ণাত হইয়া বারাণসীধামে সাধনকেন্দ্র নির্বাচিত করেন। তিনি তাত্ত্বিক ও সাধক, শুধু জ্ঞানাহরণই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত তিনি ভূরিপরিমাণে রচনা করিয়াছেন, বহু আলোচনা করিয়াছেন, বহু গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, কত পত্র-পত্রিকায় এখনো তাঁহার বহু প্রবন্ধ ছড়াইয়া রহিয়াছে। শিক্ষাদান, তত্ত্বোপদেশ বিতরণ, সাধনভজন, আবার তাহার সহিত সংসারযাত্রা নির্বাহ করা, তাঁহার ন্যায় বিচিত্র প্রতিভাধর পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। জীবনীকার তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন, সাহিত্যসাধনা, তত্ত্বসাধনা ও মহাপুরুষ-প্রসংগ সম্পর্কে বস্তুগত আলোচনা করিয়া কয়েকটি স্তর-পরম্পরায় গোপীনাথের জীবনকথা বিন্যস্ত করিয়াছেন। কোন তথ্য, বাস্তব উপাদান, ঘটনা—কিছুই বাদ পড়ে নাই। আবার অপরদিকে তাঁহার তত্ত্বসাধনা সম্বন্ধেও সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। সাধককে প্রথমে জগৎপ্রসবিনী আদিভূতা জননীকে দ্বৈতভাবের দ্বারা হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পর "জ্ঞানের পরিপূর্ণ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যময় অখণ্ড

অদ্বৈতে সব পর্যবসিত হয়।" দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের পরম সামরস্যসম্ভূত একীকরণ সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। সেই বাক্যমনের অগোচর দিব্যানুভূতিতে জীবের সর্ববিধ দ্বৈতের অবসান হয়। কিন্তু সত্যই কি বোধিসত্তার উর্ধ্বতর স্তরে উঠিয়া জীবের পক্ষে 'কেবলাত্মা' হওয়া সম্ভবপর? যে আদি জননী, যিনি সমগ্র সৃষ্টির আধার, জীব তাঁহার ঋণ শোধ করিয়া নির্বিকল্প নিষ্কলত্ব লাভ করিবে, এত সহজে আদ্যাশক্তির ঋণ পরিশোধ করা যায় কি? এই সম্পর্কে ক্রান্তদর্শী গোপীনাথের এই উক্তিটি আলোকবর্তিকার মতো চিত্তের অন্ধকার দূরীকরণে সমর্থ, "আমার সবই মা হতে—আদ্যাশক্তি হতে। তাঁর ঋণ শোধ বলে আমার কিছুই ত থাকিল না। শুধু আমিও নাই। কারণ, তাও আদ্যাশক্তি-প্রসূত। মাতৃঋণ শোধ মানে আমি মা-তে ফিরিয়া গেলাম—ভিজলভূড্ হলাম। মা ত চিরনির্বাণেই আছেন, তাই আমিও নির্বাণ পেলাম। কিন্তু তবু মার কোলে শুইয়া। মাকে না ধরিয়া হয় না।" এই উক্তির গূঢ় মর্মার্থ সাধকই অবধারণ করিতে পারিবেন, পুঁথিপড়া বিদ্যায় (যাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'মতুয়া' বুদ্ধি) কুলাইবে না। এই বাক্‌পথাতীত অনুভূতি শুধু স্বসংবেদনগম্য। আকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত, জীব-ব্রহ্ম, শিব-শক্তি, প্রকৃতি-পুরুষের দ্বিদল বীজপত্র যখন নাম-রূপ-আকার-আয়তন অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বমূল অধঃশাখ পিপ্পলী বৃক্ষের জন্ম দেয় তখন কে তাহার পত্রপল্লব গণনা করিবে? গোপীনাথ সেই তরুবরের সন্ধান জানিতেন, তাহার স্বাদু ফল আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। তদ্রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিবে। ভক্ত ও মুমুক্ষু নিজ নিজ প্রকৃতি ও কুলধর্মানুসারে তাহা হইতে 'ঋত'পথ বাছিয়া লইবেন। জীবনীকার সেই ইচ্ছায় যোগিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। ইহাতে অনেক গুরুতর তত্ত্বকথা আছে, আছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাধনার নানা প্রসঙ্গ। কিন্তু সহজ রচনার গুণে অতি-দুরূহ আলোচনাও অনধিকারীর পক্ষে সহজগম্য হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, সীমিতশক্তি বাংলা ভাষায় দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও অধ্যাত্ম মার্গীয় ব্যাপারসমূহ ব্যাখ্যা করা যায় না, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে লক্ষ্য করিবেন, লেখার গুণে, পরিচ্ছন্ন ভাবাপ্রবাহে বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বকথাও কতটা রসসিক্ত হইতে পারে এবং বাংলা ভাষার প্রকাশশক্তি কতটা সুপ্রসর। পাঠক-পাঠিকাগণ এই অমৃত-উৎস হইতে প্রাণ ভরিয়া নিত্যানন্দ রসধারা পান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
১৩৮৮ ॥ ১৯৮২

প্রাক্ কথন

সে আজ অনেক দিনের কথা। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের কাছে বসে প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয়ম্ নামে কাশ্মীর শৈবাগমের একখানা গ্রন্থ তখন পড়ছি। আবার এক এক দিন পর যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যও পড়ছি। তখন গরমকাল, সকাল ৮-৩০টায় তাঁর সিগ্‌রার বাসভবনে পৌঁছতাম। কখনো দেখতাম তিনি সামনের পুজোর ঘরে তখনো রয়েছেন। আমরা বসতাম তাঁর বসার ঘরে। যখন কোনো দিন একটু পরে পৌঁছেছি দেখতাম উনি হয়ত কোনো বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, আমাদের পড়াবার বইটা কাছেই রয়েছে। তখন সে বই বাজারে ছিল দুর্লভ, তাই হাতে লেখা বই দেখে আমি পড়তাম, ওঁর বইখানা ছিল ছাপা বই। সে সময় তাঁকে দেখেছি সুস্থ—যদিও তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে, কিন্তু শরীরে তখনও কোনো ক্লান্তি ছিল না—কথা বলায়, অনর্গল পাঠ দেয়ার কিম্বা গম্ভীর ও রমণীয় রহস্য কথার উন্মোচনে।

আমার হাতে ঐ গরমকালটায় সময় থাকত অফুরন্ত, কিন্তু জুলাই এলেই আসত কাজের ভার। গরমকালে দুবার যাতায়াত চলত। কেবল কাজের দিন ছাড়া। রবিবার আর ছুটির দিন অবশ্য গুরুজীর কাছে যেতাম। রবিবার ছুটির দিন বলেই আরো অনেক জিজ্ঞাসুর ভিড়ে আমার পাঠ নেওয়া অনেক সময় এগোতে পারত না, তা হলেও যে জিজ্ঞাসু যা কিছু তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করতে তাতেও আমার মনের ক্ষোভ দূর হত। সারা সকালটা আচার্যদেব ব্যস্ত থাকতেন জিজ্ঞাসু জনের প্রশ্নের উত্তরদানে। নানা গবেষক বিদ্যার্থী তাঁর কাছে আসতো কখনো তথ্য জানতে, পাঠ নিতে আবার কখনো নানা নির্দেশ, যেমন কোন্ কোন্ বিশেষ গ্রন্থ পড়তে হবে, কোন্ বিশেষ ধারাকে যথাযথ জানতে হলে কি কি বই পড়া দরকার মুখে মুখেই সব বলতেন। ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকলে লিখিয়ে দিতেন সব বইয়ের নাম।

অনেক সময় যে সব বইয়ের নাম করতেন তা যদি আমার চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে যেত মনে মনে আমিও সে সব বই এক সময় পড়ব বলে স্থির করতাম। তখন মনে হত আচার্যদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন, ভারতীয় দর্শনের সব ধারা, তন্ত্র ও আগমের দৃষ্টি, ভারতীয় রসশাস্ত্র ও অলঙ্কার, বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনার সব বিষয় পরম শ্রদ্ধায় অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করেছেন। শুধু আয়ত্তই করেন নি সব বিষয়ে এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টিও অধিগত করেছেন। তাই মনে হত তিনি যা বলেন তা যেন বিদগ্ধজনের সূক্ষ্ম বিবেচনই নয়। তা হল সহৃদয় জনের রস আস্বাদন, যে আস্বাদন তিনি একাই করেন না অন্যকেও সেই রসের অপূর্ব স্বাদ গ্রহণে উন্মুখ করে তাকে

চমৎকার রসে আপ্লুত করেন। কখনো তিনি আগম ও শাস্ত্র সিদ্ধান্তের মর্ম কথা অনায়াসে বিবৃত করতেন, আবার কখনো মধ্যযুগের সন্তদের কথা ও তাদের সাধন রহস্য ঐরূপ সরল ভঙ্গীতে বলতেন। তখন মনে হত ওঁর কাছে দিনের পর দিন বসে থাকি, কিন্তু এত সময় আমার তো নেই।

পূজার সময় কলকাতা থেকে বহু লোক কাশীতে আসত, এখনও আসে। তাদের মধ্যে কিছু লোক আচার্য দেবের কাছে আসত নানা প্রসঙ্গ নিয়ে। এদের মধ্যে আমার দুজন বন্ধু শ্রীজগদীশ্বর পাল ও শ্রীবারীন চৌধুরী মহাশয় আচার্যদেবের কাছে দু-একবার যাতায়াতেই আমার পরম প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। ওঁরা গুরুজীর কথা, তাঁর প্রতিদিনের দেওয়া তত্ত্ব প্রসংগ কিভাবে চলে তা জানতে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ওঁরা কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে বললেন আমি কেন গুরুজীর কাছে প্রতিদিন আসি না। তা হলে গুরুজীর কথা চিঠির মাধ্যমে জানার সুবিধা হবে। আমার একথা শুনে মনে হল এবার থেকে তাই হবে। যদি সন্ধ্যা ৮টার পরও হয় তবুও আমি আসব।

তারপর আরম্ভ হল প্রতিদিন রাতে যাওয়া। সে সময়টায় অর্থাৎ প্রায় নটায় ভিড় থাকত কম। গুরুজী পাঠ দিতেন এবং তত্ত্ব প্রসংগ করতেন আমার প্রশ্ন শুনে। কখনো বলতেন—তুমি হয়ত ভুলে যাবে এবার থেকে সব লিখে নাও। ভবিষ্যতে মননে কাজে লাগবে।

লিখতে লিখতে যখন হাত ব্যথা করত তখন প্রসংগ বদলে ও'র জীবনের কথা জানতে চাইতাম—ও'র ছোটবেলার কথা, লেখাপড়া, জীবনের নানা বিপর্যয়। ঢাকা জয়পুর ও কাশীর জীবন কখনো বিস্তৃতভাবে আবার কখনো সংক্ষেপ ইঙ্গিতে সব বলতেন। তবে ভালবাসতেন তাঁর শ্রীগুরুর কথা উঠলে, সে সবও বলতেন; বিভূতির প্রদর্শন কিভাবে হত তা বলে একটি বিশেষ বিভূতি কেন প্রকাশ পায় তাও বলতেন।

আমার মনে একটা সংকল্প ছিল ও'র জীবন কথা লিখি। মনে সাহস ছিল কম, ও'র মত মণীষীর জীবনী লিখবার যোগ্যতা আমার কোথায়, তাই কি বলে এই সংকল্পের কথা বলি। একদিন সাহস করে কিছু বলতেই বললেন—তুমি যদি সত্যিই লিখতে চাও তাহলে ধীরে ধীরে কিছু নোট নাও। এই বলে একটা বড় খাতা আমাকে এগিয়ে দিলেন। আমি সেই খাতাটি দেখে প্রয়োজনীয় অংশ লিখে আবার তা ফিরিয়ে দিই বেশ দীর্ঘকাল পর।

তাতে আছে জীবনের প্রথম অংশ থেকে জয়পুর পর্যন্ত নানা ঘটনার বিবরণ, অনেকটা দিনপঞ্জীর মতো।

আচার্যদেবের জীবন কথা লিখতে গিয়ে তাঁর লিখিত দিনপঞ্জী আমাকে বহু অংশে পথ নির্দেশ করেছে, আবার আমার স্বলিখিত দিনপঞ্জী, যা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে এবং শেষ হয়েছে ১২ই জুন ১৯৭৬ সালে, তা থেকে অনেকটা পথের ইঙ্গিত পেয়েছি। এই মহাজীবনকে জানতে পারি এমন যোগ্যতা আমার নেই, তবুও বাইরের জীবনের যে রূপ তা তথ্যনির্ভর

বলে তাঁর নিজের লেখা থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো সাজিয়ে জীবন রচনায় ব্যবহার করেছি।

জীবনের যে দুটো স্তর সাধারণতঃ লক্ষিত হয় তার একটি বহির্জীবন এবং অন্যটি অন্তর্জীবন। তিনি শৈশব যৌবন প্রৌঢ় অবস্থা যখন পার করেছেন আমার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত সেদিন থেকে। তখন তাঁকে দেখেছি আচার্যরূপে, পরমার্থ প্রসঙ্গে তিনি তখন মুখর। সে সব তত্ত্বের কিছু সেদিন বুঝি, বেশীটাই থাকে বুদ্ধির অগোচর। তারপর আরো যখন ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তখন দেখি তিনিও আরো কত মানুষের মতো কত পথ হেঁটেছেন—সাধারণ মানুষের মতো নানা বাঁকা পথ পরিহার করে, সরল পথে এক ধ্রুব বিন্দু লক্ষ্য করে। সৎপ্রসঙ্গ ও সাধুজীবন যেমন সেদিন ছিল এক বিন্দু লক্ষ্য করে। সৎপ্রসঙ্গ ও সাধুজীবন যেমন সেদিন ছিল এক পরম লক্ষ্য তেমনি লৌকিক জীবনে তাঁর কেমন তাও জানা জানতে আগ্রহী হলে কত বিস্তারে তা বিবৃত করতেন। নিজের স্মৃতি থেকে তার কিছু কিছু সংগ্রহ করে এই মহাজীবন রচনায় প্রয়াস করেছি। তাঁর জীবনের অধ্যাত্ম দিক্ আমার ধারণায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে গ্রন্থের অন্তিম অংশে তার বিবরণ দিয়েছি।

যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আচার্যদেবের জীবনকথা লিখতে অনুরুদ্ধ হই তখন আমার কাছে যে তথ্য সংগৃহীত ছিল তা নিয়ে এগিয়ে চলি। ক্রমশঃ আচার্যদেবের নানা সময়ের রচিত বিভিন্ন রচনা ও বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা অধ্যয়ন করতে থাকি। কোন কোন সংস্করণ যা আচার্যদেব লিখেছেন থেকেও জীবন চরিত্রের উপাদান সংগৃহীত হয়। তাঁর জীবনকালে বাংলার লেখক সুশীল রায় সংকলিত গ্রন্থ 'মনীষী জীবন কথা'য় আচার্যদেবের স্বল্প পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণে আচার্যদেবের মনীষার পরিচয় অল্পই প্রকাশ পেয়েছে। অন্য একটি গ্রন্থ 'মনীষী কী লোকযাত্রা' আচার্যদেবের শ্রুতলেখে লব্ধ ও হিন্দীতে রূপান্তরিত এবং ডঃ ভগবতীপ্রসাদ সিংহ কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। তাতেও আচার্যদেবের পূর্ণ পরিচয় স্বতঃই অনুদ্‌ঘাটিত। মাত্র ৫০ পৃষ্ঠার বিবরণে যে জীবনালেখ্য সেখানে উপস্থিত তাতে তাঁর জীবনের সব দিক অনুদ্‌ভাসিত বলে আমার মনে হয়। ঐ গ্রন্থে আচার্যদেব লিখিত বহুমূল্য পত্র, সাধুদর্শনের বিবরণ, তত্ত্বকথা নামক নিবন্ধে আছে; আছে পরলোক প্রসঙ্গ কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মনে আচার্যদেবের যে ভাবমূর্তি আজও বিরাজমান তা যেন সেখানে অনুপস্থিত। গ্রন্থটি আবার হিন্দী ভাষায় রচিত বলে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে স্বভাবতঃই উপেক্ষিত।

যে সময় উক্ত গ্রন্থটি রচিত হতে থাকে তখন থেকেই আমার মনে আচার্যদেবের একটি সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করার সংকল্প জাগে।

বর্তমান জীবনীটি আমি যেভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে আচার্যদেব চিরজীবন ছিলেন জ্ঞানতপস্বী।

তাঁর যাত্রা একদিন জ্ঞানলাভের তীব্র অভীপ্সা নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল যা অশেষ জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করে মননে সমৃদ্ধ হয়ে জীবনকে জ্ঞানমণ্ডিত করেছিল। তাঁতে একদিন ছিল অন্বেষণের তীব্র আকাঙ্খা যা পরিপূর্ণতা লাভ করে নানাবিধ সাধুসংগমে—দর্শন শাস্ত্র ও সাধনরহস্যের অবিরত মনন ও অনুধ্যানে। জ্ঞানের শিখরে আরোহণে যে নিরন্তর শ্রম ও আয়াস স্বীকার আবশ্যক তা তিনি অনায়াস ধৈর্য স্বীকার করে, শারীরিক ও মানসিক বাধা অতিক্রম করে সেই শীর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। সেই শৈলশীর্ষ থেকে জীবনকে দেখেছিলেন নিজ স্বরূপ থেকে অভিন্নরূপে, তাই কোনো জীবনই তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না, কোথাও নিন্দনীয় ছিল না। তিনি পরম বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় সকলকে গ্রহণ করতে পারতেন বলে সবই সুন্দর ও সুষমায় মণ্ডিত বলেই মনে হত।

আমাদের পরম সৌভাগ্যে তাঁর আচার্যরূপ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। শাস্ত্র যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে তাতে বিরাজিত ছিল। দর্শন ও সাধনা অঙ্গাঙ্গিভাবে ধারণ করে তাঁর স্বরূপকে স্বতঃই উদ্ভাসিত করত। তাঁর গৃহ হয়েছিল পরমরমনীয় আশ্রমতুল্য—সেই পরিবেশ দেখে মনে হত—এই বুঝি সংসারতাপবিচ্ছেদ কুশল বিচিত্র ছায়ায় সুনিবিড় শান্তির নিকেতন। যেখানে সদাই সকলের জন্য দ্বার অবারিত—এমন কি রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরেও। সেখানে আছে পিতার প্রসন্নতা, আচার্যের অসীম স্নেহ, যুগ যুগ-সঞ্চিত-অন্ধকার-বিদারী ভাস্বর জ্যোতির ইসারা।

একদিন যিনি ছিলেন বিশ্বের অশেষ জ্ঞানভাণ্ডারের অন্বেষক তিনি কিভাবে লৌকিক জীবন উত্তরণ করার পর পরমার্থ পথ গ্রহণ করেছিলেন এবং তারও পর ঐ পরমার্থ তাঁর একক সাধনায় আয়ত্ত করে জগজ্জনের নিকট অনায়াসলভ্য করে তুলতে পারা যায় সেই সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন আমরা তাঁর জীবনালেখ্যে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার এই প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে সহৃদয় পাঠক তার বিচার করবেন।

আমার এই প্রয়াসে পরম সহায়ক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, তথা শ্রীজগদীশ্বর পাল মহাশয়, এস্টেট এ্যাণ্ড ট্রাস্ট অফিসার, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। এঁদের সাগ্রহ সহযোগ ভিন্ন এই দুরূহ কার্যে আমি সাহসী হতাম না। আমি এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে ধন্যবাদ দিই কলিকাতাস্থিত টেম্পল প্রেসের কর্মীবৃন্দকে। তাঁরা যে সযত্ন শ্রমে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করেছেন তা শুধু সম্ভব হয়েছে আচার্যদেবের প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধার ফলে।

কাশী বসে প্রুফ দেখার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে কোথাও কোথাও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে। শুদ্ধিপত্রে যথা সম্ভব সে ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হল।

কাশী
অন্নপূর্ণা পূজা
১৪ই চৈত্র, ১৩৮৮

হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

বংশ পরিচয়, বাল্য জীবন ও প্রারম্ভিক শিক্ষা

বংশ পরিচয়

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের জীবনকথা বহু বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশে রমণীয় নয়। তাঁর জীবন একজন মণীষীর ও সাধকের। এই জীবন নানা ভাব ও ভাবনার স্তর অতিক্রম করে নিজের কালের বহু মণীষী ও সাধকের সম্পর্কে এসে ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করেছে এবং পরিশেষে এক দিব্যজীবনের স্পর্শে পবিত্র এবং জ্ঞান ও ভক্তির পরম সামরস্যে মহিমান্বিত হয়েছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইলের নিকটবর্তী দান্যা কবিরাজ মহাশয়ের আদি বাসভূমি। এ'দের কৌলিক পদবী বাগচী। কুলপঞ্জী দেখে জানা যায় যে এই কবিরাজ বংশের আদিপুরুষ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ যিনি কুলপঞ্জীর মতে বঙ্গদেশে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম। আমরা বেণীসংহার নাটকের রচয়িতারূপে যে ভট্টনারায়ণের দেখা পাই তিনিই এই ভট্টনারায়ণ কিনা নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের বিচারে ৪৩০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১০৬৩ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আনেন। এই ঘটনার কাল কারও কারও মতে আরও পূর্বের।

বংশতালিকা অনুসারে আচার্যদেব ভট্টনারায়ণ থেকে অধস্তন চত্বারিংশত্তম (৪০) পুরুষ। এই বংশধারায় ত্রয়োদশ পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর দুই পুত্রঃ জয়সাগর ও বিন্দুসাগর যথাক্রমে বরেন্দ্র ও রাঢ়ভূমিতে বাস করার দরুণ বারেন্দ্র ও রাঢ়ী আখ্যা পান। তারও অনেক পরে সুখাই নামক পূর্বপুরুষের তিন পুত্র পূর্ব বাংলার তিনটি বিভিন্ন গ্রামে নিজেদের বাসস্থান নির্বাচন করেন। ঐ তিনজনের মধ্যে যাঁর নাম মনাই তিনি বোয়ালজানি গ্রামে, শ্রীপতি গেলেন শিমুলিয়ায় এবং তৃতীয় গোপাল গেলেন গয়নাকান্দিতে। এই তৃতীয় গোপালের ধারাই আচার্যদেবের।

তারপর কোন এক সময় পরবর্তী কোন এক পুরুষ দান্যা গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। এটি কবেকার ঘটনা বলা কঠিন। যে পূর্বপুরুষ দান্যায় আসেন তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবীণ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন দু ভাই, হরিদেব ও রঘুদেব, যখন তাঁরা ঐ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন তখন পলাশীর যুদ্ধের কাল (১৭৫৬ খৃঃ)। মনে হয় ঐ সময়ে তাঁদের বয়স ৪০/৪৫ বছর।

আচার্যদেব বলতেনঃ 'অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আমাদের কৌলিক পদবী

পরিবর্তিত হইয়া কবিরাজ হইল কিরূপে? প্রশ্নটি আমার মনেও উঠিয়াছে। আমাদের বংশে অনেক সুদক্ষ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক জন্মিয়াছেন। পিতামহ চন্দ্রনাথ কবিরাজ তো একজন যশস্বী ও নিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। অনুমান করা হয় আমার পূর্বপুরুষগণ এই পদবীটি নবাবী আমলে প্রাপ্ত হন এবং গুণের পরিচায়ক এই পদবীটি ব্যবহার করিতে থাকেন এবং কৌলিক পদবী উহ্য থাকে। যদিও আমার পিতামহ এই বংশের অন্তিম চিকিৎসক ব্যবসায়ী, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ঐ কবিরাজ পদবীটি ত্যাগ করি নাই, আমার বংশ-ক্রমে এখনও এটি চলিতেছে।'

আচার্যদেবের মাতামহ হরিশ্চন্দ্র রায় মৌলিক ঢাকা জিলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামের নিবাসী ছিলেন। তাঁর দুই বিবাহ। তাঁর প্রথমা পত্নীর গর্ভে জাত সন্তানদের কনিষ্ঠা ছিলেন আচার্যদেবের মা সুখদাসুন্দরী। ঐ ধামরাই গ্রামের আদি নিবাসী পূর্বোক্ত রায়মৌলিক বংশ। ঐ গ্রাম নামে গ্রাম হলেও ছোট নগর বলেই মনে হত। শ্রীশ্রীযশোমাধবদেবের অধিষ্ঠান ভূমি বলে গ্রামটি পূর্ববঙ্গে তীর্থের মর্যাদা পায়। আচার্যদেবের মাতুলবংশীয়গণ এই বিগ্রহের পূজকরূপে বিশেষ সম্মান পেতেন। জগন্নাথধামের অনুকরণে এখানে সেবা পূজা ও উৎসব সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং পুরীর মতোই এখানে ভোগের প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হত। এখানকার প্রসিদ্ধ উৎসব রথযাত্রা। এই উপলক্ষে লক্ষ মানুষের সমাগমে ও কলকোলাহলে গ্রামটি মুখরিত হয়ে উঠত। রথটি বিশালাকার—৬৪টি এর চাকা, আয়তনও বিরাট। যশোমাধবের নয়নাভিরাম ঐ মূর্তিটি আচার্যদেবের কোনো পূর্বপুরুষ রামজীবন রায়-মৌলিক বাংলা ১০৩৯ সালে অর্থাৎ ইং ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় থেকেই ঐ বংশের সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

আচার্যদেবের পিতামহ চন্দ্রনাথ কবিরাজ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। সুপ্রশস্ত বাসগৃহের সংলগ্ন জমিতে কয়েক ঘর প্রজা, চারদিকে ফলের বাগান ও পুকুর, বার মাসে নানা উৎসব গৃহে সম্পন্নতার পরিচয় জ্ঞাপন করত।

পিতা বৈকুণ্ঠনাথ বাল্যকালে পিতৃহীন হন, তখন তিনি পাশের গ্রাম সন্তোষের জাহ্নবী স্কুলে পড়তেন। হঠাৎ পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হন, তখন পিতার মাতুল কালাচাঁদ সান্যাল ভাগিনেয়কে নিজগৃহ মীর্জাপুর কাঁঠালিয়ায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর ভরণ পোষণ ও লেখা-পড়ার সব ভার গ্রহণ করেন। এখানে আসার পর বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে পৈতৃক বাসভবনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। যে বিষয় আশয় ছিল তার দেখাশুনোর ভার সান্যাল মহাশয় আচার্যদেবের কোনো জ্ঞাতির হাতে সমর্পণ করেন। কখনো মনে হলে দু-একদিনের জন্য বৈকুণ্ঠনাথ মাতুলের সঙ্গে গ্রামে যেতেন। কালা-চাঁদ সান্যাল মহাশয়ের সন্তান না থাকায় তিনি বৈকুণ্ঠনাথকেই পুত্রের অধিক বাৎসল্যে পালন করতেন। ভেবেছিলেন ভাগিনেয়ের হাতে নিজের যা কিছু বিষয় আশয় দিয়ে যাবেন। মাতুল ছিলেন বিগতপত্নীক।

পিতা বৈকুণ্ঠনাথের জন্ম ১৮৬০/৬১ সালে। তাঁর বিবাহ হয় ১৮৭৬ সালে সান্যাল মহাশয়ের আগ্রহ ও উদ্যোগে ধামরাই মৌলিক বংশে। তারপর তাঁকে ঢাকায় জগন্নাথ স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়। ধামরাই গ্রামে সুপরিচিত অনাথবন্ধু মৌলিক ঐ স্কুলের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথের শিষ্য এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কৃপাভাজন ছিলেন। এরূপ সজ্জনকে অভিভাবক পাওয়ায় মাতুল কালাচাঁদ নিশ্চিন্ত ছিলেন। ঐ জগন্নাথ স্কুলের প্রধান পণ্ডিত রজনীকান্ত আমিন ছিলেন এক বিশিষ্ট বিদ্বান। তাঁর রচিত 'প্রকৃতিরহস্যম্' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ বৈকুণ্ঠনাথের গ্রন্থসংগ্রহে ছিল।

আচার্যদেবের মা সুখদাসুন্দরীর জন্মকালেই তাঁর মার মৃত্যু ঘটে, এ অবস্থায় শিশুর প্রাণরক্ষায় বিশেষ সমস্যা দেখা দেওয়ায় কন্যার পিতা ধামরাই গ্রামের কায়েতটোলার এক বিশিষ্ট পরিবারে কন্যাটির লালনপালনের ভার অর্পণ করেন। ঐ পরিবারের এক বিধবা রমণী বামাসুন্দরী শিশুকে গ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য, কিন্তু যেভাবে তিনি ঐ কন্যাকে প্রতিপালন করেন তা সর্বদা দৃষ্টিতে পড়ে না। তাঁর পুত্র মহিম অল্প দিন পূর্বে দেহ-ত্যাগ করেছে। হৃদয় কাতর ছিলই, ভাবলেন, শিশুকে গ্রহণ করে শোক ভুলবেন। তাঁর ছোট মেয়ে তখন শ্বশুরগৃহে, জামাতা কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী ময়মনসিংহ শেরপুরে তারামণি চৌধুরাণীর জমিদারীতে কাজ করতেন। এই শেরপুরকে তখনকার দিনে দশকাহানিয়া শেরপুর বলা হত, কেননা সেখানে যেতে হলে যে নদী পার হতে হত তাতে খরচ লাগত দশ কাহন। আরো একটা শেরপুর আছে বগুড়া থেকে অল্প দূরে। ভুল না হয় তাই এই নামের বিশেষণ।

বামাসুন্দরী শিশুকে নিজের স্নেহের আশ্রয়ে গ্রহণ করার পর তাঁকে কোনদিন মায়ের অভাব বুঝতে দেন নি। আচার্যদেব তাঁর মার মুখে শুনে-ছেন এবং নিজেও দেখেছেন এই সদাশয়া মহিলার স্নেহ এবং নিজেও বহুকাল এঁরই স্নেহচ্ছায়ায় কাটিয়েছেন। মাতামহ হরিশ্চন্দ্রও সময় সময়ে এসে কন্যার খোঁজ খবর নিতেন। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন যার প্রথম সন্তান নিখিলেশ্বর। এক সময় তিনি দেশের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েন, যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি সাধু হয়ে যান এবং ভোলানন্দ গিরির শিষ্য হয়ে বহু সেবা কার্যে অগ্রণী হন।

আট বছর বয়সে বামাসুন্দরী পালিতা কন্যা সুখদাসুন্দরীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যোগাযোগ ঘটে কালাচাঁদ সান্যালের জ্ঞাতি ভাই হৃদয়নাথ সান্যালের মাধ্যমে। তিনি আচার্যদেবের মাতামহীর এক ভগ্নীকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ হৃদয়নাথ নিজ শ্যালিকার প্রেরণায় কালাচাঁদ

সান্যালের ভাগিনেয় বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে সুখদাসুন্দরীর বিবাহের প্রস্তাব আনেন এবং উভয় পরিবারের সম্মতিতে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

বৈকুণ্ঠনাথ এনট্রেন্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এফ-এ পড়তে যান ঢাকা কলেজে। থাকতেন দিক্‌বাজার মহল্লার কোন মেসে। সহপাঠী ছিলেন প্রসিদ্ধ রামদয়াল মজুমদার যিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অধ্যাপক রূপে নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর রচিত গীতারহস্য এবং ইংরেজী পুস্তকের নোট আচার্যদেবও পড়েছেন।

ঢাকা থেকে এফ-এ পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৈকুণ্ঠনাথ বি-এ পড়তে কলকাতা আসেন। প্রথমে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সী কলেজে, পরে কি কারণে জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে চলে যান এবং ১৮৮৫ সালে বি-এ পাশ করেন। অনার্স পান সংস্কৃতে; প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান পান তিনি; দ্বিতীয় হন বিধুভূষণ গোস্বামী।

তখনকার দিনে জেনারেল অ্যাসেম্বলীর খুব নাম—নামী অধ্যাপক ও নামী ছাত্র পড়ত সেখানে। দার্শনিক হেস্টি সাহেব এখানকারই অধ্যাপক ছিলেন। এঁরই সঙ্গে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের যে মসীযুদ্ধ হয়েছিল—সে ঘটনা অনেকেই জানেন। দার্শনিক বিদ্বান্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এখানকারই ছাত্র যিনি ১৮৮৪ সালে এম-এ পাশ করেন।

আচার্যদেব বলতেনঃ 'আমি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি যে আমার পিতা ও জানকীনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্রদের অন্যতম ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির), রামদয়াল মজুমদার এবং বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে যে মিত্রগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাতে বড় ছোট ভেদ ছিল না। তখনকার বিদ্বৎ সমাজে পিতার বিশেষ পরিচয় ছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পিতাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ, যেমন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা শশধর তর্কচূড়ামণি, ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে পিতার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। শুনেছি বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং সে যুগের নামী চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার পিতাকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন।'

এম-এ পরীক্ষার প্রাক্‌কালে বৈকুণ্ঠনাথ রক্ত আমাশয়ে পীড়িত হন। ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়। ডাক্তার সরকারও চিকিৎসা করেন। খবর পেয়ে গ্রাম থেকে ছুটে আসেন মাতুল কালাচাঁদ সান্যাল,* কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রক্ষা করা যায়নি। ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসে এই শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ—তাঁর মনে আশা ও কল্পনার যে বীজ ছিল তা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

এই দুর্ঘটনার ৫ মাস পরে ২২শে ভাদ্র ধামরাই গ্রামে আচার্যদেবের জন্ম হয় বামাসুন্দরীর গৃহে। কখনো কখনো আচার্যদেব বলতেন—'এ জীবনে আমার পিতৃসন্দর্শন ঘটল না। পিতার মৃত্যুর পর দাদামহাশয় পিতার ব্যবহৃত পুস্তক ও কিছু জিনিস একটি বাক্সে বন্ধ করে আনেন। বড় হয়ে সেগুলো ছিল আমার বড়ই আদরের।'

পিতার স্মৃতিচিহ্ন ছিল কতগুলো বই আর তাঁর ব্যবহার করা কিছু জিনিস। একটা অভাবের কান্না হয়ত কোথাও ছিল। কখনো হয়ত দেখা গেছে জীবনে পিতার স্নেহরস থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলে পিতার প্রসঙ্গ উপস্থিত হলে চোখের কোণে জলের রেখা দেখা না গেলেও, হৃদয়ে কান্নার একটা দীর্ঘশ্বাস হয়ত পড়ত।

এই দীর্ঘশ্বাসের প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা মনে পড়ে। জীবনের শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছেছেন তখন একটা চাপা কান্না তাঁর অজ্ঞাতে প্রকাশ পেত। এ কান্না ঘুমের মধ্যে শিশুর কান্নার মতো। যে সাধনায় তিনি ১৯১৮ সালে ব্রতী হয়েছিলেন সে ব্রত ছিল পরম বিচ্ছেদের মধ্যে পরম মিলনকে প্রাপ্ত করার সাধনা। ঐ সাধনায় বিচ্ছেদই বাস্তব, মিলন তখন অনেক দূরের। এখানে আছে শুধু কৃপাশূন্য কর্ম—শুধু নিরন্তর উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকা। হৃদয়ে আকুল কান্না যদি জাগেই তাহলে তাকে হৃদয়ে পোষণ করে এগিয়ে যেতে হয়। তাই কান্না সেখানে প্রকট নয়—তাই দীর্ঘশ্বাস। পিতার স্নেহরস হতে বঞ্চনায়ও হয়ত তাঁকে দুঃখ দিত। অবশ্য এ সবই আমার কল্পনা।

পিতা বৈকুণ্ঠনাথের আদি নিবাস ময়মনসিংহ জিলার দান্যা ধামে। গ্রামটি সন্তোষের জাহ্নবী চৌধুরাণী ও দীনমণি চৌধুরাণীর জমিদারীর এলাকার অতি নিকট। পরগণা কাগমারী। কাগমারী গ্রামটিও এরই কাছে। এখনও মনে পড়ে এর ঘরে ঘরে কাঁসারিদের বাস। নির্জন দুপুরে এর ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের পথে চলতে গেলেই শোনা যেত নানা কাজের শব্দ, কেউ কাপড় বুনছে, আবার কাঁসারিরা পেতল কাঁসার বাসন তৈরী করছে। একটি কর্মযজ্ঞ চলছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, বসে নেই কেউ। মনে হয় লক্ষ্মী পায়ে পায়ে চলতে চলতে এই সব গ্রাম, হাট ও গঞ্জে বাসা বেঁধেছেন। বাংলা ছড়ায় আমরা শুনেছিঃ

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর
তার মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর।
শিব গেলেন শ্বশুরবাড়ী
বসতে দিল পিঁড়ে,
জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে,

শালিধানের চিঁড়ে নয়রে
বিন্নি ধানের খৈ
বড় বড় সবরি কলা কাগমারি দৈ।

এই সেই কাগমারি। পূর্ব বাংলা পাকিস্তান হবার পর এই কাগমারিতেই মৌলানা ভাসানী সাহেব বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ হতে সেদিন বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি প্রেমিক সে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শস্যশ্যামলা নদীবহুল এই অঞ্চলে আচার্যদেবের পূর্বপুরুষের আগমন ঘটে।

কাঁঠালিয়া

আচার্যদেবের জন্ম ১২৯৪ সালের ২২শে ভাদ্র (ইং ১৮৮৭, ৭ই সেপ্টেম্বর) মাসে। তাঁর জননী তখন ধামরাই গ্রামে বামাসুন্দরীর গৃহে। পিতার আকস্মিক তিরোধানে মাতা সুখদাসুন্দরীর শরীর ও মন কিরূপ ছিল ভাষায় সে কথা প্রকাশ করা যায় না। আচার্যদেবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুতর অসুস্থ হন, বাঁচার আশা ক্ষীণ হতে থাকে। অবশেষে সাভারের সুচিকিৎসকের চিকিৎসাগুণে তাঁর জীবনরক্ষা হয়। শুধু চিকিৎসা নয় বামাসুন্দরী, তাঁর কন্যা স্বর্ণময়ী ও কৈলাসচন্দ্রের আন্তরিক সেবা ও যত্নে সুখদাসুন্দরী সুস্থ হয়ে ওঠেন।

আচার্যদেবের শৈশব ১৮৮৭ থেকে ১৯০২ এই পনের বছর সময়ের দুটি ভাগ, একটি কাঁঠালিয়ার জীবন আর অন্যটি ধামরাই-এর। জন্মের পর তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমি ছিল কাঁঠালিয়া ও ধামরাই দু স্থানেই, দান্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না; কেবল দু-একবার শিশু বয়সে তাঁর দাদামশায়ের সঙ্গে দান্যা যান।

কাঁঠালিয়া ছিল দাদামশায় কালাচাঁদ সান্যালের বাড়ী। এ গ্রামটি টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত। গ্রামের দক্ষিণে এক শীর্ণকায়া নদী। নৌকায় ঐ নদী বেয়ে টাঙ্গাইল যাওয়া চলে। নদী ছোট, কিন্তু বর্ষায় এটিই ফুলে ফেঁপে সব এলাকা ডুবিয়ে দেয়। এরই অল্প দূরে আর এক নদী—নাম বংশাই। দুইয়ে যোগও আছে। সান্যালপাড়ার পূবে মাঠ ছাড়িয়ে হাট ও বাজার, তারপর পোস্ট অফিস, থানা মীর্জাপুর।

সান্যালদের বড়ো পরিবার দুটি পাড়ায় থাকতেন—একটি পুরনো আর একটি নতুন। পুরনো পাড়ায় যেটি মধ্যবাড়ী সেটি ছিল কালাচাঁদ সান্যালের অংশ। নতুন পাড়ায় দ্বারকানাথ সান্যালের পুত্র ব্রজেন সান্যাল ছিলেন আচার্যদেবের পিতার সমবয়স্ক ও খেলার সাথী। ব্রজেন্দ্রনাথের স্ত্রীর সঙ্গে আচার্যদেবের মার ছিল সখিত্ব। কাদম্বিনী ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা, আবার সে ছিল আচার্যদেবের ছোট বয়সের খেলার সাথী। আর একটি ছেলে নাম

অশ্বিনীশ্বর ঐ পাড়ারই একটি কায়স্থ পরিবারের ছেলে সেও ছিল ওঁর খেলার সাথী।

ছেলেবেলার অনেক কথা বলতে গিয়ে বলতেন—'আনন্দ কবিরাজের কথা আজও মনে পড়ে, তাঁর দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলে অমায়িক সরল হাসিটি স্মৃতিপটে আজও যেন আঁকা রয়েছে। ওঁর দুই ছেলে বেণীমাধব ও কেতনাথ আইচ, নমঃশূদ্র পরিবারের, তরণী, রমণী, রেবতী—এরা সব খেলার সাথী ছিল। সরকারবাড়ীর জগৎ সরকার—বড় হয়ে ডাক্তার হয় ও জলপাইগুড়ি চলে যায়। আর মনে পড়ে পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ির কথা। প্রথম দিকে পড়াশুনার ভার ছিল মার ওপর। ঘরে কালী তৈরী হত, খাগের কলমে লিখতাম।'

তারপর একদিন গ্রামের পাঠশালার জীবন আরম্ভ হল। দল বেঁধে গ্রামের জমিদার বক্সী বাড়ীর কাছে পাঠশালায় যেতেন। ঘুর পথে সড়ক ধরে যেতেন। পথে একটা সাঁকো পড়ত। বর্ষায় যখন সব ডুবে যেত তখন ছোট ডিঙি নৌকোয় যেতেন পাঠশালায়।

মা সুখদাসুন্দরীর কাজ ছিল পূজার ঘরে। যখন ঠাকুর পূজার পালা পড়ত তখন ছিল ভোগ রাঁধা। ফসলের সময় কাজ কিছু বাড়ত। বাড়ীতে লোক ছিল কম। তিনটি লোকের সংসার, সঙ্গে ছিল এক বৃদ্ধা—নাম আনন্দ, আর ছিল একটি চাকর।

কালাচাঁদ সান্যাল মশায় ভেবেছিলেন তাঁর যা কিছু আছে গোপীনাথকেই দেবেন। কিছু নগদ টাকা দান্যার নিকট আলিসাকাঁদার এক সাহা বণিকের কাছে গোপনে রাখেন, মনে ভয় ছিল তাঁর জ্ঞাতি হৃদয়নাথ সান্যাল যাতে এ কথা না জানে। কিন্তু হৃদয়নাথ জানতেন তাঁর ভাইয়ের অবর্তমানে সব ভূসম্পত্তি এই শিশু গোপীনাথই পাবে। লোভ ছিল তাঁর, পরে সব তিনি হস্তগতও করেন। অবশ্য এসব পরের ঘটনা।

একটি বালকের সঙ্গে এই বয়সে খুবই হৃদ্যতা জন্মে—সে নগেন্দ্র গাঙ্গুলী। ঢাকায় পড়ার কালে এর সঙ্গে খুব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত।

একবার গ্রামে খুব কলেরা হয়। সান্যাল মশায় ও শিশু গোপীনাথও এই রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসাগুণে সে যাত্রা তাঁরা রক্ষা পান। এর পর জীবনে নতুন ঘটনা উপনয়ন। ১৮৯৫ অথবা ১৮৯৬ সালে কোন সময় এই অনুষ্ঠান হয়। এর পর আর একটি ঘটনায় তাঁর শিশুজীবনে একটা ছাপ পড়ে।

১৮৯৭ সালে ১২ই জুন শনিবার শিশু গোপীনাথ অপরাহ্ণে একটি খেলার সাথীর সঙ্গে একটি অসম্পূর্ণ গৃহের দেয়ালে চড়ে খেলছিলেন, অকস্মাৎ সারা সংসার দুলে উঠল, মাটি কেঁপে উঠল। তাঁরা দুজন তাড়াতাড়ি

সেখান থেকে লাফিয়ে নামলেন মাটিতে। লোক বলে উঠল—ভূমিকম্প, ভূমিকম্প।

অল্পক্ষণ পরেই কম্পন থেমে গেল, চারদিকে শাঁখ বেজে উঠল। পরে জানা গেল অনেক গাছ, কিছু বাড়িঘর পড়ে গেছে। নদীর ও বিলের জল উঁচু হয়ে গড়াতে থাকে। একটা চাপা গর্জন যেন শোনা যাচ্ছিল। বড়রা বলছিলেন আবার হয়ত মাটি দুলবে।

এই ভূমিকম্প হয় জুন মাসে, জুলাই মাসে আচার্যদেব ধামরাই যান স্কুলে পড়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে গেলে দেখাশুনার অভিভাবক আছে—স্নেহ ও যত্নের কোন অভাব হবে না সেখানে।

উপনয়নের পর কাঁঠালিয়াতে থাকাকালে তাঁর যে সব কাজ করতে হত তার একটা বর্ণনা এখানে তাঁরই কথায় বলছিঃ

'আমার উপনয়নের পর আমি মাঝে মাঝে ঠাকুর সেবার কিছু কিছু ভার পাইতাম। ঠাকুরের ভোগ দেওয়া, শয়ন দেওয়া, প্রভাতে শয্যা থেকে উঠানো। ঠাকুরের নাম ছিল গোপীনাথ, আর আমার নামও গোপীনাথ। ঐ বিগ্রহের নামেই ঠাকুর্দা আমার নাম রাখেন। আমার রাশি নাম অশ্বিনী, মাসিমা নাম রাখিয়াছিলেন অক্ষয়, আজিমা নাম দিয়াছিলেন নিবারণ।

'পূজার ফুল তোলা আমার প্রায় নিত্য কর্তব্য ছিল, তবে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না, ভাল লাগিত তাই করিতাম। বিগ্রহের সেবার কাজ করিতেও আমার ভাল লাগিত। ঠাকুরদা বলিতেন—তুমি তো গোপীনাথের মিতা।'

কাঁঠালিয়ার জীবনে একটা নতুন সংযোজন—সেখানকার যাত্রা দেখা বড় ভাল লাগত। আর সব থেকে ভাল লেগেছিল ধ্রুব প্রহ্লাদের অভিনয় ও গান। সে ছবি প্রাচীন বয়সেও মনে ছিল। একদিন যখন তিনি কাশীতে সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিক তখন তাঁরই নির্দেশে ধ্রুবের নারায়ণ দর্শনের ছবি আঁকিয়েছিলেন একজন চিত্রকরকে দিয়ে। সে ছবি তাঁর পড়ার ঘরে আজও আছে। বালক ধ্রুবের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—'ধ্রুবের তপস্যা ও ভগবদ্-ভক্তি আমার জীবনে এক অক্ষয় সম্পদ হইয়া আছে। উহার বীজ পাইয়া-ছিলাম ঐ যাত্রা গানে।' রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহিনী শুনতেন আগ্রহের সঙ্গে, কিছু শুনেছেন বৃদ্ধদের মুখে আর শুনেছেন কথকতায়। যাত্রা, রামায়ণ গান, কথকতা ও কীর্তন এ ছিল সাধারণ মানুষের সারা বছরের আনন্দের খোরাক। ধামরাই থেকে আসতেন গোকুল আচার্য, হাতে একটা চামর দুলিয়ে পদাবলী গাইতেন, আবৃত্তিও করতেন, শ্রোতাগণ মুগ্ধ হয়ে শুনত। কবিগান ও কবির লড়াইও হত। কবিতায় কবিতায় লড়াই সব না বুঝলেও শুনতে মজা লাগত। আর ছিল পাঁচালী ও ভাসান। কোন কোন সময় মনোহরসাহীর কীর্তনও যে না হত তা নয়। রামপ্রসাদী গানের চলন যত না ছিল তার তুলনায় ভাটিয়ালী ও মুর্শিদী গান চলত বেশী।

জায়গাটা নদীবহুল। দূর নদীর পথে বিশেষ করে রাতে ভাটিয়ালী গান গেয়ে নৌকো চলত। সে সুরের রেশ মনে হয় তাঁর কানে যেন বাজত।

পুরনো দিনের প্রসঙ্গে অনেক কথাই আচার্যদেব বলতেন, বলতেন ঝড়ের দিনে আম কুড়নো, টিনের ঘরে অথবা খড়ের ঘরে থাকার আতঙ্ক, তারপর ঝড়ের শেষে এক বিভীষিকাময় দৃশ্য—গাছপালা ভেঙে পড়েছে, বাড়ীর চাল উড়ে গেছে, গরীবদের কুটিরের আর কোন চিহ্নই নেই।

আর একজন মানুষের কথা খুবই মনে পড়ত তাঁর, তিনি ঠাকুরদার গুরু অভয় গোস্বামী। বাড়ী ছিল নবদ্বীপ। তিনি ছিলেন আকৃতিতে দীর্ঘকায়, বর্ণে গৌর ও পরম সৌম্য ছিলেন। তাঁর কথায় বলতেন—'পূজাশেষে যখন তিনি পূজার ঘর হইতে বাহির হইতেন তখন তাঁহার স্নিগ্ধ ললাটে চন্দন-তিলক, দেহে নানা চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাতে পটে আঁকা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সাদৃশ্য দেখিতাম।'

ধামরাই

আচার্যদেব দাদ্যার নিকট সন্তোষ অথবা টাঙ্গাইল না গিয়ে ধামরাই যান এই উদ্দেশ্যে যে ওখানে বামাসুন্দরী আছেন, তাঁকে তিনি আজিমা বলতেন এবং তাঁরই গৃহে তাঁর জন্ম। ঠাকুরদা ভেবেছিলেন তাঁর কাছে থাকলে তিনি স্নেহ ও যত্নে তাঁকে প্রতিপালন করবেন, তাঁর সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেবেন। ঠাকুর্দা কালাচাঁদ সান্যাল তাই কোনো আপত্তি করলেন না, বরং নিশ্চিন্ততা বোধ করলেন।

আচার্যদেবের উপনয়নের ঠিক এক বছর পর ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে তিনি ধামরাই যান কাঁঠালিয়ায় দশ বছর শৈশব কাটাবার পর। স্কুলে ভর্তি হন অষ্টম শ্রেণীতে, আজকালকার হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীতে। সপ্তম ও ষষ্ঠ শ্রেণী পার হন ১৮৯৮ সালে, এইভাবে পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পৌঁছান ১৯০১ সালে। তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার মুখে এক বিপদ ঘটে। ঐ সময় তাঁর ঠাকুরদা কালাচাঁদ সান্যাল পরলোক-গমন করেন। এ বিপদ আকস্মিক, এতে জীবনে অনেক বাধা আসে, পড়া-শুনায় ব্যাঘাত জন্মে; জীবনের গতি এক নূতন অভিজ্ঞতার মুখে এসে পড়ে।

ধামরাই যদিও নিজের মামাবাড়ী কিন্তু গৃহ বলতে তিনি জানতেন বামাসুন্দরীর বাড়ী। তাঁকে বলতেন আজিমা। মামাবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কম। মাতামহ তখন ছিলেন না। তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল—হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল না।

বামাসুন্দরীর বাড়ী দুই মহল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তার আবার দুটি ভাগ। এক ভাগ আজিমার আর এক ভাগ তাঁর দেবর ভারতচন্দ্র সেনের। তিনি

পেন্সন পেতেন। দুপুরে দত্তবাড়ীতে দাবা খেলতে যেতেন, বিকেলে পড়তেন খবরের কাগজ। খবরের কাগজ বলতে সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীকে বোঝাত। তাতে হাস্যকৌতুকে ভরা পঞ্চানন্দের কথা থাকত, পড়ে শোনাতেন। বঙ্গবাসীর লেখক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেকালে বাংলার পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গবাসীর প্রচার বেশী ছিল। সাপ্তাহিক হিতবাদী, বসুমতী ছিল বটে তবে লোকপ্রিয় ছিল বঙ্গবাসী।

স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন রাজেন্দ্রলাল বসাক। একজন শিক্ষকের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—"শ্যামলসুন্দর বসাক আমাদের পড়াইতেন। এদিকে তোতলা, তার উপর অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব ছিলেন। অল্প অপরাধে শিশুদের গুরুদণ্ড দিতেন। একবার একটি ছেলেকে এত প্রহার করেন যে তার নাক হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। মাস্টারমশায় তো রক্ত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। পিয়ন হরিচরণকে ডাকিতে থাকেন, এদিকে তোতলামির ফলে তাঁর মুখ হইতে শুনা গেল—হ-ই-চ-ন, হ-ই-চ-চ-ন, অক্ত অক্ত—দল—দল'। এই দৃশ্য দেখিয়া ছেলেরা ভীড় করিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিতে লাগিল।"

ধামরাই স্কুল একদিন স্থাপিত হয়েছিল জনতার আগ্রহে কিন্তু এটি তাঁর সময়ে এনট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত উন্নীত হয়নি। অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর তিনি প্রতি বৎসর প্রথম হয়ে উপরের শ্রেণীতে উঠতেন। একবার ডবল প্রমোশনও পেয়েছিলেন। যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠেন তখন থেকেই সংস্কৃতের পাঠ গ্রহণ আরম্ভ হয়। পড়তেন উপক্রমণিকা কিন্তু তাতে মন ভরত না, তাই ব্যাকরণ কৌমুদীও পড়তে থাকেন। সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন কানাইলাল গোস্বামী। যদিও তিনি মুগ্ধবোধের পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু সর্বপ্রকার ব্যাকরণ থেকে পাণিনিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। তাঁরই প্রেরণায় আচার্যদেব পাণিনির দিকে আকৃষ্ট হন। আচার্যদেবের হাতে আসে সে সময় পিতৃদেবের পরিত্যক্ত ব্যাকরণ কৌমুদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। এতে সুন্দর হস্তাক্ষরে পিতা বৈকুণ্ঠনাথ পাণিনির সূত্র স্থানে স্থানে লিখে রেখেছিলেন। আর একখানা পুস্তক তিনি পান পিতার গ্রন্থ সংগ্রহে, সেটি তারানাথ তর্কবাচস্পতির সরলা টীকাযুক্ত সিদ্ধান্ত কৌমুদী। ছিল লঘুকৌমুদী ও রমানাথ সরস্বতীকৃত ছাত্রবোধ ব্যাকরণ। এতে পাণিনির সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যা ছিল।

এ সময়কার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—'কানাইলাল গোস্বামীর পর এ পদে আসেন প্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি ছিলেন কলাপ ব্যাকরণের পণ্ডিত কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। যদিও আমরা ব্যাকরণ কৌমুদী পড়িতাম, তাতে শব্দরূপ ধাতুরূপ প্রভৃতি দেওয়াই আছে, কিন্তু আমার সূত্র অনুসারে পদ সাধিতে ভাল লাগিত, মুখস্থ করিয়া শব্দরূপ

শিখিতে মন চাহিত না। এ সময় সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী শিখিবার দিকেও ঝোঁক যায়।'

ধামরাই জীবনে আচার্যদেবের দুটি ছেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়ে—একজনের নাম ছিল কিরণবিকাশ চৌধুরী, অন্যটির নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ সেন। কিরণ ছিল দীনবন্ধু মল্লিকের দৌহিত্র। এর দুই কন্যা, এক সুরমা এবং অন্যজন মনোমোহিনী। পাবনা জেলার ভারঙ্গা ছিল এদের গ্রাম। কিরণ প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সময় কাটাত। আরও কিছু পরে সে তাঁকে পড়তে দিয়েছিল মাদাম ব্লাভাস্কি রচিত কেভস অ্যান্ড জাংগলস অফ হিন্দুস্থান। দেবেন ছিল শান্ত প্রকৃতির, অতি অল্প বয়সেই তার মধ্যে ঐকান্তিক ধর্মপিপাসা জেগেছিল। আর কিরণ ছিল বড় ঘরের ছেলেদের মতো চঞ্চল কিন্তু খুব সরল ও অমায়িক।

বিকেলে তিন বন্ধুতে মিলে গ্রামের পূব দিকে খোলা মাঠ ছাড়িয়ে অল্প দূরেই যেতেন অশবথ গাছের দিকে—গাছটা ছিল বিশাল। দিনের বেলায় অসংখ্য বাদুড় ঝুলে থাকত সে গাছে। সাধারণ মানুষ ঐ গাছটিকে বলত যশাই বৃক্ষ। গাছের গোড়ার দিকে সিঁদুর লেপা থাকত। লোক আসত, পূজা করত, মানতও করত।

ধামরাই থাকার সময় আচার্যদেবের জীবনে একটা নূতন দিক্ খুলেছিল; যা কাঠালিয়ায় ছিল না। সেখানে জীবন ছিল বাড়ীর সীমায় ঘেরা, কিন্তু এখানে একটু একটু বাইরের জীবনের সঙ্গে পরিচয় হতে আরম্ভ হয়েছিল।

ধামরাই গ্রাম সন্দেহ নেই—তবে বড় গ্রাম। ছোট বড় সড়ক, গলি দোকান পশার সব ছিল। কিন্তু শহরের মতো গাড়ী ঘোড়া অবশ্য ছিল না। ছিল বর্ষায় নৌকো—ডিঙি থেকে আরম্ভ করে বজরা পর্যন্ত, আর ছিল যাত্রীবাহী নৌকো যাকে গয়নার নৌকো বলত। বর্ষার শেষে খাল বিল শুকিয়ে গেলে পায়ে হেঁটে অথবা ডুলি পালকী অথবা ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চেপে লোকে গ্রাম গ্রামান্তরে যেত।

ধামরাইর বড় রাস্তা ছিল একটি—সেটি উত্তরে মাধববাড়ী থেকে সুরু হয়ে দক্ষিণে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাতেই এখানকার প্রসিদ্ধ রথটি থাকত। রথটি ছিল বিশাল—সাততলায় বিভক্ত, বিমানের ন্যায় ছিল এটি। রথযাত্রার সময় সহস্র সহস্র মানুষ একে টেনে নিয়ে যেত যাত্রাবাড়ীর অর্ধপথ পর্যন্ত। পুরীতে যেমন গুণ্ডিচাবাড়ী, এখানে তেমনি যাত্রাবাড়ী। রথযাত্রার পর সাতদিন শ্রীমাধব এই যাত্রাবাড়ীতে থাকতেন আবার সাতদিন পর ঐ রথ যেত মূল মন্দিরে। রথযাত্রার সময় বালক গোপীনাথ বামাসুন্দরীর বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে রথযাত্রার দৃশ্য দেখতেন।

মাধববাড়ীর উত্তরে নদীর প্রান্ত পর্যন্ত ছিল রায়পাড়া—এরাই মাধবের সেবাইৎ। আচার্যদেবের মাতুলগৃহও এই পল্লীর দ্বারদেশেই ছিল। আর যে

বাড়ীতে তিনি থাকতেন তার বাইরে ছিল এক প্রসিদ্ধ মন্দির। এটি পাঁচ ছয় শত বছরের পুরাতন। এতে কষ্টিপাথরে নির্মিত এক বাসুদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এঁর পূজা প্রতিদিন নিয়মিত হত। বিকেলে মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দায় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের সৎসঙ্গ চলত। এই মন্দির ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে জয়কালীর মন্দির, তার উত্তরে ছিল জগন্নাথের মন্দির। আরো উত্তরে মাধববাড়ীর দক্ষিণে ছিল মঠবাড়ী। এই মঠে শিবের লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মঠটি খুবই উঁচু, বহু দূর হতে এটি দেখা যেত।

ধামরাই গ্রামে প্রধান উৎসব ছিল রথযাত্রা, উত্থান একাদশী ও মাঘী-পূর্ণিমা। বহু লোকের সমাগম হত সে সময়। রথের সময় ঢাকা থেকে সাময়িকভাবে দোকান আসত। রথ কিন্তু পুরীর মত প্রতি বছর তৈরী হত না। একবার তৈরী হলে বার-তের বছর চলত। এর নির্মাণে বহু অর্থব্যয় হত—টেঁকসই কাঠে এটি নির্মিত হত বলে বৃষ্টি রোদে এর কোন ক্ষতি হত না। রথে চড়তে সিঁড়ি লাগত। ঠাকুর মাধব বসতেন সর্বোচ্চ চূড়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন চূড়ায় বসতেন অন্য দেবদেবীগণ। এটি একটি বিশাল বিমানের আকারের, অত্যন্ত সুষম শিল্পসম্মত ছিল। এর নির্মাণের ব্যয় বহন করতেন বালিয়াটি গ্রামের জমিদারগণ।

মাধববাড়ীর আয়তনও ছিল বিশাল। প্রথমে সিংহদ্বার, এটি পার হয়ে অঙ্গন, তারপর নাটমন্দির। এটি নির্মাণ করে দেন ধনীভক্ত ভগীরথ চৌধুরী। ঋতুভেদে মাধবের মন্দির ছিল তিনটি। একটি উত্তরে, একটি পূর্বে, অন্যটি দক্ষিণে। অঙ্গনের বাঁদিকে ছিল ভোগমন্দির, কুয়ো ও অফিস। পাণ্ডারা থাকত এখানেই।

মাধবের আরতি ছিল খুবই দর্শনীয় ও ভক্তি ও ভাব উদ্রেককারী। সন্ধ্যায় আরতি দেখতে বহু লোকের সমাগম হত। এ প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলছেন —'আরতিকালে যে বাজনাটি বাজিত তাহারও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। বাজিত অবশ্য খোলই, কিন্তু তাহার ধ্বনিতে একটি বিচিত্র গম্ভীরভাব লক্ষ্য করিতাম। ঠাকুর মাধবের মূর্তিটিও ছিল অতি সুন্দর ও মনোহর। শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের মূর্তি হইলেও উহাতে ঐশ্বর্য অপেক্ষা মাধুর্যের শ্রী অধিক ফুটিয়া উঠিত। ঐ মূর্তিকে দেখিতে বৈকুণ্ঠনাথের মনে হইলেও উহা যেন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণেরই আত্মপ্রকাশ বলিয়া মনে হইত। শ্রীবিগ্রহের মুখকান্তিতে অপূর্ব মাধুর্য উদ্ভাসিত হইত। স্থানীয় শিল্পীগণ মাধবের মৃন্ময় মূর্তি বিক্রয় করিত। ছোটবেলায় ঐ মূর্তি আমি আমার আজিমার দোতলার ঘরে আনিয়া ফুল দিয়া সাজাইতাম।'

সেই ছেলে বয়সে আচার্যদেব ধামরাই থেকে পায়ে হেঁটে কাঁঠালিয়া যেতেন, সঙ্গে থাকত আজিমা বামাসুন্দরী। মাঠের মধ্য দিয়া পথ, কোনো মাঠ ছোট, আবার কোনোটি অতি বিশাল। বহু দূরে দূরে গ্রামের রেখা দেখা যেত। সে সব মাঠ পার হতে বহু সময় লাগত। সতের আঠার মাইল

পথের মাঝামাঝি কোথাও এক জায়গায় ছিল কেশব পাগলার আশ্রম। সেখানে পথিকেরা বিশ্রাম করতেন। এই সাধুটি ছিল জাতে নমঃশূদ্র। একবার বনে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে সে কোন ঊর্ধ্বস্তরের দেবতার অনুগ্রহ পায়। এর ফলে তার জীবনে পরিবর্তন আসে। সে গৃহস্থের জীবন ত্যাগ করে। একটি উঁচু টিলার ওপর একটা মাচান বেঁধে সে থাকত, চারদিকে আমের বন ও নানা গাছের ছায়ায় আশ্রমটি সুশীতল থাকত। কোন পথচারী এলে জল দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করা হত। পাগল কেশব ব্রহ্মচারীর মতো জীবনযাপন করত। পরনে থাকত কেশরিয়া বসন, গলায় সোনার হার, মণিবন্ধে সুবর্ণনির্মিত বাজু। অন্নত্যাগ করেছিল সাধুটি। গ্রামাঞ্চলের বহু ভক্ত ছিল তার।

এই বিশাল মাঠ বর্ষাকালে সমুদ্রের আকার ধারণ করত—বড় বড় ঢেউ উঠত সে সব জায়গায়, নৌকোয় যেতে তখন ভয় হত—না জানি কখন ডোবে।

ধামরাই স্থানটি অতি প্রাচীন বলে মনে করা হয়। ধামরাই শব্দের পূর্বরূপ হয়ত ধর্মরাজিকা। এই শব্দ বৌদ্ধ যুগের স্মৃতি মনে আনে। সত্য কি তাহা অনুসন্ধানের বিষয়, তবে এটি যে পূর্ব যুগে একটি ধর্মস্থান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রামের মধ্যে শা সাহেবের দরগা এবং তার উত্তরে প্রাচীন দীঘির নিকট মসজিদটিতে হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট স্তম্ভ এই স্থানের প্রাচীনতা নির্দেশ করে।

এখানকার প্রধান শিল্প বস্ত্রশিল্প। আচার্যদেবের কালে ছয়-সাত শত বস্ত্রশিল্পী পরিবার শুধু এই গ্রামেই বাস করত। এদেরই পূর্ব পুরুষ প্রসিদ্ধ মসলিন বস্ত্র নির্মাণে কুশল ছিল।

ধামরাই থাকতে আচার্যদেব সংস্কৃত ও বাংলা কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত কবিতা অনুষ্টুপ ছন্দে, বাংলা কবিতা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখেন। সে সময় অন্য কোন বাইরের বই না থাকায় পিতা বৈকুণ্ঠনাথের সংগৃহীত বই পড়তেন। সে সব বই ও পত্রিকার মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত বান্ধব, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত আর্যদর্শন, পুরনো বঙ্গদর্শন। বই ছিল দেবীচৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ, ছন্দশাস্ত্রের বই কর্মনাশা, ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের রজনীকান্ত পণ্ডিতের প্রকৃতি রহস্যম্, শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাখ্যা, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মবিষয়ক আলোচনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত বিধবা বিবাহ ও প্রসন্ন তর্করত্নের প্রত্যুত্তর উভয়ই ছিল। আর ছিল চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের সতীপরিণয়ম্। হেম নবীনের কাব্যের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন পরিচয় ঘটেনি। ক্রমশঃ ঝোঁক সংস্কৃতের দিকেই বাড়ছিল কিন্তু ইংরেজীর দিকেও কম ছিল না।

সে সময় যাত্রাগান শোনার খুব শখ ছিল। সখের থিয়েটারও সময় সময় শুনতে যেতেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গীতাভিনয়—তাঁর রাই উন্মাদিনী,

স্বপ্নবিলাস, বিচিত্র বিলাস প্রভৃতির সুরতরঙ্গের স্মৃতি তাঁর মনে পড়ত। তারপর মাধববাড়ীতে নিয়মিত যে ভাগবত কথা হত, তিনি মাঝে মাঝে শুনতে যেতেন, খুব ভাল লাগত শুনতে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে তখনও বালক গোপীনাথের পরিচয় হয়নি। অকস্মাৎ একদিন এক অদ্ভুত যোগাযোগে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা তাঁর হাতে আসে। একবার কোন সময় ঢাকা থেকে মাসিমা কিছু কিছু জিনিস কিনে আনেন। যে জিনিসগুলো তিনি এনেছিলেন তা মোড়া ছিল একখণ্ড কাগজে। গোপীনাথ ঐ কাগজখানা কুড়িয়ে পান। ঐ কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে একটি কবিতা লেখা আছে। নীচে লেখা আছে রবীন্দ্রনাথের নাম। কবিতাটি পড়ে তাঁর মনে হল এরূপ কবিতা এর পূর্বে পড়েন নি। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের কবিতা থেকে এর সুন্দরতা তাঁর কাছে নবীন। কবিতাটি এই—

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন আকাশে
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে

যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আচার্যদেব উত্তরকালে প্রগাঢ় অনুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার সূত্রপাত হয় এই কবিতায়। আবার এই কবিতাই তাঁকে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিল। অক্ষয়বাবু উত্তর জীবনে তাঁর গুরুভ্রাতা রূপে পরিচিত হন। তিনি গোপীনাথ থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। যে গৃহে তিনি থাকতেন তাঁদের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কে তিনি ধামরাই এলেই তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। অক্ষয়বাবু সিদ্ধান্ত কৌমুদী ভালভাবে পড়েছিলেন এবং ছাত্ররূপেও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর কাছেই গোপীনাথ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ দেখেছিলেন। অক্ষয়বাবু যখন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে এফ-এ পড়তেন তখন সেখানে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বিধুভূষণ গোস্বামী। ইনিই আচার্যদেবের পিতার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

বালক গোপীনাথের জীবনে ধামরাই থাকার কাল শেষ হয়ে আসে নানা কারণে। জীবনের এই পর্যায়ে একটি ঘটনা তাঁর বিবাহ। এটি ঘটে ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ বাংলা ফাল্গুন মাসে। উনি নিজে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'এটি যেন ভগবদ্ নির্দিষ্ট একটি বিধান বলে তখন আমার মনে হইয়াছিল। আমার ঠাকুর্দা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই নাতিবৌ দেখিয়া যান। আমার বয়স তখন মাত্র ১৩, তখন পড়াশুনা করি, তখনও স্বাধীনভাবে জীবনের পথে চলিবার সময় আসে নাই। ঠাকুর্দা ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার সব বিষয় সম্পত্তি বেহাত হইয়া যাইবে—আরও

নানাপ্রকার বাধা আসাও অসম্ভব নয়। এই জন্য আমার কোন হিতৈষী ও অভিভাবক কেউ আমার পার্শ্বে দাঁড়াক হয়ত তাঁহার এই ভাবনা ছিল।'

কাঠালিয়া থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে হালালিয়া নামে এক পণ্ডিতবহুল গ্রাম। সেই গ্রামের ব্রজশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কুসুমকামিনীর সঙ্গে গোপীনাথের বিবাহ হয়। ব্রজশঙ্কর, দুর্গাশঙ্কর ও কার্তিকশঙ্কর এই তিন ভাই ছিলেন।

কার্তিকশঙ্কর ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত। পূর্ববঙ্গে ঐ সময় তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত ছিল না বললেই হয়। স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বাড়ীতে ছিল চতুষ্পাঠী। তিনিই একা সংসার চালাতেন। পরিবার ছিল একান্নবর্তী এবং তিন ভাইয়ের মধ্যে ছিল প্রীতির অটুট বন্ধন। বিষয় আশয় ছিল, অল্প জায়গির ছিল। টোলে ছিল বহু ছাত্র। প্রতিদিন ৫০/৬০টির ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পর দু-একবার এই হালালিয়াতে আচার্যদেব যান। সেখানে প্রথম পরিচয় হয় কেদার সাংখ্যতীর্থের সঙ্গে—তাঁর রচিত একখানা গ্রন্থ তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন।

তাঁর বিবাহের এক বছর পর ঠাকুরদা কালাচাঁদের গৃহ থেকে গৃহবিগ্রহ অপহৃত হয়। তার পরই তাঁর শরীর রুগ্ন হয়ে পড়ে। অন্য একটি গোপীনাথ বিগ্রহ ধামরাই থেকে আনা হয়, কিন্তু সে বিগ্রহটি আচার্যদেবের মতে ছিল গৃহস্থের অনুপযোগী। ক্রমশঃ কালাচাঁদের শরীরে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর বিদায়ের সময় আসন্ন তখন হালালিয়াতে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে খবর পাঠানো হয়। অবশেষে ১৩০৮ সালের ২৪শে আষাঢ় অর্থাৎ ১৯০১ সালের ৮ই জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন। বালক গোপীনাথ নৌকাযোগে কাঠালিয়া পৌঁছে ঠাকুরদাকে দেখতে পেলেন না। যাঁর স্নেহে তিনি এই সংসারে সব বাধা-বিপত্তি পার হয়ে চলছিলেন সে আশ্রয় তিনি হারালেন। শুধু এই-ই নয়, ঠাকুরদার জ্ঞাতি ভ্রাতা হৃদয় সান্যাল এই অবসরে পূর্বভিটার ঘর তালা বন্ধ করেন। ঐ ঘরে তাঁর সব জিনিস রাখা ছিল, ঘর বন্ধ থাকায় স্নান করে কিভাবে বস্ত্র পরিবর্তন করবেন তারও কোন উপায় ছিল না। সেই দুঃসময়ে দু-চারজন হিতৈষী তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই সে সময় তিনি পথে ভেসে যান নি। সান্যাল পরিবারের সব সম্পত্তি ছিল এজমালী, লৌকিক দৃষ্টিতে সব সম্পত্তির অধিকারী সান্যাল পরিবার। আইনের কাছে সরল বিশ্বাস ও স্নেহের মর্যাদা নেই বলেই সান্যালরাই সব কিছুর অধিকারী ছিলেন। কালাচাঁদ সান্যাল সরল বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যা ভেবেছিলেন কাগজ-পত্র তৈরী করে কাজ পাকা করে যান নি বলে বালক গোপীনাথ, তাঁর সহধর্মিণী ও বিধবা মাতা সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন। ঐ বিশাল বাড়ীতে অরক্ষিত অবস্থায় মাতা সুখদাসুন্দরীকে রাখা কোন মতেই সুবিবেচনা নয়

ভেবে মা সুখদাসুন্দরী সাময়িকভাবে কার্তিকশংকরের গৃহে গমন করলেন এবং গোপীনাথ ফিরে চললেন ধামরাই।

এইভাবে পিতা বৈকুণ্ঠনাথ ও বালক গোপীনাথের ৩১ বছরের কাঠালিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হল। এই সম্পর্কের সূচনা ১৮৭০ সালে পিতা বৈকুণ্ঠনাথের দান্যা ত্যাগের দিন থেকে আর বিচ্ছেদ হয় ১৯০১ সালে।

প্রথমে ঠিক হয় ধামরাই গ্রামে একটা গৃহ নির্মিত হবে কিন্তু সে প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হল না দেখে ঠিক হল পৈতৃক ভিটা দান্যা গ্রামে একটা স্থায়ী বাসস্থান করা। এই পরামর্শ অনুসারে একদিন তর্কালংকার মহাশয় বালক গোপীনাথকে নিয়ে দান্যা গ্রামে উপস্থিত হলেন। তারপর একদিন আলিসাকান্দার ভৈরব রায়ের সংগে দেখা করলেন। তিনি পূর্বেই সান্যাল মহাশয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলেন। ইনি বস্তুত অতিশয় মহানুভব পুরুষ ছিলেন। তিনি সান্যাল মহাশয়ের গচ্ছিত অর্থ অন্য কারো হাতে দেবেন না এবং একথাও বললেন গোপীনাথের পড়ার খরচ হিসেবে মাসে মাসে কিছু অর্থ দেবেন এবং দান্যাতে বাড়ী করা হলে তাতে যা খরচ লাগে তাও ঐ টাকা থেকে দেবেন। একথায় আশ্বস্ত হয়ে তর্কালংকার মহাশয় সকলকে নিয়ে হালালিয়ায় ফিরলেন এবং তারপর আবার ধামরাই।

ধামরাই ফিরলেন বটে কিন্তু ঐ শৈশবে মনের উপর যে ঝড় বয়ে গেল তা তাঁর মত বালকের পক্ষে অসহনীয়। মা পড়ে রইলেন অন্যের আশ্রয়ে, কাঠালিয়ার স্থায়ী বাসও ঘুচল। সেখান থেকে মাঝে মাঝেই সংবাদ এল পূর্বের ঘরের সব জিনিসপত্র হৃদয় সান্যাল সব সরিয়েছেন। গোপীনাথের মনে কেবল একটি শংকা পিতার ব্যবহৃত পুস্তকগুলো না চলে যায়। সান্যাল মশায়ের ছেলে এসে একদিন মাতা সুখদাসুন্দরীকে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করতে বলেছেন। মাও স্থির করেছেন আর এ ঘরে নয়। যেমন করে হোক এ স্থান ত্যাগ করতেই হবে।

এদিকে ধামরাই স্কুলের অবস্থাও শোচনীয়। গোপীনাথের কাছে কোন পথ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। কোথায় যাবেন, কোথায় পড়বেন। অবশেষে একদিন আশার আলো দেখতে পেলেন।

এ সময়ের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে দুটি কথায়ঃ 'একদিকে গৃহহীন অবস্থা গর্ভধারিণী অন্যের গৃহে, পড়াশুনা এক প্রকার বন্ধ। স্বপ্নজীবনের মতো দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল।'

যখন দিন আর কাটতে চায় না তখন কাঠালিয়ার সান্যালপাড়ার যদুনাথ সান্যাল আচার্যদেবের সংগে দেখা করেন। ইনি তখন ঢাকা থেকে সার্ভে স্কুলে পড়ছিলেন। তিনি তাঁর মুখে সব কথা শুনে বললেন, 'ভাবনা নয়, সব ব্যবস্থা তিনি নিজ দায়িত্বে নেবেন। স্কুলে ভর্তি হাওয়া, ফিস মাফ করানো সব ব্যবস্থা তিনি করবেন। সব ঢাকাতেই হবে।'

একথা শুনে আচার্যদেব মাকে ও তর্কালংকার মহাশয়কে সব লিখলেন।

তাঁরা উত্তরে জানালেন—পড়াশুনা করতেই হবে, আট-দশ টাকা যা লাগে তা তাঁরা অবশ্যই পাঠাবেন। যদুবাবু ঢাকা গিয়ে অবিনাশ সরকার নামে একটি ছেলেকে সব ভার দিলেন, কেননা ঢাকায় থাকার কাল তাঁর শেষ হয়েছিল। অবিনাশও তৎপর হয়ে সব ব্যবস্থায় লেগে গেল। সে ছিল গরীব ঘরের ছেলে, নিজে টুইশন করে পড়ার খরচ ও নিজের খরচ চালাত। কোথায় কি করতে হবে সে জানত।

তখন ঠিক হল পুজোর ছুটির পর কোন এক শুভদিনে কিশোর গোপীনাথ যাবেন ঢাকায় পড়তে। ঠিক হল জুবিলী স্কুলেই তিনি ভর্তি হবেন। এটি জগন্নাথ স্কুলেরই নামান্তর। এই স্কুলেই পিতা বৈকুণ্ঠনাথও পড়েছিলেন। এর খ্যাতি অন্য স্কুল থেকে বেশী। আরো একটি কথা, জগন্নাথ কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট অনাথবন্ধু মৌলিক আশ্বাস দিলেন এখানে ভর্তি হলে ফ্রি স্টুডেন্টশিপের ব্যবস্থাও হবে।

তারপর স্থির হল ১৯০২ সালের প্রারম্ভে ঢাকা গিয়ে স্কুলে ভর্তি হবেন। এর মধ্যে কাঁঠালিয়া থেকে ঘুরে এলেন, তারপর গেলেন ঢাকা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

ঢাকা

ঢাকার কথা ধামরাই থাকতে কত শুনেছেন। মনে হয়েছে অন্য ছেলেদের মতো তিনিও যদি ওখানে যেতে পারতেন তা হলে না জানি কি এক বিস্ময়ের জগৎ তার অপার সৌন্দর্যের ডালি তাঁর চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত করত। একদিন সে স্বপ্নও সার্থক হল। যারা সেখানে যায় তারা যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন গ্রামকে তারা কি চোখে দেখে জানা নেই। একবার যাওয়ার সাধ মনে জাগত; সে তো সাধই, সত্য নয়। তারপর একদিন গয়নার নৌকোয় চড়ে একা একা বিদেশের দিকে যাত্রা সুরু হল। মনে ভয় ভাবনা যেমন ছিল তেমনি নতুনকে দেখা ও জানার আকাঙ্ক্ষাও ছিল।

তারপর এক সময় ঢাকার চাঁদনি ঘাটে নৌকো ভিড়ল। ঘাটে নেমে এগিয়ে চললেন চকবাজার, বাবুর বাজার হয়ে। কিশোরের চোখে বিস্ময়ের জগৎ একে একে খুলতে লাগল। কত পথ, অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া ও বাজার দোকান। মানুষের ভীড় বাঁচিয়ে ধীর পায়ে পৌঁছলেন ১৪০ নম্বর জিন্দাবাহার লেনের মেস বাড়ীর দিকে। এ সময় দুটি কথা মনে হয়েছিল—এই সে ঢাকা—মুসলমানকালে রাজধানীর সম্মান এ নগর পেয়েছিল আর এই নগর আবার ঢাকেশ্বরী দেবীর পীঠস্থান বলে দূর দূরান্তরের অগণিত যাত্রীকে আকর্ষণ করে। কলকাতার পরই তো ঢাকার স্থান, মধ্যযুগে কলকাতার আগেই হয়ত এর স্থান ছিল। যে গলিতে তাঁর মেস তা যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধে ভরা, তবু এখানেই থাকতে হবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে ভর্তি হলেন জুবিলী স্কুলে, অনাথ বন্ধু মৌলিকের চেষ্টায় ফ্রিশিপ হল, এখন শুধু মেসের খরচ ও নিজের ব্যক্তিগত খরচ ভিন্ন আর কোন ভাবনা রইল না। তারও ব্যবস্থা হল আলিসা-কান্দার ভৈরব রায়ের ব্যবস্থায়। তিনি ভরসা দিলেন নিয়মিত খরচ পাঠাবেন বলে।

সে যুগে ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন নিয়ম করে পত্র লিখে। ডায়েরী রাখার অভ্যাস তখন থেকেই, কাকে পত্র লিখছেন, তার ঠিকানা, বিষয় ও তারিখ সব সযত্নে লিখে রাখতেন। বয়স যখন বেশী হয়েছে তখনও সে সব ফেলে দেন নি—সেই সব দিনের লেখা বন্ধুদের চিঠি। প্রথম জীবনে নানা ভাড়া বাড়ীতে থাকতে হয়েছে ফলে অনেক হারিয়েছে, তবু যা সংগ্রহে ছিল তার সংখ্যাও কম নয়।

এদিকে যখন পড়ার সব ব্যবস্থা হল অন্যদিকে নিজের পৈতৃক ভিটায় ঘর তোলার আয়োজন হতে লাগল। তাঁর জ্ঞাতি কাকা যোগেশ কবিরাজ সব দেখাশুনা করার ভার নিলেন এবং ভৈরব রায় নিয়েছিলেন অর্থের ভার। অবিলম্বে না হলেও অল্পদিনেই চারখানা টিনের ঘর উঠল ভিটেয়। ধীরে ধীরে একটু নিশ্চিন্ততা এল।

সময় হলেই চিঠি লিখতেন বন্ধুদের। যখন লম্বা ছুটি কাটাতেন ধামরাই গ্রামে তখন সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করতেন। ১৯০২ সালের ২৩শে জুন কি বিষয়ে শ্লোক রচনা করেছেন বলছেন সে কথা—'একটি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে, একটি রামচন্দ্র সম্বন্ধে, আর একটি হরিনামের মাহাত্ম্য বিষয়ে। ছন্দ ছিল প্রথম দুটির অনুষ্টুপ্, শেষেরটির স্রগ্‌ধরা।'

অবিনাশ সরকার চিঠি লেখে এই সময়ে যে তাঁর জন্য ভাল মেসে জায়গা হয়েছে, এটি থাকার পক্ষে সর্বাংশে অনুকূল। এটি আরমানিটোলাতে আর-ম্যানিয়ান চার্চের সংলগ্ন উত্তর দিকের দোতলা বাড়ী। এটি ইণ্ডিয়ান মেডি-কেল মেস নামে সর্বত্র পরিচিত। এরই সংলগ্ন বাড়ী মথুরামোহন চট্টো-পাধ্যায়ের; ইনি ছিলেন সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ছিলেন স্কুল ইন্সপেক্টর।

জুবিলী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় যে দুটি অধ্যাপকের সঙ্গে গোপীনাথের বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাঁদের একজন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অন্যজন মথুরামোহন চক্রবর্তী। প্রথমজন গণিত শিক্ষা দিতেন এবং গণিত বিষয়ে তিনি সিদ্ধ ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। মথুরবাবুই ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে খ্যাতি লাভ করেন। আবার তিনি ছিলেন বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথের প্রিয় শিষ্য। অধ্যাপনা ইনি ভালই করতেন, তা ছাড়া মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে প্রত্যেক ছাত্রকে জাগ্রত করতে তিনি সর্বদা যত্ন করতেন। আর একজন অধ্যাপক ছিলেন রজনীকান্ত

আমীন। পাণিনি ব্যাকরণে তাঁর ছিল প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে গদ্য ও পদ্য রচনায় ছিলেন সিদ্ধ হস্ত।

তাঁর ক্লাশে ইংরেজী পড়তেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়; ইনি মাহাত্মা বিজয়-কৃষ্ণের সম্পর্কে এসে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী হন। এ'র বাড়ীতে ছিল ভাল ভাল বইয়ের একটা সংগ্রহ। কখনো কখনো আচার্যদেব তাঁর কাছ থেকে বই এনে পড়তেন।

এই সময়ের একটা প্রধান ঘটনা তাঁর পিতৃগৃহে (দান্যায়) গৃহপ্রবেশ ১৯০২ সালে আগস্ট মাসে কিন্তু ঐ সময় স্কুল থাকায় ঐ উৎসবে তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি যান পরে অর্থাৎ পূজার পর ২৫শে অক্টোবর। বাড়ীঘর দেখে আনন্দ হয়েছিল—তবে সকলকে চিনতেন না বলে নিজের বাড়ী হলেও তাঁর কাছে বিদেশ মনে হয়েছিল।

এবার অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফল তাঁর ভাল হয়েছিল সংস্কৃতে ৯৫/১২০, গণিতে ১২২/২০০, ইতিহাসে ৫৮/১২০, ইংরেজীতে ১৫৫/২০০ সমষ্টিতে প্রথম তিনিই হন।

নভেম্বর মাসে একটি সভায় হেরম্ব মৈত্রের ভাষণ শুনতে যান। শুনে-ছিলেন যে মৈত্র মহাশয় জগন্নাথ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও এমারসন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। টেনিসন-এর 'পাসিং অফ্ আর্থার' সম্বন্ধে তিনি যে নোট দিতেন তিনি সে সব ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে সংগ্রহ করেছিলেন। আর একটি সভায় তিনি বক্তারূপে কালী-প্রসন্ন ঘোষকে দেখেন—যিনি বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক রূপে শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত ছিলেন আর সাধারণ পাঠক তাঁর নাম জানত 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা'র লেখক রূপে।

একদিন তিনি সাহস করে ঢাকা কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক বিধুভূষণ গোস্বামীর বাড়ী যান এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সময়ে পাণিনি ব্যাকরণে তিনি ব্যুৎপন্ন বিদ্বান ছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর সঙ্গী ছিল কিরণ। দেখা হলে তিনি তাঁর সম্বন্ধে খুটে খুটে সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। এ সময়কার বর্ণনা তিনি নিজেই বলছেন—'আমার পিতার নাম শুনিয়া বিধুবাবু চমকাইয়া উঠিলেন, পরে বললেন, তুমি বৈকুণ্ঠের ছেলে? সে যে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তুমি আমার কাছে পাণিনির পাঠ নেবে, এ তো বিশেষ আনন্দের কথা। তোমার প্রতি আমি বিশেষ খেয়াল করব। এ তো আমার কর্তব্য। তবে এ সময় বাড়ীর সব ভুগছে, তুমি সপ্তাহখানেক পরে এসো।'

তাঁর এই অমায়িক ব্যবহারে হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। একদিন ৫ই ডিসেম্বর থেকে তিনি পড়াতে আরম্ভ করলেন সিদ্ধান্ত কৌমুদী। প্রথম দিন পড়া হল ৫টি সূত্র, তারপর নিয়মিত পাঠ চলতে লাগল। পাঠের সঙ্গে

সঙ্গে পারিবারিক কথাও হত, তাতে মনে হয় তিনি কিশোর গোপীনাথকে কি স্নেহের চোখে দেখতেন।

পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে থিয়েটার দেখা বা যাত্রাগান শোনা কখনও ভাগ্যে ঘটত।

বার্ষিক পরীক্ষার ফল হয় খুবই সন্তোষজনক, তিনিই প্রথম হন। এবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলেন। তখন একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল যারা স্কুলে ফ্রী স্টুডেন্টশিপ নিয়ে পড়ত তাদের বণ্ড লিখে দিতে হত এনট্রান্স পরীক্ষার আগে সে অন্য স্কুলে যাবে না। আচার্যদেবকেও বণ্ড লিখতে হল।

কবিতা লেখার ঝোঁক এখনও ছিল। এ সময়ে ইংরেজীতে লিখলেনঃ 'এ সামার নুন টাইড' এতে ১৫টি স্ট্যান্‌জা ছিল। চিঠি লিখতেন ইংরেজীতে। 'হিমাদ্রিতটে' নামে একটি বাংলা কবিতাও রচিত হয়। বই কিনেছিলেন বায়রণের কবিতার সংকলন। দীনেশ সান্যাল নামে একটি ছেলেকে ভালবাসতেন কাঁঠালিয়াতে, তার স্মৃতিতে লেখেনঃ 'লাইনস্‌ রিটিন ইন মেমোরি অব এ ডিয়ার ফ্রেণ্ড'।

এরই কাছাকাছি কোন সময়ে তাঁর বন্ধু গোপাল 'চিত্রা' নামক রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ তাঁকে পড়তে দেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত সন্ধ্যা, ১৪০০ সাল, এবার ফিরাও মোরে, আবেদন, স্বর্গ হইতে বিদায়, সিন্ধু পারে, বিজয়িনী, জ্যোৎস্নারাতে, সুখ ও চিত্রা তাঁর কাছে খুব ভাল লাগত। এই কবিতা কটি পড়ে আরো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার আগ্রহ জাগে। ঢাকাতে এক বন্ধু ছিল আরজান উদ্দীন নামে, তর খুব ভাল সংগ্রহ ছিল বইয়ের। সেখান থেকে নিয়ে আসেন মানসী। পড়ে ফেলেন প্লুটারচ-এর 'লাইভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রীস অ্যাণ্ড রোম', মার্টারিন ওয়ালেসের জীবনী। কবিতাও লিখে চলেন—বাসনা ও আশা, বসন্তাগমে, একটি ইংরেজী সনেট 'টু দি স্টার ইন এ স্টর্মি ওয়েদার', এটি ১৯০৪ ফেব্রুয়ারীর কথা। জুনে লেখেন 'মনোরাজ্য' ও 'নিরাশের গীত' নামে দুটি কবিতা, জুলাই মাসে লেখেন 'সেখানে' নামে কবিতা, যেটি ১৩১১ সালে আষাঢ় সংখ্যা বান্ধবে প্রকাশিত হয়।

জীবনে বৈরাগ্যের স্পর্শ লেগেছিল নানা কারণে। যে সব বন্ধুর সঙ্গে আচার্যদেব সর্বদা মিশতেন তাদের জীবনের আদর্শের সঙ্গে নিজের আদর্শ অনেক অংশে মিলত। সংসারে দুঃখের ছবি যত দেখেছেন সুখের ছবি সে তুলনায় ছিল ধূসর। একদিকে ধীরে ধীরে জানার জগৎ ও জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। নিত্য নূতন বই পড়া, শুধু সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে নয়, গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, অধীত গ্রন্থের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মননশীলতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, অন্য দিকে জ্ঞান আহরণের পেছনে তাঁর যে ব্যক্তি-সত্তা বর্তমান তার লক্ষ্য কি, পরিণতি কোথায় সে প্রশ্নও মনে জাগছিল। এই সময় একটি ঘটনা তাঁর চিন্তার জগতে আলোড়ন আনে। তাঁরই এক সহপাঠী উপেন্দ্রচন্দ্র দাস একদিন গৃহত্যাগ করে এবং কাশীতে

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যোগদান করে। সাধারণ বালকের মনে এটি একটি সাধারণ ঘটনা হলেও কিশোর গোপীনাথের মনে এই ঘটনা গভীর রেখাপাত করে। তাঁর মনের পটে সে সময় একটি ছবি ফুটে উঠেছিল, সে ছবি তাঁর বিধবা মার আর তাঁর বালিকা বধূর। তাঁর দায়িত্ব অনেক—পরমার্থের পথ তখনও নয়। কিন্তু সেই ছোট বয়সেও তাঁর লক্ষ্য ছিল একদিকে যেমন জ্ঞানলাভের দিকে আবার অন্য দিকে ছিল সাধু ও সৎপ্রসঙ্গে। মথুরামোহন চক্রবর্তীর সম্পর্কে থেকে বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথের নাম শুনতে পান। জুবিলী স্কুলে থাকার সময়ে শুনেছিলেন তাঁর অলৌকিক সিদ্ধির কথা, তাঁর সরল সাধু জীবনের নানা কাহিনী তাঁর মনকে আকৃষ্ট করলেও তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ জীবনে ঘটেনি।

অধ্যাপক মথুরামোহন ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক। মানুষ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর সব কর্ম প্রচেষ্টায়। অধ্যাপনার অবসরে তিনি শোনাতেন তাঁর গুরু বারদীর ব্রহ্মচারীর নানা প্রসঙ্গ। তাঁর যোগবিভূতির কথাও বলতেন। সে সব কথা শুনে বালক মন অলৌকিক জগতের রহস্য জানায় আগ্রহী হয়ে উঠত। বালক গোপীনাথের এক বন্ধু ছিল বীরেন্দ্রমোহন। সে পড়ত নীচু ক্লাশে, কিন্তু তাতে বন্ধুত্ব হতে বাধেনি। তার মুখেও শুনেছিলেন ব্রহ্মচারীর কাহিনী। এ কাহিনী তার নিজের জীবনের। কেমন করে সে তাঁর কৃপায় রোগমুক্ত হয় সেই কাহিনী।

সে শুনিয়েছিল যে একবার সে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগতে থাকে। ডাক্তারী চিকিৎসায় কোন ফল হয় না দেখে ওর বাবা পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জের কাছে বারদী গ্রামে নিয়ে যান। ব্রহ্মচারী লোকনাথ ওদের ওখানে দেখে এবং ওখানে কেন তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন জানতে পেরে বিরক্ত হন। তিনি জিজ্ঞেস করেন—এখানে কি জন্য তোমরা এসেছ?

পুলিনবাবু বললেন—আমার ছেলেটির জ্বর হয়েছে অনেক দিন থেকে, কিছুতেই যাচ্ছে না। চিকিৎসা করিয়েছি, নিরাশ হয়ে এবার আপনার চরণে এসেছি। আপনি দয়া করুন।

এ কথায় ব্রহ্মচারী রেগে উঠলেন, একটা লাঠি দিয়ে বীরেনকে মারলেন। বীরেন চুপ করে মার খেল, মুখ থেকে উঃ, আঃ কোন শব্দ পর্যন্ত বেরল না। সে পড়ে রইল ব্রহ্মচারী লোকনাথের চরণতলে।

বীরেনের ধৈর্য দেখে ব্রহ্মচারীর মনে কি হল কে জানে। বললেন—যাও, পুকুরে স্নান করিয়ে আন একে।

মনে ভয় যদিও ছিল তবু তাঁর আদেশ মানতেই হবে এই ভেবে পুলিনবাবু ছেলেকে নিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন কাছের পুকুর থেকে। ফিরে যখন এলেন তখন আদেশ হল—একে দৈ ভাত পেট ভরে খেতে দে।

তাঁর আদেশে তাই করা হল। তখন ব্রহ্মচারী বললেন—যা, একে বাড়ী নিয়ে যা।

নিয়ে এলেন বাড়ীতে। কুপথ্য করে পুরনো জ্বর সারল, সকলে আশ্চর্য হল দেখে।

এ প্রসংগ শুনেছিলেন বালক গোপীনাথ ঐ বীরেনের মুখে, শুনে আশ্চর্য লেগেছিল। মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন পরলোকগত ব্রহ্মচারী লোকনাথকে।

সেই বয়সে তাঁর জীবনে সাধুর প্রসংগ এই প্রথম। এর আগে পৌরাণিক কাহিনীতে অনেক তপস্বী ও সাধকের কথা পড়েছেন কিন্তু সে সব চরিত্র বহু দূর জীবনের চিত্র, তত স্পষ্ট নয়। কাছের মানুষ এই লোকনাথ দীর্ঘ-কাল দেহধারণ করেছিলেন। উত্তর জীবনে প্রসংগ ক্রমে বলতেন—'একবার যদি তাঁর দর্শন পেতাম।' একটা আক্ষেপের সুর বাজত কণ্ঠে।

আরো বলেছিলেন—কাশীতে তাঁর প্রধান শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সংগে দেখা হয়, সম্পর্কও হয়েছিল। তাঁর মুখেও লোকনাথ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা শুনবার সৌভাগ্য হয়। ভারতীজী বলেছিলেন, তিনি ছিলেন খুব উঁচুদরের যোগী। এঁর একটি বিশিষ্টতা এই ছিল যে চোখে নিমেষ পড়ত না। বহু দূরের সূক্ষ্ম জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পেতেন। আর একটি ক্ষমতা ছিল যে, তিনি শূন্য মার্গে দূর দূর দেশে যেতে পারতেন।

১৯০৫ জানুয়ারী মাসে টেস্ট পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরীক্ষা ভালই হয় এবং গোপীনাথই হন প্রথম। এবার এনট্রান্স পরীক্ষার পালা। এই দীর্ঘ অবসর তিনি শুধু পড়েই কাটান নি, সামাজিক ও সাহিত্যিক সভায় যোগদান করে অপরাহ্ণের সময় সার্থক করতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ব্রাহ্ম-সমাজের সভা এবং জগন্নাথ কলেজের অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। ঢাকায় আর একটা দিক তাঁকে আকর্ষণ করত সে হল ঘোড়দৌড়। অনেকেই তা দেখতে যেত, তিনিও যেতেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ এ সময় বাড়তে থাকে। একটা শখ সে সময় গড়ে উঠেছিল—সুযোগ হলেই সাহিত্যিকদের ছবি ও হস্তাক্ষর সংগ্রহ করতেন। শুনেছিলেন চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মাঝে মাঝে বিশিষ্ট মণীষীদের হাফটোন ব্লকে ছবি তোলেন। তাঁর সংগ্রহে ছিল বহু ছবি, আচার্যদেব তার মধ্য থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-নাথ (তরুণ বয়স ও বর্তমান বয়স), কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী ও জলধর সেন এই কয়জনের ছবি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। এ ১৯০৫ সালে জানুয়ারী মাসের কথা। ঐ মাসেই রমেশ গ্রন্থাবলী, মহারাজ নন্দকুমার, হরিনাথ দে সম্পাদিত প্যালগ্রেভস্ গোল্ডেন ট্রেজারী, হিতবাদীর উপহার রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, ইয়োরোপ যাত্রীর ডায়রী ও প্রবাসচিত্র পড়ার জন্য আনেন। আর আনেন পরীক্ষার উপযোগী কিছু বই। বন্ধু চৌধুরী

ওঁকে পড়তে দেন নবপ্রকাশিত 'প্রদীপ' ও 'ভারতবর্ষের স্থান বিবরণী' নামে একখানা বই।

অরবিন্দ নামে এক ভদ্রলোক জানুয়ারীর মাঝামাঝি ওঁকে পরীক্ষকদের ইন্সট্রাকসন জানিয়েছিলেন। হুইলার ও পার্সিভাল সাহেব কি জাতীয় উত্তর পছন্দ করেন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা হতে জানিয়েছিলেন। সে যুগে কে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষক থাকতেন ছেলেরা তা পূর্বাহ্নেই জানত এবং সেই ভাবে পাঠ তৈরী করত।

এই ১৯০৫ সাল বাংলা তথা ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে এক নবীন অধ্যায়। এই বছর বাংলা বিভাজিত হয় এবং এর প্রতিবাদে বাংলা দেশবাসী জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে আচার্যদেব এই আন্দোলনে জড়িয়ে না পড়লেও এর আবর্তের একেবারে বাইরে ছিলেন না।

২০শে এপ্রিল ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। সেই সম্মেলনে তাঁকে যে অভিনন্দন জানানো হয় সে সভায় গোপীনাথ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ও আকর্ষক ব্যক্তিত্ব তাঁর সেদিন ভাল লেগেছিল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ভলান্টিয়ার হয়ে দেশসেবার কাজে ব্রতী হয়েছিল। ঢাকায় বিপিন পাল আহ্বান করেছিলেন ছাত্রদের ইংরেজী স্কুলের পড়া ছেড়ে জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে। অভিভাবকদের তিনি সম্বোধন করে বলেছিলেন তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পাঠান। ১৯০৫ সালের উত্তপ্ত পরিবেশে গোপীনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোথায় যাবেন, কোথায় পড়বেন কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোগেশ ঘোষ লিখেছিলেন যে গোপীনাথ যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে ভর্তি হতে চান তাহলে তার সব ব্যবস্থা তিনি করবেন। এদিকে অনাথবন্ধু মৌলিক তাঁর জন্য জগন্নাথ কলেজে পড়ার সব ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু সব ব্যবস্থা তাঁর অনিয়মিত স্বাস্থ্যের জন্য কার্যকর হতে পারে নি। ম্যালেরিয়া তাঁকে বিশেষভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ডাক্তারী চিকিৎসায় উপকার হলেও তাতে স্থায়ী উপকার হচ্ছে না দেখে কেউ কেউ তাঁকে ডাক্তারী ওষুধ খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তখনও তিনি ডি· গুপ্ত নামে ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেতেন। তাতেও কোন স্থায়ী ফল হতে না দেখে অনেক হিতৈষী বন্ধু ও অধ্যাপক তাঁকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে বায়ু পরিবর্তনের কথা বলেন। গোপীনাথের এমন কোন সম্পন্ন অবস্থা নয় যে দূরে কোথাও নিজে ব্যয়-নির্বাহ করে থাকতে পারেন। তাঁর পরিচিত স্বজন সব কাছেই থাকেন, কোথায় যাবেন তিনি?

মনের এই অসহায় অবস্থায় চিঠি আসে কাশী থেকে, লিখেছেন তাঁর মার

সখী। কাশীতে সে সময় খুবই জ্বরের প্রকোপ, তখন ওদিকে না যাওয়াই ভাল।

এ সময় ঢাকা এবং বাংলাদেশের সর্বত্র বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রতিজ্ঞা ঘরে ঘরে সকলে করছে। প্রতিদিন জগন্নাথ কলেজে সভা হত, তবে ঢাকার নবাব ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানগণ এই আন্দোলনের বিরোধী ছিল। বিলাতী জিনিস পোড়ানো হত। পথে চলতে গেলেই কোন না কোন স্বদেশী সভা হচ্ছে দেখা যেত, শুনতেন সে সব আগ্রহ নিয়ে। আবার যখন কোন বিশিষ্ট বক্তা আসতেন—সভায় বক্তৃতা দিতে—নিজের থেকেই যেতেন সে সভায়।

১৯০৫ সালের ২৮শে অক্টোবর অবশেষে গোপীনাথ মাকে সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপের দিকে রওনা হন। মা সুখদাসুন্দরীর গুরুপুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী দান্যা এসেছিলেন। সব কথা শুনে তিনি বলেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁর মধুপুর যাওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে সেখানে তাঁর পরিচিত লোক আছেন, থাকার সব ব্যবস্থা হবে, চিন্তার কোন কারণ নেই। তাঁর এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে এবং নবদ্বীপ গেলে গঙ্গাস্নানের সুযোগ হবে ভেবে মাতা ঠাকুরাণী রাজী হলেন। নবদ্বীপে পূর্বপরিচিত অভয় গোস্বামী আছেন। মাতা ঠাকুরাণী তাঁর আশ্রয়ে থাকবেন আর এই সময় বৃন্দাবন গোস্বামী গোপীনাথকে সঙ্গে করে মধুপুর নিয়ে যাবেন এরূপ ব্যবস্থা করে ওঁরা তিনজনে যাত্রা করলেন দান্যা থেকে। পোড়াবাড়ী থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ, সেখান থেকে ট্রেনে বগুলা স্টেশনে নেমে ঘোড়াগাড়ী করে পৌঁছলেন কৃষ্ণনগর। তারপর নবদ্বীপে অভয় গোস্বামীর কাছে সুখদা-সুন্দরীকে রেখে বৃন্দাবন গোস্বামীর সঙ্গে মধুপুরের দিকে যাত্রা করেন।

এই প্রথম গোপীনাথের পশ্চিমগমন। তাঁরা স্টিমারে কালনা পৌঁছলেন ৩০শে অক্টোবর, ৩১শে স্টিমারে ত্রিবেণী, ত্রিবেণী থেকে মগরা হয়ে রাণীগঞ্জে সেইদিনই পৌঁছলেন।

এই পথের বর্ণনা দিয়েছেন আচার্যদেব—'১লা নভেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্বে রাত ৪-৫০ মিঃ-এ জামতাড়ার টিকিট কাটিয়া ট্রেনে উঠিলাম। ৩৬ মাইল পথ, ভাড়া সাড়ে সাত আনা। যখন সূর্য উঠিল দুই পাশে তাকাইয়া দেখিলাম ধূ-ধূ প্রান্তর—মহুয়া ও শালগাছে পূর্ণ। কোথাও বা তালগাছের অরণ্য, আবার কোথাও বৃক্ষাদিহীন উঁচু নীচু বিশাল প্রান্তর; কোথাও অন্তঃসলিলা বালুবিকীর্ণ শয্যা নদী নিবহ। কোথাও অনুন্নত নীলাভ শৈলমালা, কোথাও শ্যামলবর্ণ শৈলরাশি—মাঝে মাঝে সাঁওতাল কুটির।'

জামতাড়াতে আচার্যদেবের বন্ধু কিরণের মেসোমশায় দুর্গাচরণবাবুর বাড়ী—তিনি ওখানকার এক্সাইজ সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁদের টিকিট ছিল জামতাড়ার, কিন্তু গোঁসাইজী বললেন—প্রথমে মধুপুর যাওয়া যাক্, সেখানে সুবিধা না হলে এখানে ফিরে এলেই হবে।

তাঁদের টিকিট ছিল জামতাড়া পর্যন্তই। তবু মধুপুরেই তাঁরা গেলেন। কোন কাইন লাগল না। ধামরাই থাকতে শুনেছিলেন দেবেন্দ্র রায় থাকেন মধুপুরে, তাঁর বাসায় আশ্রয় পাওয়া যাবে। এই দেবেন্দ্র রায় ছিলেন ধামরাই গ্রামের ভারত সেনের কন্যা গিরিবালার পুত্র। তিনি প্রতিষ্ঠিত সজ্জন এবং মধুপুরে বিশেষ পরিচিত এ কথা তাঁরা আগে শুনেছিলেন। কুলি তাঁদের নিয়ে এল দেবেন মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ী। বাড়ীটির নাম ছিল রোজ ভিলা। বাড়ীর এক অংশে ঢাকা নিবাসী এক ভদ্রলোককে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। সাময়িকভাবে তাঁর বাড়ীতে জিনিসপত্র রেখে তাঁরা দেবেন রায়ের খোঁজে বেরলেন, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও দেবেন রায়ের কোন খোঁজ পেলেন না। কোনভাবে সামান্য জলযোগ সেরে স্টেশন অভিমুখে রওনা হলেন। স্থির করলেন বৈদ্যনাথধাম তো কাছেই সেখানে কোন পাণ্ডার বাড়ীতে উঠে দর্শনাদি সেরে ধীরে সুস্থে সব করা যাবে। এই ভেবে তাঁরা চললেন বৈদ্যনাথধামে।

বৈদ্যনাথে গোপীনাথ রইলেন প্রায় এক মাস, সেখানে নরেশচন্দ্র বসু নামে একটি বাঙ্গালী ছাত্রের টুটার হয়ে তাদের বাড়ীতে থাকতেন। ঐ সময় হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ থাকতেন দেওঘরে। রাজনারায়ণ বসুও ছিলেন তখন সেখানে। একদিন সাহসে ভর করে গোপীনাথ গেলেন শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে পরলোক তত্ত্ব প্রসঙ্গে অনেক কথা হয়। তাঁর এই অল্প বয়সে এ সব বিষয়ে কৌতূহল দেখে তিনি খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন গোপীনাথের প্রতি, বলেছিলেন—সময় পেলে তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করলে তিনি খুশী হবেন।

দেওঘরের শান্ত পরিবেশে তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়। ডিসেম্বরের আগেই তিনি দেওঘর ত্যাগ করেন এবং ঢাকায় ফিরে যান। কদিন পর যান ধামরাই। এখানে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে অক্ষয় দত্তগুপ্তের সঙ্গে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ করে দিন কাটান। দীনেশ সেনের 'রামায়ণী কথা' ও রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকাটি পাঠ করেন বন্ধুরা মিলে। অক্ষয় সরকারের 'পিতাপুত্র', 'বঙ্গভাষার লেখক' ও রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত জীবনী পড়া হয়। অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দিন কাটানো এক স্বর্গীয় সুখ বলে তাঁর তখন মনে হত। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ অথবা সাহিত্য আলোচনা প্রতিদিনের কাজ ছিল; কর্ণকুন্তী সংবাদ, নরকবাস, বিদায় অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি পাঠ হত, তারপর হত আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুরাগ সঞ্চার করেন অক্ষয়বাবু, আবার নিজের স্বভাবেও রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য ও মধুরতা তাঁকে তাঁর কাব্য ও রচনাপাঠে উৎসাহিত করে। রবীন্দ্রনাথের কোন বই প্রকাশিত হবার আগেই পূর্ব হতে নিজের নাম নথিভুক্ত করে রাখতেও পেছপা হতেন না।

অক্ষয়বাবু একদিন তাঁকে তাঁর ডায়েরী দেখতে দেন, তিনি নিজেই দেখতে

দেন। ডায়েরী বাংলায় লেখা; তাতে অনেক কছু জানার আছে। উনি বলতেন, 'ডায়েরী আমিও লিখতাম, তবে অক্ষয়বাবুর ডায়েরী দেখে আমার ডায়েরী লেখার রীতি একটু বদলে যায়। আমার পিতা ডায়েরী রাখতেন, তা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই ডায়েরী রাখার। পরে আমি ডায়েরী রাখার পদ্ধতি নিজ থেকেই উদ্ভাবন করি। আমি তিন প্রকার ডায়েরী রাখতাম: একটি সাহিত্যিক, এতে পঠিত গ্রন্থের নাম, প্রাপ্তিস্থান, বর্ণিত বিষয়, নিজের আলোচনাত্মক টিপ্পনী থাকত। দ্বিতীয় প্রকার ডায়েরী ছিল: হোয়্যার ইজ ইট, এতে বর্ণানুক্রমে বিভিন্ন বিষয় লিখতাম যেমন ব্যক্তি, বস্তু ও ভাব। সংগে সংগে ঐ বিষয় বা ভাবের উৎস কোথায় তাও সন্নিবিষ্ট থাকত। এর ফলে কোন পঠিত বিষয় ছেড়ে যেত না। আর এক প্রকারের ডায়েরী ছিল: ভারতীয় ইতিহাসের সময়ক্রম, এটি আরম্ভ হয়েছিল ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে এবং ভারতীয় ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা ও সময় এতে লিখিত হত।' উত্তর যুগে ডায়েরীর সংখ্যা আরো বেড়েছিল।

অক্ষয়বাবুর সংগে দার্শনিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। তবে বেশী হত দেশী বিদেশী কবি ও কবিতা নিয়ে। সর্বদর্শন সংগ্রহ, ম্যাক্স মুলার-এর সায়েন্স অফ ল্যাংগুয়েজ থেকে পড়া হত, আলোচনা হত। একদিন বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখিত 'বেদান্তের প্রথম কথা' পড়লেন, ভাল লাগল পড়ে। দিন কাটছিল কখনো ভিক্টর হুগোর লা মিজারেবল পড়ে, আবার কখনো বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায়। আবার এই সময় লেখেন রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় যমুনার' ব্যাখ্যা।

শরীর ও মনের এই অবস্থায় ১৯০৬ সালে জুন মাসে রামদয়াল মজুমদারের সংগে দেখা করেন। তিনি তখন টাংগাইল পি· এম কলেজের অধ্যক্ষ। মজুমদার মহাশয় তাঁর পিতার সহপাঠী ছিলেন ফলে স্বভাবতঃই গোপীনাথকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক পুরুষ। তাঁর প্রেরণায় বহু মানুষ ধর্মজীবনে প্রবেশ করার পথ পেয়েছিল। সেদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁকে একটি দার্শনিক প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের এবং সেটি খৃষ্টীয়গণের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা থেকে উদ্ভূত কিন্তু তা হলেও অন্য ধর্মের মানুষের দৃষ্টিতেও এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা আছে—এই ভেবে গোপীনাথ প্রশ্ন করলেন—প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও করুণাময় রূপে বর্ণিত হয়ে থাকে। গোপীনাথের প্রশ্নের তাৎপর্য এই যে ঈশ্বরে এই তিনটি বিশেষণ একই সময়ে প্রযোজ্য হতে পারে না বলে মনে হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে ঈশ্বরে এই তিনটি ধর্মের সহাবস্থান যুক্তিসংগত মনে হয় না, কারণ জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দুঃখকে মায়িক অথবা কল্পিত মনে করলেও এর সমাধান হয় না, কারণ এই দুঃখের সত্তা করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে একটি প্রহেলিকা। প্রশ্ন এই যে করুণা সত্ত্বেও এই জাগতিক দুঃখ

তিনি দূর করেন না কেন? তিনি যে দুঃখের বিষয় জানেন না তা নয়, কেননা তিনি তো সর্বজ্ঞ, আবার এ দুঃখ যে তিনি দূর করতে না পারেন তাও নয়, কেন না তিনি তো সর্বশক্তিমান্।

'এই প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় কি সমাধান করিয়াছিলেন তাহা জানি না, তবে এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি খুব প্রসন্ন হন আমার উপর।'

যে সময় গোপীনাথ টাঙ্গাইল যান ও মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি গীতাব্যাখ্যা লিখছিলেন। অল্পদিন আগে তাঁর 'উৎসব' নামক পত্রিকার সূত্রপাত হয়। উৎসব প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে—এই সাক্ষাৎকারের অল্প কিছুদিন পূর্বে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মজুমদার মহাশয় স্বয়ং এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত কেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ। এই উভয়েই ছিলেন টাঙ্গাইলে কিন্তু উৎসব প্রকাশিত হত কাশীর নারদঘাট থেকে মজুমদার মহাশয়ের শ্যালক ননীলাল রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে। মজুমদার মহাশয় তাঁর স্বাস্থ্য দেখে চিন্তিত হন এবং পরামর্শ দেন কাশীতে গিয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে। তিনি প্রাথমিক বাসস্থান রূপে তাঁর শ্যালকের ঠিকানা লিখে দেন। কিন্তু কাশীতে যাওয়া যখন সম্ভব হল না তবুও গোপীনাথ মজুমদার মহাশয়ের পরিচয়সূত্রটি সযত্নে রক্ষা করেন।

অবশেষে কলকাতা থেকে কোন কলেজে ভর্তি হবেন মনে করে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে কলকাতা আসেন। এখানে এসেও মন স্থির করতে পারছিলেন না। এই ভীড়, কোলাহল এবং অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা তাঁকে চিন্তিত করছিল। এখানে থাকলে ম্যালেরিয়া হবে না তার ভরসা কোথায়? একটি আকাঙ্ক্ষা জাগছিল যদি কোন পশ্চিম প্রদেশে শুষ্ক স্থানে যাওয়া যায় তাহলে হয়ত ভাল হবে। জয়পুরের কথা তাঁর মনে কিভাবে আসে তার এক বর্ণনা দিয়েছেনঃ

'একদিন দান্যা অবস্থান কালে ধর্মানন্দ ভারতী লিখিত এবং বান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দেশভ্রমণ বিষয়ক রচনা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তাহাতে লিখিত ছিল যে এই নগরটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত রমণীয়। নগর নির্মাণের পর তাহাতে লোকের আবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে এইরূপ ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। এই নগরের প্লান প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী শিল্পী বিদ্যাধর চক্রবর্তীর মস্তিষ্কপ্রসূত। সুতরাং এই নগর নির্মাণের সঙ্গে বাঙ্গালীর একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। আরও বলা হয় যশোহর নায়ক বীর প্রতাপাদিত্যের ইষ্ট দেবী যশোরেশ্বরী এখনও জয়পুরের রাজধানী অম্বরে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং পূজা পাইতেছেন। এই হইল বাঙ্গালীর সহিত এই নগরের দ্বিতীয় সম্বন্ধ। ইহা জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী রাজা মানসিংহের সময়কার কথা। জয়পুরের সহিত বাংলার তৃতীয় সম্বন্ধ

গোবিন্দদেবের উপাসনা সংক্রান্ত। ঔরংগজেবের উৎপীড়নের ভয়ে বৃন্দাবন হইতে গোবিন্দদেবকে জয়পুরে আনা হয়। সংগে সংগে পূজকরূপে বাংগালী গোস্বামীগণ এখানে আগমন করেন। ইঁহারা রূপ সনাতনের অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এই হইল বাংলার সহিত জয়পুরের সম্বন্ধের ইতিহাস। ধর্মানন্দ ভারতীর লেখা হইতে আমি আরও জানিতে পারি যে এখনও জয়পুরে বাংগালীর প্রাধান্য আছে, কারণ এখনও জয়পুরের দেওয়ান রাও-বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন বাংগালী, মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বাংগালী, কলেজের প্রিন্সিপাল বাংগালী। তদুপরি আশার কথা এই যে ওখানে পড়িতে গেলে কলেজে ফিস্ দিতে হয় না, শিক্ষা বিভাগ হইতে সমস্ত ব্যয় নির্বাহিত হয়। ইহা ছাড়া টডের রাজস্থান পড়িয়া রাজপুতানার উপর আমার অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। এই সব কারণে মনে মনে ভাবিয়াছিলাম কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে জয়পুর যাওয়া আমার পক্ষে অনুকূল হইবে। মরুভূমির অন্তর্গত শুষ্ক দেশ বলিয়া ম্যালেরিয়ার আশংকা সেখানে নাই। ইহার পর আমি একখানা পুরাতন রেলওয়ে গাইড হইতে জয়পুর সম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম।'

জয়পুর যাওয়া সম্বন্ধে মনে একটা ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তা বলে কলকাতায় পড়ার আশা একেবারে ছেড়ে দেন নি। তখনকার রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সংগে দেখাও করেছিলেন, কিন্তু সব দেখে শুনে কলকাতার ওপর তাঁর আকর্ষণ ক্রমশঃ কমে আসছিল। কল-কাতার বাইরে পশ্চিমে কোন স্থানে যাবার জন্য তাঁর মন আকুল হয়ে উঠ-ছিল। অবশেষে জয়পুরে যাওয়াই স্থির করলেন—সহস্র মাইল দূরত্বও তিনি উপেক্ষা করলেন। আত্মীয়স্বজনহীন অপরিচিত পরিবেশের কথা মনে এলেও তাতে মন বিচলিত হল না।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

রাজস্থান—জয়পুর

'তারপর একদিন (১৪ই জুলাই, ১৯০৬) বড়বাজার হইতে টিকিট কিনিয়া, নিজের যে ট্রাঙ্ক ও বিছানা সঙ্গে ছিল সে সব ওজন করাইয়া রেলের চার্জে রাখার ব্যবস্থা করিলাম, শুধু নিজের টিকিট আর বসবার মোটা চাদর সঙ্গে রহিল। মনে হয় ১৪ই জুলাই রওনা হই; আমার গন্তব্যস্থল ছিল আগ্রা হইয়া। আমার এক বন্ধু সতীশ গাড়ীতে উঠাইতে হাওড়া আসিয়াছিল। রাত্রিতে গাড়ী ছাড়িল এবং একে একে কত স্টেশন পার হইবার পর ১৫ই তারিখে ফরাক্কাবাদে একটি পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত হয়। তিনি ফরাক্কাবাদের অধিবাসী ছিলেন এবং সেনাবিভাগে কাজ করিতেন। সে সময় তিনি ছুটিতে ছিলেন, তাই ছোটভাইকে সঙ্গে করিয়া জয়পুরে যাওয়ার জন্য ঐ গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া শান্ত ও বিনীত মনে হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সঙ্গে ভদ্রলোকটির ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে সঙ্গের ছেলেটি এই বছর এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আমারই মত জয়পুরে মহারাজা কলেজে ভর্তি হইতে যাইতেছে। আমার সঙ্গে ইংরেজী-তেই কথাবার্তা হইতেছিল, কেননা আমি হিন্দী মোটেই জানিতাম না। আরও জানিতে পারিলাম যে জয়পুরে তাহার ভাই আছে, পরিচিত লোকও আছে, থাকিবার উপযোগী স্থানও আছে। এদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।'

পথে টুন্ডলাতে গাড়ী বদলাতে হল এবং আগরা ফোর্ট স্টেশনে নেমে জয়পুরগামী ট্রেনের অপেক্ষায় রইলেন। রাতের গাড়ীতে তাঁরা তিনজন জয়-পুর অভিমুখে চললেন। রাজস্থানের কত গৌরব কথা মনে এল। আকাশে জ্যোস্নার স্বল্পালোকে দূরের প্রান্তর চোখে পড়তে লাগল, সে সব দৃশ্য কত অপূর্ব মনে হয়েছিল সে সময়। গাড়ী যখন জয়পুর পৌঁছল সে সময় রাত শেষ হয়নি বলে শহরে যাবার অনুমতি পাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই কাছেই একটি সরাই দেখে রাতের বিশ্রাম সেখানেই করতে হল।

রাত কাটল সরায়ে, ভাড়া লাগল দু আনা বা চার আনা, খাটিয়ারও ভাড়া দিতে হয়েছিল এক আনা করে। পরদিন সকালে সাথী রামচন্দ্র ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে শহরের দিকে রওনা হলেন। যে ফটক দিয়ে তাঁরা শহরে প্রবেশ করলেন নাম তার চাঁদপোল গেট। শহরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন—

এ শহর ভারতের অন্য কোনো শহরের মতো নয়। দুর্গের মতো উঁচু প্রাচীরে ঘেরা সে শহর, আবার বিভিন্ন দিক থেকে প্রবেশ করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে যেতে হয়। যতই তাঁরা শহরের পথে অগ্রসর হলেন ততই নগরের বিচিত্র শোভা ও বৈশিষ্ট্য অনুভব হতে লাগল। সব সড়ক প্রশস্ত ও সরল, কোথাও প্রয়োজনে বক্র হয়নি। একটি রাস্তা উত্তরে ও দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যে দিকেই গিয়েছে একটি অন্যকে সোজা সরল রেখায় খণ্ডিত করেছে। আবার মাঝে মাঝেই আছে স্কোয়ার, যার ফলে সড়কগুলো নয়নাভিরাম হয়েছে। রাস্তার দুধারে বাড়ীগুলো গোলাপী রংয়ে রঞ্জিত। ছবির মতো এমন শহর গোপীনাথ পূর্বে কখনও দেখেন নি।

তিনি রামচন্দ্র পাণ্ডেয়জীর সঙ্গে একটি বাড়ীতে প্রথমে যান। এ বাড়ীটি মহারাজার হাওয়ামহলের সম্মুখে কোন বাড়ী। এখানে তিনি প্রায় তিন দিন ছিলেন। মহারাজ কলেজও এখান থেকে খুব দূর নয়। খাওয়ার ব্যবস্থা তাঁকে নিজে থেকে করতে হয়েছিল। ফল মিষ্টিই কিনে খেতেন, অন্য কোনো ব্যবস্থা তখন করা সম্ভব ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন হয়ত কলেজের সংলগ্ন কোনো হস্টেল হয়ত আছে, থাকার ব্যবস্থা সেখানেই হবে। শুনে নিরাশ হলেন যে তেমন কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই। শুধু নাম জানতেন সংসারচন্দ্র সেনের। তিনি মহারাজার দেওয়ান, পত্রিকায় এটুকু তিনি পড়েছিলেন। আর কোন খবর জানতেন না। কলেজে বেতন দিতে হয় না —এ কথা সত্য, কিন্তু আর সব ব্যবস্থা কিভাবে হবে কিছুই তখন জানা ছিল না। সাথী পাণ্ডেজীর তো সে ভাবনা ছিল না, তিনি সেখানে পূর্ব থেকেই পরিচিত, তাঁর সব ব্যবস্থা সহজেই হবে—আর তিনি তো ঐ বিদেশে অখ্যাত ও অপরিচিত।

ভাবলেন, কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষ এবং ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? পরদিনই কলেজে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কোনো শিষ্টাচার না মেনে সোজা অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলেন যে অধ্যক্ষের নাম শ্রীসঞ্জীবন গাঙ্গুলী। নাম শুনে আশা হল হয়ত তিনি তাঁকে বাঙ্গালী জেনে ঠিক কি করা দরকার তার একটা সুষ্ঠু নির্দেশ দেবেন।

অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন যে তিনি বসে আছেন এবং আরও একজন সেখান বসে। বাঙ্গালী বলে বাংলাতে কথা বলা স্বাভাবিক হলেও, কলেজের কক্ষে আসীন অধ্যক্ষের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা অশোভন বিবেচনায় ইংরেজীতে নিজের উদ্দেশ্য তাঁকে বললেন।

এর উত্তরে তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন:

'There will be no difficulty regarding your admission here, but you will have to make your own arrangement for your lodging.'

এ কথার উত্তরে গোপীনাথ বললেন, এ অচেনা জায়গায় তাঁর পক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা বিশেষ কঠিন হবে মনে হয়।

এ কথা শুনে পাশে-বসা ভদ্রলোকটি (পরে জেনেছিলেন তিনি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল, নাম মেঘনাথ ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ছোটভাই) বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পূর্ববঙ্গের লোক?

বাংলায় প্রশ্ন শুনে চমক লাগল, বুঝলেন ইনিও বাঙ্গালী। উত্তর দিলেন —হ্যাঁ, আমি পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছি।

তখন মেঘনাথবাবু বললেন, তুমি কাল আমার সঙ্গে ১০/১১টার মধ্যে আমার বাড়ীতে দেখা কোরো। আমার বাড়ীর ঠিকানা কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

তারপর উভয়কে নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন। মন কিছুটা প্রসন্ন, হয়ত সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এবার একটা চিন্তা মনে এল, কি করে দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করা যায়। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ঠিকানা জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কেউ বলতে পারে না, কে সংসারচন্দ্র সেন। মনে হল রাজ্যের যিনি প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কেউ জানে না, এ কেমন আশ্চর্য কথা! তখন একটি ছাত্র তাঁর ভ্রম সংশোধন করল। সে বলল—তোমার বাংলা ঢংয়ে উচ্চারণই এতে দায়ী, তোমার প্রশ্ন তাই কেউ বুঝতে পারে নি। সে বলল—দেওয়ান সাহেব শহরের বাইরে 'হাতরোজ ভিলা' নামক স্থানে থাকেন। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলে দেবে।

এদিকে পাণ্ডেজীর সঙ্গে থাকার সীমা শেষ হল অথচ তখনও কোনো ব্যবস্থা হল না। আলাদাভাবে থাকার একটা ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক, খাওয়ার অসুবিধা তো হচ্ছিলই। এমন সময় একটা অদ্ভুত যোগাযোগ হল সেদিন। ভাবলেন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে এলে কেমন হয়? ছেলেদের কাছে শুনেছিলেন যে তিনি গণিতের অধ্যাপক। সকলে তাঁকে গুরুজী বলে সম্বোধন করে। তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীজীর ছোট ভাই। গোপীনাথ শাস্ত্রীজী লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়েছিলেন। শাস্ত্রীজী যে বঙ্কিম যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সে কথাও তিনি জানতেন।

শহর থেকে স্টেশনের দিকে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। বেলা তখন প্রায় দশটা। এমন সময় রাস্তা থেকে একজন ভদ্রলোক তাঁকে ডাকলেন, মশায়, একটা কথা শুনুন।

ডাক শুনে গোপীনাথ তাঁর কাছে গেলেন। তখন ভদ্রলোক বললেন— আপনি তো বাঙ্গালী? কদিন হল এসেছেন?

গোপীনাথ বললেন, হ্যাঁ, তিন-চার দিন হল এসেছি।

—আপনি এখানে কোথায় থাকেন?

তখন গোপীনাথ বললেন—থাকার কোনো ব্যবস্থা আজও হয় নি, চেষ্টা করছি। আপাততঃ ধর্মশালায় আছি।

তখন ভদ্রলোকটি তাঁকে বললেন—আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

পরে জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর নাম কালীপদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁকে সঙ্গে করে এক বিশাল প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হলেন। মনে হল সে এক বিশাল রাজভবন। তিনি কালীবাবুর সঙ্গে এক বড় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হলেন। প্রকোষ্ঠ অতীব স্নিগ্ধ, একটি বড় জাজিম বিছানো আছে। সব দরজা ও জানালা বন্ধ রয়েছে মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য। কুশনও বিছানো আছে। তাঁকে একটিতে বসিয়ে কালীবাবু ভেতরে চলে গেলেন। প্রায় আধ ঘন্টা পরে এসে তিনি গোপীনাথকে বললেন—আসুন এখানেই ভোজন করবেন।

ভেতরে যাবার পর দেখা গেল ভোজনের রাজসিক ব্যবস্থা হয়েছে। সব প্রকার ভোজ্য তো ছিলই তার উপর ছিল দুগ্ধ ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা। অনেক-দিন পর পরিতোষে ভোজন সমাপ্ত হলো। একজন পরিচারক এসে হাত ধুয়িয়ে দিল।

একটু বিশ্রাম শেষে ভদ্রলোক বললেন—আপনি দূর থেকে এসেছেন, কাউকে চেনেন না, যতদিন কোনো ব্যবস্থা না হয় এখানে চলে আসবেন। খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই হবে।

এর পর হয়ত দু-তিন দিন তিনি সেখানে খেতে গিয়েছিলেন। তারপর গোপীনাথ সংসারচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু তাঁর একান্ত সচিব মহিমচন্দ্র সেন তাঁকে বলেন যে সন্ধ্যা বেলায় এলে দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা হবে, পূর্বে নয়।

সন্ধ্যায় দেখা হতেই তিনি আগ্রহ নিয়ে তাঁর সব কথা শুনলেন। তাঁর একটা ব্যবস্থা হয় এজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র সেনকে নির্দেশ দিলেন। অবিনাশবাবু তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বললেন যে তিনি তাঁর বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রূপে থাকবেন। পড়াতে হবে তাঁর মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রকে। কিন্তু সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছে সারা দেশ জুড়ে, তাই তাঁকে একটা পরিচয়পত্র এনে দেখাতে হবে, তাহলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এর পর জয়পুরে প্রথম কদিন মেঘনাথবাবুর বাসায় থাকতে লাগলেন, খাওয়াদাওয়াও সেখানে হত। তারপর পরিচয়পত্র আসার পর সংসারবাবুর বাসায় স্থায়িভাবে থাকার ব্যবস্থা হল।

অবিনাশবাবুর গৃহে গোপীনাথ অবিনাশবাবুর দুই ছেলের গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হলেন। প্রথমটির নাম ক্ষিতীন্দ্র এবং অন্যটির অভয়পদ। সংসার-বাবুর ছোটভাই পূর্ণবাবু ছিলেন জয়পুর মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ।

গোপীনাথ কলেজে যেতেন পায়ে হেঁটে, প্রায় দু মাইল পথ। কখনো

হয়ত পূর্ণবাবুর ছেলে বীরু ও ধীরুর সংগে রথে করে যেতেন। এ রথ বলদে টানা রথ, চারদিকে ঘেরা, যাতে রোদ বৃষ্টি না লাগে।

তাঁর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াতেন পণ্ডিত সুরজনারায়ণ শর্মা। ইতিহাস ও লজিক পড়াতেন বদ্রীনাথ শাস্ত্রী। সংস্কৃত পড়াতেন পণ্ডিত বীরেশ্বর শাস্ত্রী দ্রাবিড়। তাঁর সংগে কথা হত সংস্কৃতে, কেননা সে সময় তাঁর হিন্দী বলার অভ্যাস হয়ে ওঠেনি। পণ্ডিত সুরজনারায়ণজী আদর্শ পুরুষ ছিলেন, নীতিবোধ ছিল প্রখর। কখনো পাঠ্য বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তি হলে ছাত্রদের বাড়ী গিয়ে নিজ ভুল স্বীকার করে আসতেন। নিজের দোষ ত্রুটির কথা সকলের সামনে স্বীকার করতে তাঁর কোনো সংকোচ ছিল না।

ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন নবকৃষ্ণ রায়। তাঁর প্রসংগে আচার্যদেব বলতেন—'অধ্যাপনায় এ'র খুব সুনাম ছিল। সেক্সপিয়ার ও মিলটন খুব ভাল পড়াতেন। প্রথম প্রথম আমার সংগে পরিচয় হয়নি, কারণ তিনি পড়াতেন সেকেণ্ড ইয়ারে, আমি তো নবাগত। পরে শুনেছিলাম বিখ্যাত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের তিনি অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আচার্য শীল কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে যাবার আগে যখন বহরমপুরে কলেজে ছিলেন তখন তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসেন।

তারপর একদিন নববাবুর সংগে পরিচিত হবার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়। একদিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুরজনারায়ণজী কলেজে আসেন নি। সেদিন তাঁর জায়গায় পড়াতে এলেন নবকৃষ্ণবাবু। আমাকে নবাগত বাংগালী ছাত্র দেখে আমার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইংরেজীতে আমার কেমন অধিকার জানতে আগ্রহী হন। তিনি আমার যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য ওয়াডর্স-ওয়ার্থের একটি সনেট ব্যাখ্যা করতে দেন। এ কবিতার প্রথম পংক্তি ছিল—'The world is too much with us.'

গোপীনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরম ভক্ত ছিলেন। ঢাকা থাকার সময় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্রের নোট তাঁর পড়া ছিল। তাই নববাবুর দেওয়া কবিতাটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি যতটা সম্ভব ভালভাবেই করলেন।

আচার্যদেব বলেছেন, "নববাবু ঐ ব্যাখ্যা পড়িয়া এত বিস্মিত হইয়াছিলেন যে তিনি মুক্তকণ্ঠে সব ছাত্রের সমক্ষে বলিলেন—'ইহা এত সুন্দর হইয়াছে. বোধ হয় আমিও ইহা অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারিতাম না'।"

নববাবুর সংগে গোপীনাথের ঘনিষ্ঠতার এই হল সূত্রপাত। এই পরিচয়ের ফলে নববাবু প্রিন্সিপালকে সুপারিশ করে লিখলেন যে গোপীনাথের ১৫ টাকার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক। সুপারিশ কার্যকরী হল এবং প্রথম বার্ষিক শ্রেণী হতেই তিনি ১৫ টাকার বৃত্তি পেতে লাগলেন। বার্ষিক পরীক্ষার ফল সব থেকে ভাল হওয়াতে এই বৃত্তি চলতে লাগল।

নববাবু থাকতেন ঝুমুর বাগের একটি বাড়ীতে। সেখানে মাঝে মাঝে

গুরুশিষ্যে সাক্ষাৎ হত এবং অনেক অন্তরঙ্গ কথা হত। তিনি একদিকে ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী আচার্য শীলের ছাত্র, তাঁর ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী, আবার অন্যদিকে ছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির দীক্ষিত শিষ্য। রামকৃষ্ণ কথামৃতে যে শশধর তর্কচূড়ামণির প্রসঙ্গ আছে এই সেই তর্কচূড়ামণি। এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রও এই শশধরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গোপীনাথ যখন জয়পুরে যান তখন সেখানে অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেন পূর্বে ছিলেন মহারাজার শিক্ষক, পরে প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। যখন পূর্বতন দেওয়ান কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেহাবসান হয় তখন সেন মহাশয় তাঁর স্থানাপন্ন হন। সংসারবাবুর এক ভাই হেমচন্দ্র সেন দিল্লীতে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। সংসারচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্র সেন ছিলেন মহারাজার সহকারী একান্ত সচীব। একান্ত সচিব ছিলেন মতিলাল গুপ্ত।

অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও তৎকালে আমেরিকা প্রবাসী ধর্মানন্দ ভারতীর ভাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও ভাগিনেয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই গোপীনাথের সঙ্গী ও সুহৃদ ছিলেন। এঁদের বাসস্থান ছিল শহরের বাইরে।

ছোটবেলা থেকেই গোপীনাথের ছিল বই পড়ার অভ্যাস। ঢাকায় থাকতে সাধারণ গ্রন্থাগার, উকিল আনন্দ রায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে তাঁর ছিল অবাধ গতি। তখন ইংরেজী সাহিত্য ছাড়াও ধর্ম দর্শন কবিতা তো পড়তেনই আর পড়তেন রবীন্দ্রনাথের বই। জয়পুরে এসে খোঁজ পান শহরে আছে বিরাট পাবলিক লাইব্রেরী। বোধ হয় এটি পূর্বে রাজা রামসিংহের সময়ে স্থাপিত হয়। এখানে যে শুধু অনেক বইয়ের সংগ্রহই ছিল তা নয়, এতে ছিল বহু দুর্লভ গ্রন্থের সংগ্রহ। সে সময় শুনেছিলেন যে ইংলিশ চ্যানেলের এপারে ক্রিশ্চিয়ান থিওলজি সম্বন্ধে এত বড় পুস্তক সংগ্রহ আর কোথাও নেই। এই গ্রন্থাগারটি অবশ্য অন্য অন্য গ্রন্থেও সমৃদ্ধ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ ছিল এর গৌরব, তার উপর ভারতীয় ইতিহাসের বই, আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলী এবং দর্শনের বই। আচার্যদেব বলেছিলেন একদিন, 'জয়পুরে থাকতে থিওলজির বই খুব পড়তাম, অন্য বইও পড়তাম। কখনো কলেজ যাবার পথে আবার কখনো কলেজ থেকে ফেরার পথে।'

এই গ্রন্থাগার ছাড়াও ছিল কলেজ লাইব্রেরী: তার সংগ্রহও মন্দ ছিল না, তবে বাংলা বইয়ের অভাব ছিল। সে অভাব মিটেছিল সংসারবাবুর পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে। 'বাংলা বই পড়ার শখ মেটাতাম কান্তিবাবুর নিজ সংগ্রহ থেকে। প্রায়ই এসব জায়গায় যেতাম।'

সংসারবাবুর বাড়ীতে থাকা আরম্ভ হয় অগাস্ট মাস থেকে। সে সময়

স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশ জুড়ে চলছিল। বন্ধুদের পত্রে জানতে পারতেন সব খবর। তারা লিখত বিপিন পালের প্রাধান্য বাড়ছে আর সুরেন্দ্র ব্যানার্জির প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

১৬ অক্টোবর এক বিশেষ দিন। ঐদিনই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। তার বার্ষিক স্মৃতি চলছিল দেশ জুড়ে। সেদিন ঘরে ঘরে অরন্ধন ও রাখীবন্ধন পালিত হয়। জয়পুরেও আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছয়। এখানে বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে অরন্ধন উদ্‌যাপিত হয় এবং সকলে ঐক্যের প্রতীক রাখী হাতে পরেন। রাখী এসেছিল কলকাতা থেকে পার্শেলে।

গোপীনাথের মনে রাজনীতির সম্পর্ক খুব নিবিড় না হলেও দেশের রাজনীতির ও আন্দোলনের গতি প্রকৃতি জানবার জন্য তিনি নিয়মিত 'বন্দেমাতরম্' পড়তেন।

এদিকে কলেজে পড়াশুনো নিয়মিত চলছিল। প্রথম মাসিক পরীক্ষায় তিনিই প্রথম হন। মেঘনাথবাবুর তিন ছেলে ব্রজগোপাল, নৃত্যগোপাল ও মঞ্জুগোপাল এঁরা ছিলেন গোপীনাথের সাথী। তাঁদের সঙ্গে কখনো ভ্রমণে, কখনো নানা বিষয়ে আলোচনায় সময় কাটাতেন। আবার কখনো কবিতা লিখতেন, বন্ধুদের ও আত্মীয়দের কাছে পত্র লিখতেন। পত্র লেখা তাঁর অভ্যাস ছিল বহুকাল।

এসময়কার বিশেষ ঘটনা হল গোপীনাথের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের, কলিকাতা অধিবেশনে গমন। মনে উৎসাহ খুব। তাঁর উৎসাহ দেখে মেঘনাথবাবু প্রথমে খুব খুশী হতে পারেন নি, কেন না গোপীনাথের মাসিক পরীক্ষা খুব কাছেই, তা ছেড়ে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করা কোনো মতেই উচিত নয়, কিন্তু পরে বললেন—'যার মধ্যে স্বদেশপ্রেম আছে তার যাওয়াই উচিত।'

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতা পৌঁছলেন গোপীনাথ। বন্ধু সতীশ মল্লিকের বাড়ী এসে উঠলেন। এই পরিবার তাঁর ধামরাইয়ের পরিচিত। কলকাতার এগজিবিশন দেখলেন, তাতে আছে ঢাকার সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান, মিনিয়েচার রেলওয়ে টানেল, ওয়াটার ফল্‌স্, গ্রাণ্ড অ্যালপাইন রেলওয়ে, ও আরো কত কি। কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে অগণিত লোক। ডেলিগেট ছিল ছয় হাজারেরও বেশী।

দাদাভাই নৌরজী ছিলেন সভাপতি। বক্তা ছিলেন লালমোহন ঘোষ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, দেশমুখ, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, নাথু রায় প্রভৃতি। একদিন বোম্বাইয়ের 'স্বদেশী বস্ত্র সভার' অধিবেশন হয়। সেদিন বক্তা ছিলেন সুরেনবাবু, বিপিন পাল, খাপারদে, তিলক, শংকরানন্দ স্বামী প্রভৃতি। সুরেনবাবু বললেন :

'Let us all be Swadesi in our actions, Swadesi in our ideals, and Swadesi in our aspirations. Let the Swadesi spirit

penetrate through and through, so that in fulness of time we may bring back the glories of the Past.'

ঠিক এই ধরনের কথা অন্য একটি সভায় বরোদার গাইকোয়াড়ও বলেছিলেন।

কলেজে ছাত্ররূপে গোপীনাথ যে শুধু নিজ মেধা ও প্রতিভায় অধ্যাপকগণের চিত্ত জয় করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সহপাঠী ছাত্রগণও তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। ঢাকায় তাঁর পরিচিত বন্ধু ছিল অনেক। সুদূর জয়পুরে এসে পত্র মারফৎ তাদের সংগে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সেসব পত্র কোনোটা হয়ত কবিতায় লেখা আবার কোনোটা সংস্কৃতে বা ইংরেজীতে। তা যে বয়োধর্ম অনুসারে আবেগ ও উচ্ছ্বাসবর্জিত হত না তা নয়, কিন্তু সর্বদাই যে সুর ধ্বনিত হত তা ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। জয়পুর হতে বছরে একবার দেশে যেতেন। তখন দান্যা থেকে আরম্ভ করে কাঠালিয়া, ধামরাই, ঢাকা, করটিয়া প্রভৃতি নানা জায়গায় ঘুরে আবার জয়পুরে ফিরে আসতেন। ফেরার পথে কিংবা যাবার পথে নৈহাটি হয়েও আসতে হত। সেখানে মেঘনাথবাবুর পৈতৃক বাড়ী। এখানে তাঁর আত্মীয়-গৃহ বলেই মনে হত, যেমন জয়পুরে মেঘনাথবাবুর বাড়ী তাঁর গুরুগৃহ, এও তেমনি।

মেঘনাথবাবুর সংগে সম্পর্কে এসে গোপীনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের বহু অজ্ঞাত তথ্য জানতে পারেন। মনে একসময় কল্পনা ছিল আরো ভালো করে অনুসন্ধান করে বঙ্কিম-জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখবেন। মেঘনাথবাবু বঙ্কিমবাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁরা উভয়ই নিকটবর্তী গ্রাম নিবাসী। বঙ্কিমবাবু যখন চুঁচুড়াতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তখন মেঘনাথবাবু হুগলী নর্মাল স্কুলে শিক্ষক। বাড়ী থেকে নৌকোয় গংগা পার হয়ে তিনি প্রতিদিন স্কুলে যেতেন। ফেরার সময় নৌকো পেতে দেরী হলে বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় বিশ্রাম করতেন। সেই অবসরে নানা ধরনের কথাবার্তা হত বঙ্কিমবাবুর সংগে। মেঘনাথবাবু বলেছিলেন গোপীনাথকে—যেদিন আনন্দমঠ লেখার সূচনা সেদিন তিনি বঙ্কিমবাবুর গৃহেই উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর সংগে তাঁর কত কথা হত। সেসব কথা ও বিবরণ গোপীনাথ শুনেছিলেন। একদিন বহু প্রসংগ হয়েছিল মেঘনাথবাবুর সংগে বঙ্কিমকে নিয়ে, নোট করে নিয়েছিলেন সেসব, একদিনে নয় ধীরে ধীরে অনেকদিন ধরে। আশা ছিল নিজে বঙ্কিম জীবনী লিখবেন, না হলে কোনো উদ্যোগী সাহিত্যিকের হাতে তুলে দেবেন সব, তাহলেও কিছু কাজ হবে ও শ্রম সার্থক হবে।

মেঘনাথবাবুর সংগে গোপীনাথের আলোচনা হত নানা বিষয়ে। একদিন বললেন—অম্বররাজগণ মোগলদের হাতে কন্যা দান করেছেন বলে যে অপবাদ

প্রচলিত আছে তা বোধ হয় মিথ্যা। সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ও ঐরূপ মত পোষণ করতেন।

একদিন মেঘনাথবাবু বললেন—বঙ্কিম রচিত লোকরহস্যের অন্তর্গত 'গর্দভ' নামক রসরচনার উৎপত্তির ইতিহাস।

বঙ্কিমের বিরোধী লেখা পড়ে অনেক সময় গোপীনাথের ভাল লাগত না। মহেন্দ্রনাথ মজুমদার একসময় রংপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর রচিত 'সাহিত্য ও সমাজ' পুস্তকে তিনি বঙ্কিমী ভাষাকে 'অযোনিসম্ভবা' বলে শ্লেষ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন—'এই ভাষার অনুকরণে বঙ্গ ভাষার গৌরব, ওজস্বিতা ও বৈভব বর্দ্ধনের পথে কণ্টক রোপণ হইতেছে।' কিন্তু গোপীনাথের মনে হয়েছিল কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের কথা। তিনি বঙ্কিমের ভাষা সম্বন্ধে বলেন—'উহা কখনো মুগ্ধার ন্যায় মধুর হাস্যে চিত্ত বিনোদন করে, কখনো প্রগল্ভার বঙ্কিম কটাক্ষে চিত্ত বিদারণ করে। কখনো ভাবের আবেশে আপনা হইতেই দুলিয়া দুলিয়া পড়ে। কখনো মৃদু সমীর সঞ্চালিত তরঙ্গিনীর ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া খেলিয়া যুগপৎ নয়ন মন বিমোহিত করে।'

আবার সেই সঙ্গে গোপীনাথের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম সমালোচনা—'বঙ্কিম বঙ্গ ভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন সেই পুণ্য-স্রোত স্পর্শে জড়ত্ব-শাপ মোচন করিয়া প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।'

গোপীনাথের মন এইভাবে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিজ ভাবনার যোগ অক্ষুন্ন রেখে চলছিল। এইভাবে নানা প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যরসিক মন পরিপুষ্টি লাভ করছিল। ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, লাটিন, জার্মান, রাশিয়ান ভাষার নানা ক্লাসিকস্ অধ্যয়নও চলছিল। তবে মুখ্যতঃ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অধ্যয়নে তাঁর মন যতটা রস গ্রহণ করত অন্য কিছুতে তেমন নয়। তখন নিয়মিত পত্র পত্রিকাদি পড়তেন। ঢাকায় বান্ধব পড়ার সুযোগ ছিল, এখানে লাইব্রেরীতে (ব্যক্তিগত) অংকুর, প্রবাসী, ভান্ডার নিয়মিত পড়তেন। আর দীর্ঘ চার বছরে জয়পুরে থাকতে বহু বই পড়েছিলেন। আর্থার ভেনিসের ইংরেজী অনুবাদ 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' ও 'বেদান্ত পরিভাষা'ও পড়েছিলেন। জয়পুরে তাঁর এক বন্ধু জুটেছিল সে অধ্যক্ষ সঞ্জীবন গাঙ্গুলীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তার নাম ছিল সুচিন্তন গাঙ্গুলী। সে ছিল সুকণ্ঠ গায়ক; সে যখন গান গাইত তখন গোপীনাথের মনে পড়ত বাল্যবন্ধু দীনেশের কথা। সেও ভাল গান গাইত। দুজনেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। গোপীনাথ মুগ্ধ হতেন সে গান শুনে।

মাঝে মাঝে অবসর হলেই বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন শহর ছাড়িয়ে

দূরে পাহাড় ও উপত্যকার দিকে। সকালে বিকেলে বাগানে বসে পড়তেন। অন্য ছেলেও এসে জুটত। প্রসিদ্ধ সন্ত দাদুর সমাধি দর্শন এবং অম্বর দর্শন সে সময় ঘটেছিল।

যখন গোপীনাথ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন জয়পুর শহরে প্রচণ্ড প্লেগ দেখা দেয়। প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা একশ/একশ পঁচিশ দাঁড়ায়। শহর থেকে বহুলোক ভয়ে ও নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র গমন করেন।

এই সময় অর্থাৎ মে মাসের প্রথমে মা সুখদাসুন্দরী লিখে পাঠান দেশে আসবার পথে ঠাকুরদা দীনবন্ধু কবিরাজের সঙ্গে যেন দেখা করে আসেন। তিনি দীর্ঘকাল কাশীতে আছেন, বৃদ্ধ হয়েছেন, কদিন থাকবেন বলা যায় না। ইনি যদিও পিতামহ কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়। তিনি থাকতেন ১৩৮নং দেবনাথপুরায়।

কাশীতে এসে কদিন ছিলেন। এই প্রথম কাশীতে আসা। একজন ছেলেকে সঙ্গে করে কাশীতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন, সারনাথ দর্শন, গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ প্রভৃতি করেন।

জয়পুরে ১৯০৯ সালের মে মাসে সংসারচন্দ্র সেন পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রয়াণে গোপীনাথ বিশেষ দুঃখিত হন। তাঁর শ্রাদ্ধ হয় বহু সমারোহে। জয়পুরের মহারাজা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করেন। ভারতবর্ষের বহু স্থান থেকে মনীষী পণ্ডিতের সমাগম হয়। বঙ্গদেশ থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, ম. ম. যদুনাথ সার্বভৌম, আসেন ম. ম. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ম. ম. কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। তাঁদের দর্শন করে ও শাস্ত্রার্থ শুনে নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল যুবক গোপীনাথের।

এবার যখন জয়পুর ছেড়ে দেশে যান তখন ঠিক করেন চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। চন্দ্রনাথবাবু বঙ্কিম যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। মেঘনাথ-বাবুর কাছ থেকে একখানি পরিচয়পত্র নিয়ে গেলেই হবে। আর একখানি পরিচয়পত্র নেন ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু তার আগেই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ এসে গেল। কিভাবে হল তাই বলি।

মেঘনাথবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ম· ম· হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জয়পুর আসেন অক্টোবর মাসে। তিনি এসে উঠেছিলেন মেঘনাথবাবুর বাড়ীতে। গোপীনাথ তাঁকে দর্শন করেন কয়েকবার। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সঙ্গে তাঁর সহপাঠী গঙ্গাশরণ ও উদয়রাজ চারণ ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ম্যাক্সমুলার-এর রেনেসাঁস সম্বন্ধে, কৃষ্ণমাচার্য, শতাবধানী, শ্রীরামশাস্ত্রী, সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ম্যাক্সমুলের-এর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত মানতেন না। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর নেপাল ভ্রমণের সুন্দর বর্ণনা দেন সে সময়। তিনি প্রসঙ্গতঃ বলেছিলেন যে একদিন নেপাল ভ্রমণকালে কোনো উপত্যকায় তিনি যে কোকিলের কুহুধ্বনি শুনেছিলেন তার কোন তুলনা নেই।

ঐ ধ্বনি যেন 'হোল কনকেভ অব হেভেন' প্লাবিত করে ১০ মাইল পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

জয়পুরে জ্যোতিষ যন্ত্রালয় ভারত বিখ্যাত। একদিন গোপীনাথ ঐ যন্ত্রালয় দেখতে যান। কেদারনাথজী ঐ যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যরসিক। বম্বে থেকে 'কাব্যমালা' সিরিজে যে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হত তার সম্পাদক ছিলেন তিনি। বাংলা ও মারাঠী ভাষা তিনি ভালভাবে জানেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা হয় সংস্কৃতে।

আবার প্লেগ দেখা দিল পর বছর। এবার ঠিক হল জয়পুর হতে দূরে থাকবেন কোন নির্জন স্থানে, তাহলে পড়াশুনার সুবিধা হবে। ঠিক হল যে ঠাকুর হরিসিংহের নিজ স্থান বস্সীতে থাকবেন। সেখানে যেতে হলে জয়পুর থেকে ট্রেনে কিছুদূর গিয়ে তারপর ঘোড়ায় বা পায়ে হেঁটে যেতে হয়।

ঠাকুর হরিসিংহ পূর্বে জয়পুরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি নিজ গ্রাম হরিপুরায় থাকেন। একদিন তিনি গোপীনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। প্রায় তিন চার ঘণ্টা বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গোপীনাথের সঙ্গে আলোচনা করে জানলেন নানা কথা। অত্যন্ত খুশী হলেন কথা বলে। বললেন—আপনার বি-এ পরীক্ষা হলেই আমার গ্রাম হরিপুরায় আসবেন। আপনি এলে আমি সত্যি খুশী হব। প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় যে এই ঠাকুর হরিসিংহ কোনো কারণে জয়পুর মহারাজার বিরাগভাজন হন এবং জয়পুর প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হন।

২৮শে মার্চ এলাহাবাদে বি-এ পরীক্ষা আরম্ভ হয়। গোপীনাথ অন্য আরও কয়েকটি ছেলের সঙ্গে সে সময় জয়পুর হাউসে ছিলেন। পরীক্ষা ভালভাবে সম্পন্ন হয় এবং তিনি আবার জয়পুর ফিরে আসেন। মঞ্জু ও ব্রজ তখন নৈহাটিতে। তারা দুজনে অনুরোধ করেছিল তিনি যেন দেশে যাওয়ার পথে নৈহাটিতে নেমে দুএক দিন সেখানে থেকে যান, তাতে লাভ হবে, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হবে ও শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বার্ডিক ক্লনিক্যাল রিপোর্ট' সেখানে দেখতে পাবেন এবং সেই সঙ্গে বাল্মীকির জয়ের ইংরেজী অনুবাদও দেখা হবে।

যাত্রার কয়দিন আগে অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায় নিজের একখানা ফোটো এনডোর্স করে গোপীনাথকে বিদায় উপহার দিলেন।

২৫শে এপ্রিল জয়পুর থেকে রাতে রওনা হন। প্রথমে কলকাতায় পোঁছে পরে নৈহাটি যান। ১লা মে তারিখে মঞ্জু ও ব্রজর সঙ্গে সাহিত্যিক অক্ষয় সরকারের সঙ্গে দেখা করতে যান, আর যান কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমবাবুর বাড়ী দেখতে।

জয়পুরের চার বছরের অধ্যয়ন শেষ হল, এরপর পরবর্তী ভাবনা।

ঢাকা থেকে যখন জয়পুর যান তখন গোপীনাথ জয়পুর যাওয়ার নির্ণয় নিজে নিয়েছিলেন। অবশ্য গুরুজনদের পরামর্শ জানবার চেষ্টাও করেছেন।

দেখা করেছেন পিতৃবন্ধু রামদয়াল মজুমদারের সঙ্গে। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু নানা বিরোধী কার্যকারণ উপস্থিত হওয়ার ফলে সংকল্প বা কল্পনা বাস্তবে পরিণত হতে পারে নি। তিনি বলেছিলেন কাশীতে গিয়ে ইণ্টার ও বি-এ পড়তে। থাকার অসুবিধা ছিল না, কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি।

এবার বি-এ পরীক্ষা শেষ হল, আবার নতুন করে পড়ার চিন্তা। কোথায় থাকবেন, কোথায় কোন্ কলেজে পড়বেন তার কোন স্থিরতা ছিল না। কলকাতা বড় শহর, সেখানে খরচ বেশী, সেখানে স্বাস্থ্যও তাঁর শরীরের অনুকূল নয়।

ছোট বয়স থেকেই প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান, সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের জীবনের কথা, তাঁদের রচিত গ্রন্থ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগত।

জয়পুর থেকে ফিরে প্রথমে কলকাতা আসেন। একটি পরিচয় পত্র সঙ্গে এনেছিলেন, দিয়েছিলেন জয়পুরের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায়। এ পরিচয় পত্র ছিল আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য।

তাঁর মনও গোপীনাথের ভবিষ্যৎ চিন্তায় একটু উৎকণ্ঠিত ছিল। এই প্রতিভাশীল প্রিয় শিষ্যটি কোনো ভাল জায়গায় পড়বার সুযোগ পায় এ-ভাবনা তাঁর ছিল। তাই বার বার গোপীনাথকে বলেছিলেন কলকাতা গিয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা করতে।

আচার্য শীলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ গোপীনাথ নিজে দিয়েছেন।

জয়পুর থেকে বি-এ পরীক্ষা দিতে গোপীনাথ এলাহাবাদ আসেন এবং স্থির করেন কলকাতা হয়ে দেশে ফেরার পথে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁর পরামর্শ মতো ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করবেন।

কিভাবে আচার্য শীলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় সেকথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। 'সে আজ ৬৬ বৎসর পূর্বের কথা। বোধ হয় ১৯০৩ সালের কথা হইবে তখন আমি প্রথম ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম ও যশের কথা শুনি। আমি তখন ঢাকা জুবিলী এনট্রান্স স্কুলে পড়ি। আমাদের গ্রামের (কাঁঠালিয়া) নিকটস্থ দেওহাটা নামক একটা ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। সেখানে অবিনাশ চন্দ্র সরকার নামে একটি ছেলের বাড়ী ছিল। ছেলেটি আমা অপেক্ষা তিন চার বছরের বড় ছিল। সে খুবই দরিদ্র ছিল কিন্তু ছোটবেলা হইতেই বিদেশে থাকিয়া স্বাবলম্বনে অর্থাৎ ছাত্র পড়াইয়া কোন প্রকারে লেখাপড়া করিত। পূর্বে ঢাকায় থাকিয়া পড়িত পরে বি-এ পড়িবার জন্য কুচবিহারে যায় এবং ভিক্টোরিয়া কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হয়। সে গরমের ছুটিতে দেশে আসিত এবং সে সময় আমার সঙ্গে দেখা করিত।......তারই মুখে সর্ব প্রথম বিশেষভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কথা শুনি। পরে অবশ্য শীল মহাশয় সম্বন্ধে বহুস্থানে তাঁহার অসাধারণ সর্ববিষয়ক জ্ঞানের

কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু অবিনাশবাবুই তাঁহার কথা সর্ব প্রথম শুনাইয়াছিলেন।

তখন শীল মহাশয় ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ও গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সমান অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যান সকল ছাত্র বুঝিতে পারিত না। তাঁহার রচনাশৈলীও সকলের বোধগম্য হইত না। অতি সরল জীবনধারা এবং অসামান্য জ্ঞানগরিমা—ইহাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

আমার 'একাডেমিক লাইফ'-এর প্রথমটা ঢাকায় কাটে। তাহার পর চার বৎসর (১৯০৬-১৯১০) রাজস্থান, জয়পুরে। উভয় স্থানেই নানা প্রসংগে শীল মহাশয়ের জ্ঞানগরিমার বিবরণ শুনিতে পাইতাম। খুবই ইচ্ছা হইত একবার তাঁহার দর্শন লাভ করিতে।

যখন জয়পুরে কলেজে পড়িতাম তখন আমাদের বি-এ ক্লাশে ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন নবকৃষ্ণ রায়। তিনি ইংরেজী খুব ভাল পড়াইতেন। বহু রেফারেন্স দিয়া পাঠ্য বিষয় পরিস্কার করিতেন এবং লিখিতেনও খুব ভাল। আমাকে তিনি খুব স্নেহ করিতেন। আমার পড়াশুনার বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যের ব্যাপকতর অধ্যয়নের জন্য ও আমার লেখন-শৈলীর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। তাঁহার বাসা আমার আবাসস্থল হইতে নিকটেই ছিল—তাই অনেক সময় তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম।

নববাবু ছিলেন শীল মহাশয়ের ছাত্র—তৎকালে অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু যখন বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ নববাবু সেই সময়ের ছাত্র। ইহা শীল মহাশয়ের কুচবিহার যাইবার পূর্বেকার কথা। নববাবু শীল-মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের কথা আমাকে বলেন এবং আদেশ করেন সম্ভব হইলে উহা যেন আমি একবার পড়িয়া দেখি। প্রবন্ধটির নাম—'নিও রোমান্টিক মুভমেন্ট ইন বেংগালি লিটারেচার।' প্রবন্ধটি ক্যালকাটা রিভিউ (১৮৯১-৯২) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম তিনি এম-এ পরীক্ষার কয়েক বৎসর পর উহা রচনা করিয়াছিলেন। আমি জয়পুর পাবলিক লাইব্রেরীর মেম্বর ছিলাম—ঐ স্থান হইতে ঐ পত্রিকা সংগ্রহ করি এবং পড়িয়া মুগ্ধ হই। মনে হইয়াছিল—তাঁহার রচনা শক্তি অদ্ভুত। উহাতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বয়সের রচনার ভূয়সী প্রশংসা আছে। তাঁহার ইংরাজী রচনা একটু জটিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাঁহার সরল রচনাতেও যে তিনি অতি দক্ষ ছিলেন তাহা তাঁহার লিখিত পত্রাবলী পাঠে জানা যায়। উক্ত পত্রাবলীর কোন সংকলন আমি দেখি নাই, তবে নববাবুর নিকট লিখিত বহু সংখ্যক পত্র আমি দেখিয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক রচনা হইতে এগুলি যেন অত্যন্ত পৃথক। অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাণের অন্তর্নিহিত গভীর বেদনার দ্যোতনা আমি দেখিতে পাইতাম। তাঁহার একখানা পত্র দেখিয়াছিলাম—তাতে লেখা

ছিল, আর কয়েক বৎসর পরেই তিনি পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিবেন, যখন প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে 'বনং ব্রজেৎ'—সক্রিয় জীবন হইতে অবসর গ্রহণের নির্দেশ। আমার দেখা সবগুলি পত্রেই জীবনের লক্ষ্যবস্তুর দিকে একটা অব্যক্ত বিষাদের সুর যেন ধ্বনিত হইত বলিয়া মনে হইত। এক কথায় ফ্রাসট্রেশন অব লাইফ। আমার বেশ মনে আছে—এক স্থানে লিখিয়াছিলেন কথা প্রসঙ্গে —'ফলহীন বৃক্ষের কাছে সাধলে কাঁদলে ফলবে কি?'

নববাবু তাঁহার ছাত্র হইলেও তাঁহার সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে পত্র ব্যবহার চলিত। তিনি তাঁহার নিকট মনের ভাব গোপন করিতেন না।

যদিও বহরমপুরে থাকার সময় হইতেই নববাবু পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন এবং নিজে সংরক্ষকপন্থী ছিলেন—নিষ্ঠাবান সদাচার-পরায়ণ হিন্দু ছিলেন এবং শীল মহাশয় কঠোর ব্রাহ্ম ছিলেন, তথাপি ভাব-রাজ্যে উভয়ের ক্রমে ক্রমে মিলন হইল। শীল মহাশয় শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাখ্যার উপর কটাক্ষ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তথাপি নববাবুর সঙ্গে তাঁহার যে আন্তরিক যোগ ছিল অতি গভীর তাহাতে সন্দেহ নাই।

নববাবু প্রায়ই বলিতেন—'তুমি ব্রজেন্দ্র শীল ও শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে অবশ্য অবশ্য দেখা করিবে। এই দুই মহান ব্যক্তিই আমার জীবনের আদর্শ। আশা করি তাঁহাদের প্রভাব তোমার জীবনেও পতিত হইবে।' বস্তুতঃ ঐ সময়ে আমি বিশিষ্ট পুরুষদের দর্শন লাভের জন্য খুব ব্যাকুল ছিলাম।

*

এর পর যুবক গোপীনাথ জয়পুর ত্যাগ করে বি-এ পরীক্ষার জন্য যাত্রা করেন। তখন জয়পুর এলাকার কলেজসমূহ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। সুতরাং পরীক্ষার্থীকে এলাহাবাদ এসে পরীক্ষা দিতে হত। জয়পুর ছাড়ার আগে নববাবু আচার্য মহাশয়কে যুবক গোপীনাথের হাতে একখানি পরিচয় পত্র দেন এবং নির্দেশ দেন যে আচার্য শীলের সঙ্গে দেখা করতে এবং কি বিষয়ে আলোচনা হল তা-ও যেন তিনি পত্রে লিখে জানান। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, তিনি সুদূরে একাকী বিদেশে পড়ে আছেন— 'রিমোট, আনফ্রেণ্ডেড, মেলাঙ্কলি, স্লো' ঐ জাতীয় পত্র পেলে প্রাণে আনন্দ হয়।

নববাবু যে পত্র লিখেছিলেন তাতে আচার্যদেবের পিতৃপরিচয় ছিল, আরও লিখেছিলেন যে তাঁর পিতা কলকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লি থেকে বি-এ পাশ করেন, অনার্স পান সংস্কৃতে ১৮৮৫ সালে। ব্রজেনবাবুও বোধ হয় ১৮৮৪ সালে এম-এ পাশ করেন। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে পিতা বৈকুণ্ঠনাথের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

এলাহাবাদ থেকে পরীক্ষা শেষে জয়পুর থেকে বাড়ী ফেরার পথে কলকাতায় নামেন আচার্য গোপীনাথ। উদ্দেশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা

করে কোথায় কিভাবে এম-এ পড়া যায় তা স্থির করা। তখন মে অথবা জন্ন মাসের প্রথম দিক্‌কার কথা।

শীল মহাশয় থাকতেন রামমোহন সাহা স্ট্রীটে নিজ বাসভবনে। বোধ হয় ১৫ অথবা ২৫ সংখ্যক গৃহ সেটি। খ্ঁজে বাড়ী বের করে সেখানে পেঁছলেন বেলা প্রায় ১১টা/১১-৩০ টার মধ্যে। বাড়ীর খোঁজ পেলেন বটে, "কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ করিতে কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। মনে হইল—অত বড় একজন জগৎ-বিখ্যাত জ্ঞানীর কাছে যাইতেছি—আমি একজন নগণ্য অখ্যাত বিদ্যার্থী মাত্র। কি কথাই বা বলিব? যাহা হউক্‌ সাহস করিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া বৈঠকখানা ঘরে ঢ্ুকিয়াই দেখিলাম ঘর ভরা চৌকীর উপর ফরাস পাতা। তাতে একটা মোটা তাকিয়াতে ঠেস দিয়া একজন শ্ুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। জাগিয়াই ছিলেন। দেখিয়াই ব্ুঝিলাম ইনিই আমার অভীষ্ট শীল মহাশয়। তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু, প্রসন্ন নয়ন একজন প্রাচীন বয়স্ক প্ুর্ুষ। গরমের সময় বলিয়া শরীরে কোন আচ্ছাদন নাই।'

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোথা থেকে এসেছ? উত্তরে বললেন—জয়প্ুর থেকে। একথা বলে তাঁর হাতে নিজ পরিচয়পত্রখানা দিলেন। তিনি পত্রখানা না খ্ুলেই হাতের লেখা দেখেই বললেন—'এ যে নবর হাতের লেখা।' গোপীনাথের মনে হল যেন খ্ুশী হয়েছেন পত্র পেয়ে। পড়লেন চিঠিখানা। 'দ্ুই-চার লাইন পড়িয়াই যেন থমকিয়া গেলেন। দেখিলাম তাঁহার চোখ ম্ুখের ভঙ্গী অন্যরকম হইয়া গেল। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া সস্নেহে বলিলেন—তুমি বৈকুণ্ঠের ছেলে? তবে আর নবর পত্র কেন? বৈকুণ্ঠ যে আমার পরম বন্ধ্ু ছিল।' মনে হইল, 'তাঁহার চিত্তে ২৫ বছর প্ুর্বেকার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। মনে এতদিন উদ্দীপনের অভাবে প্রস্ুপ্তভাবে পড়িয়া-ছিল, সেদিন আমাকে দেখিয়া ও পিতৃদেবের কথা শ্ুনিয়া আবার জাগিয়া উঠিল। মনে হয় তিনি দ্বিপ্রহরের ভোজনের শেষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন সে ভাব কাটিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। আমার কাছে আমার বিধবা মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সহ্ৃদয় ভাব দেখিয়া আমার আশঙ্কা ও সংকোচ কাটিয়া গেল। মনে হইল তিনি আমার নিজজন, এখানে আমার কোন সংকোচ নাই।'

তারপর অনেক কথা হল। পরে বললেন, 'তুমি একবার জানকীর সঙ্গে দেখা করো। তিনি তোমার বাবার অতি অন্তরঙ্গ ছিলেন।' এই বলে তিনি জানকীবাব্ুর নামে একখানা পরিচয়পত্র তাঁর হাতে দিলেন। এই জানকী-বাব্ু স্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য, তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

প্রাথমিক পরিচয় শেষে তাঁদের দ্ুজনের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নকর্তা গোপীনাথ আর উত্তর দিচ্ছিলেন আচার্য শীল।

প্রশ্নে কোনো বিষয়ের নিশ্চয়তা ছিল না, যা মনে এল তাই জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি তখন ব্রাউনিংগ খুব পড়িতাম। শুধু রবার্ট ব্রাউনিংগ নয়, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংগও পড়িতাম। বলিলাম—'ব্রাউনিংগ খুব কঠিন, তবে আমার খুব ভাল লাগে। শেলী, কীটস, বায়রণও ভাল, তবে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের তুলনা হয় না। তবে এদের কবিতা ব্রাউনিংগের ন্যায় কঠিন নয়। ব্রাউনিংগ কঠিন হলেও ভাল লাগে।'

তিনি বললেন—সত্যি, খুব কঠিন। ওদের দেশে ব্রাউনিংগ অনুশীলনের জন্য বহু ব্যাখ্যা আছে। তুমি ব্রাউনিংগ এনসাইক্লোপিডিয়া দেখতে পার। তা হতে সাহায্য পাবে।

এর পরই প্রশ্ন হল—আপনি অরবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে কি মনে করেন ?

শীল মহাশয় বললেন—অরবিন্দ হচ্ছে একাধারে পোয়েট, প্রফেট ও ফিলজফার।

গোপীনাথ আবার জিজ্ঞেস করেন—আপনি তাঁর 'বাসুদেব দর্শন' সম্বন্ধে কি মনে করেন ? তিনি 'কারাকাহিনী' নামক যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন তা পড়েছেন কি ? তাতে তাঁর বাসুদেব দর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে বিষয়ে আপনার মত কি ?

গোপীনাথ জানতেন যে ব্রজেন্দ্রবাবু গোঁড়া ব্রাহ্ম, দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন সম্বন্ধে হয়ত তিনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু তিনি বললেন, একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন—

—আমার আবার মত কি ? তিনি দর্শন পেয়েছেন বলেছেন, এতে অবিশ্বাস করার কি আছে? এ কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

তখন গোপীনাথ বললেন—ঐতিহাসিকগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা কিন্তু স্বীকার করে না।

আচার্য শীল একটু হেসে বললেন—ক্রাইস্ট-এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও তো বহু সন্দেহ বহু লোক করেন। তাতে কি বড় বড় সন্তগণ এবং সেন্ট টেরেসা কর্তৃক খৃস্টের দর্শন অসত্য প্রমাণিত হয় ? তা হয় না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে শরীর ধারণ না করলেও তাঁর আত্মা তো দর্শন দিতে পারে। ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্বরূপী কৃষ্ণ দুটি আলাদা জিনিস। তাঁর প্রতি যার যেমন ভাবনা বা বিশ্বাস সেই অনুসারে তাঁর দর্শনও হবে। বিশ্বের আধ্যাত্মিক সাহিত্যে এর উদাহরণের কি অভাব আছে? সব সাধু পুরুষ কি মিথ্যা-বাদী—তা নয়। সাধকের নিজ ভাবনা অনুসারে পরমশক্তি আকার ধারণ করে প্রকাশ পেতে পারেন।

এর পর গোপীনাথ পরলোকগত আত্মার স্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে আচার্য শীল যে উত্তর দেন তার সারাংশ হল এই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বহু গবেষণা হচ্ছে, অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে—আত্মার ফোটোও নেওয়া হয়েছে।

এই উত্তর শুনে গোপীনাথের মনে হল যে এ বিষয়ে আচার্য শীল সন্দেহ-বাদী নন। পরলোকগত আত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী। একটু পরেই বললেন—দ্যাখ, আমার প্রথমে বিশ্বাস ছিল না, এখন হয়েছে। তোমাকে আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছিল তা শোনাচ্ছি।

কিছুদিন আগে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তিনিই ছিলেন গৃহের সর্বে-সর্বা। সংসারের কাগজপত্র দলিল তাঁরই হেফাজতে থাকত। এবিষয়ে আমি ছিলাম উদাসীন। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং দু-তিন দিনের অসুখেই তিনি মারা গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাড়ীর কাগজের খোঁজ পড়ল। বহু সম্ভাব্য স্থানে খোঁজ করা হল কিন্তু আমার সব সন্ধানই ব্যর্থ হল। রাতে স্বপ্নে স্ত্রীকে দেখলাম তিনি আমাকে বলছেন —'এত চিন্তা কিসের ?' এই বলে গৃহে কোথায় আলমারীর কোন্ কোণে বাড়ীর কাগজ অর্থাৎ দলিল রাখা আছে দেখিয়ে দিলেন।

পরদিন তাঁর নির্দিষ্ট স্থানেই কাগজ পেলাম। এরপর আর বেশী কথা হল না। তিনি গোপীনাথকে তাঁর রচিত দু-তিনখানা বই উপহার দিয়ে বললেন কলকাতাতেই পড়তে। সেখানে গবেষণার যে সুযোগ সুবিধা বর্তমান তা ভারতের অন্য কোথায় সুলভ নয়—এ কথাও বললেন।

আচার্য শীলের সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লাগল। কি অমায়িক ব্যবহার! অল্প বয়স্ক গোপীনাথের সঙ্গে যেভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বললেন তা দেখে তিনি মোহিত হলেন।

চলে এলেন সেখান থেকে, এবার কিছু জানা হল কিন্তু নির্ণয় হল না কিছু।

কদিন পরই দেশে ফিরলেন। নানা জায়গায় ঘুরে, পুরনো বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কাটিয়ে এবার ঠিক করলেন জুনের মধ্যেই ঠিক করতে হবে কোথায় যাবেন।

মনে এল রামদয়াল মজুমদারের কথা। তিনি বলেছিলেন কাশীতে গেলে সব সুবিধা হবে। সে তো যুগ যুগ থেকে বিদ্যার প্রসিদ্ধ পীঠ। আরও মনে হল কাশীতে দু বছর আগে যে বৃদ্ধ পিতামহকে দেখে এসেছিলেন তিনি তো এখনও জীবিত। অবশ্য বয়স হয়েছে ৮৫ বছর। তাঁর আশ্রয় তো আছেই। শুনেছেন আজকাল আছেন কেদার মন্দিরের সংলগ্ন তাহিরপুর রাজবাড়ীতে। সেখানে অল্প মাসহারা পান, তাতেই চলে।

একটা চিঠি লিখলেন তাঁকে এবং শীঘ্রই উত্তর এল। তিনি প্রসন্ন মনে সম্মতি দিয়েছেন। এবার আর কোনো বাধা নেই। তাঁর পত্র পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে একদিন একলাই রওনা হলেন কাশীর দিকে।

কাশী

কাশী এসে পৌঁছলেন ১৯১০ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে। আগে থেকে জেনেছিলেন জুলাই মাস থেকে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হবার সময়। তাঁর পিতামহ বৃদ্ধ আর তিনি ইংরেজী শিক্ষার রীতি-প্রকৃতি কিছুই জানেন না। তিনি তাঁকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারবেন না, তাই নিজেই নিজের ব্যবস্থা করতে হবে।

গোপীনাথ এদিক সেদিকে অনুসন্ধান করে পথঘাট জেনে নিয়ে সংস্কৃত কলেজের অভিমুখে রওনা হলেন। আজকাল কাশীতে রিক্সা বাস প্রভৃতি যাতায়াতের অনেক সাধন হয়েছে। তখনকার কাশীতে টাঙ্গা অথবা এক্কাই যাতায়াতের একমাত্র সাধন ছিল। বহু লোক পায়ে হেঁটেই পথ চলত। তিনিও চললেন পায়ে হেঁটে এবং অবশেষে সংস্কৃত কলেজের বিশাল ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এই সংস্কৃত কলেজের দুটি বিভাগ। একটি প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত পঠনপাঠনের বিভাগ এবং অন্যটি ইংরেজী বিভাগ। ইংরেজী বিভাগে তখন এম-এ পর্যন্ত পড়ানো হত। সংস্কৃত বিভাগে ব্যাকরণ, সাহিত্য, বেদ, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন বিষয়ের অধ্যাপনা হত।

বারাণসী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ১৭৯১ সালে। বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ এই কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। গোপীনাথ যখন এম-এ ক্লাশে পড়েন তখন আর্থার ভেনিস ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর পূর্বে বিখ্যাত বিদ্বান ব্যালানটাইন, গ্রিফিথ, থিবো এই কলেজের অধ্যক্ষতা পদ অলংকৃত করেছেন। আবার সংস্কৃত বিভাগে বহু মহামহোপাধ্যায় দিগ্‌গজ বিদ্বান বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। এর গৌরব অতি প্রাচীন, ঐতিহ্য মহান্‌।

এখানে ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করতে পারলে নিজের জীবন সার্থক হবে। তার উপর আছে কাশীর বিশিষ্ট বিদ্বৎসমাজ—এ সুযোগ আর কি কোথাও সুলভ? গোপীনাথ কিভাবে ভর্তি হলেন তার বিবরণ তিনি নিজেই দিয়েছেন।

'সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি তখন পাঠ্য-জীবনের পরিশিষ্ট ভাগ অতিক্রম করিয়া সেবক-জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়াছি। তাহারও প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অতিক্রম হইয়াছে। বিদ্যা অর্জন ও বিদ্যা বিতরণই ছিল তখন বহির্জীবনের প্রধান লক্ষ্য। পরিগৃহীত সেবক-জীবনও ঐ লক্ষ্যাভিমুখী গতির অনুকূলই ছিল। সাক্ষাৎভাবে যাঁহার অধীনে আমি সেবা-জীবনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তিনি ভারতীয় না হইয়াও ভারতীয় সংস্কৃতির তৎকালীন বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পথ-প্রদর্শক স্বরূপ ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমার গুরুস্থানীয় ছিলেন (অধ্যাপক ও সংরক্ষক

দৃষ্টিতে)। অধ্যাত্ম পথে, আন্তর জীবনের পথে, এমন একজন মহাপুরুষকে আমি আদর্শরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম—যিনি পরা ও অপরা বিদ্যায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্ববিভাগে সমভাবে শিক্ষিত ছিলেন। এই প্রকার পরিবেশের আবেষ্টনীতে নানা প্রকার জ্ঞানের আলোচনার মধ্য দিয়া আমার কর্মজীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছিল।'

সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, আচার্যদেব কাশী আসার পূর্বেই ডাঃ ভেনিসের বিশ্বত্তার পরিচয় সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর দ্বারা ইংরেজীতে অনূদিত গ্রন্থ 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' (প্রকাশানন্দ রচিত) জয়পুর অবস্থান কালেই পাঠ করেছিলেন—একথা আমরা আগেই বলেছি। আরো জেনেছিলেন 'সিদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহ' গ্রন্থের অনুবাদ তিনিই করেন। তাঁর রচিত শিলালেখের সমালোচনা 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা'তে পাঠ করে তাঁর অসাধারণ বিদগ্ধতার পরিচয় পান। জয়পুর থেকে কাশী এসে এই ডাঃ ভেনিসের কাছে পড়তে পারবেন ভেবে মন আগ্রহশীল ছিলই।

যেদিন ডাঃ ভেনিসের সংগে দেখা করতে যান সেদিন তাঁদের মধ্যে যে কথা হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন আচার্যদেব। ডাঃ ভেনিস তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—কোন্ ক্লাশে ভর্তি হতে চাও ?

তিনি উত্তর দিলেন—পঞ্চম বর্ষ শ্রেণীতে।

—বি-এ কোথা থেকে পাশ করেছ ?

—মহারাজা কলেজ, জয়পুর থেকে।

—সেখানে তো সঞ্জীবনবাবু প্রিন্সিপাল রয়েছেন, তবু এখানে কেন ?

—আপনার নামে আকৃষ্ট হয়ে।

—আমাকে কিভাবে জানলে ?

তখন আচার্যদেব তাঁকে কিভাবে জেনেছেন সব বললেন। ডাঃ ভেনিস ছেলেটির প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করে এবং তাঁর ব্যাপক দৃষ্টি দেখে অভিভূত হলেন, বললেন, তোমাকে এম-এ প্রথম বর্ষে সানন্দে গ্রহণ করব। তবে তুমি কি বিষয়ে রুচি রাখ আমাকে তা বল।

তখন যুবক গোপীনাথ বললেন—আমার ভাল লাগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দর্শন।

একথা শুনে ডাঃ ভেনিস বললেন—এম-এ প্রথম বর্ষে সব বিষয় পড়তে হয়, দ্বিতীয় বর্ষে গ্রুপিং হয়ে থাকে। তখন ডি গ্রুপ নেবে—আমার এরূপ মনে হয়। ঐ সময় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, এপিগ্রাফি, নুমিস্‌-মাটিক্‌স্ পড়ানো হয়। এসব বিষয়ের অধ্যাপনা আমি নিজে করে থাকি। দর্শন ও ইংরেজী নেবার প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছা যে তুমি প্রাচীন শৈলী অনুসারে সংস্কৃত অধ্যয়ন করো। এখানে এই কলেজের সংস্কৃত বিভাগে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য মহাশয় রয়েছেন,

তিনি মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির সুযোগ্য শিষ্য, তুমি তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করো।

পরদিন কলেজে উপস্থিত হতেই ডাঃ সাহেব পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য মহাশয়ের সঙ্গে এই নবীন ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিও সাগ্রহে তাঁকে পরদিন থেকে তর্কভাষা পড়াতে আরম্ভ করলেন। বেদান্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্যের টীকা ভামতী তাঁকে নিজে নিজে পড়তে বললেন।

এই হল ডাঃ ভেনিসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর তাঁর সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে।

গোপীনাথ এম-এ ক্লাশে ভর্তি হলেন। তাঁর প্রতিভা এবং অল্প বয়সে জ্ঞানের বিস্তার দেখে ডাঃ ভেনিস তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই একদিকে নবীন বিদ্যার্থী অন্যদিকে অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ মোহিত হলেন।

এইভাবে গোপীনাথের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতিতে পঠনকার্য আরম্ভ হল। সুরু হল এক মহান্ যাত্রা। আমরা পরবর্তী সময়ে দেখতে পাব বিদ্যার্থী গোপীনাথ কিভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে কি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র মন্থন করে তিনি যে দিগ্‌দর্শন করেছেন সে সময় তার তুলনা মেলা কঠিন।

আমরা পরবর্তী জীবনে আচার্য গোপীনাথের যে পরিচয় পাই তাতে তাঁকে অধ্যাত্মশাস্ত্রে নিষ্ণাত বিদ্বান বলে মনে হয়েছে। তিনি যে তর্ক ও ন্যায়ের যুক্তিজালের গহনে কখনো বিচরণ করেছেন তা মনে হয়নি। ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনার রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই তিনি মধুসূদন সরস্বতী রচিত ক্লিষ্ট গ্রন্থ অনায়াসে পাঠ লাগিয়ে বিদ্যার্থীকে পড়িয়েছেন।

কিন্তু এ সবের পেছনে ছিল ডাঃ ভেনিসের সদা জাগ্রত দৃষ্টি। তিনি ছিলেন যুবক গোপীনাথের অধ্যাপক ও পথনির্দেশক।

গোপীনাথ ১৯১০ সালে জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজে এম-এ প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেন। তখন কলেজে আসা যাওয়া করতে হত কেদারঘাট থেকে সোজা পায়ে হেঁটে। দীর্ঘ পথ। কেদারঘাট থেকে যে গলি সোজা কালী-তলা হয়ে দশাশ্বমেধ এসেছে সেই পথে এসে গোধূলিয়া হয়ে কুইন্স কলেজ। জয়পুরেও হাঁটতেন কখনো কখনো। কিন্তু দিনে দুবার যাতায়াতে পরিশ্রম হত খুব। বৃদ্ধ দীনবন্ধু কবিরাজ তাঁর সম্পর্কিত পৌত্রের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুবিধা ছিল অনেক।

কোনো প্রকারে এক বছর তো কাটল, ১৯১১ সালে এম-এ প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিতে এলাহাবাদ গেলেন। ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে স্থান খুঁজতে বেরলেন। পথে দেখা হল জয়পুরের পুরনো বন্ধু গঙ্গাপ্রতাপ গুপ্তের সঙ্গে। সে গোপীনাথকে দেখে নিয়ে যেতে চাইল তার আবাসস্থান 'ল কলেজ' হোস্টেলে। গোপীনাথ রাজী হলেন না। ভাবলেন সেখানে হয়ত

পড়াশুনার ক্ষতি হবে। তিনি তখন তাঁরই আর এক বন্ধু নরেন্দ্রদেবের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি গোপীনাথের থাকার ও খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। নরেন্দ্রদেব, পরবর্তী জীবনে তাঁর সহপাঠী এবং সমাজজীবনে যিনি উত্তরকালে সমাজসেবী আচার্য নরেন্দ্রদেব নামে পরিচিত, এই প্রথম তাঁর সংগে পরিচয় হল। পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

এখানে দু-একদিন পরই গোপীনাথ ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হন কিন্তু নরেন্দ্রদেবের ব্যবস্থায় ও দ্রুত সাহায্যে তিনি কোন প্রকারে সুস্থ হয়ে পরীক্ষা দিতে পারলেন এবং তা সুসম্পন্নও হল।

এম-এ প্রথম বর্ষের পরীক্ষা হয়ে যাবার পর কাশী ফিরে এলেন। তারপর গরমের ছুটী আরম্ভ হতেই গোপীনাথ দেশে রওনা হলেন।

মে মাসে গোপীনাথ দেশেই ছিলেন এবং বন্ধুদের কাছে নিয়মিত পত্রাদি লিখতেন। ডাঃ ভেনিসের কাছেও লিখেছিলেন। দেশে গিয়েও আবার ম্যালেরিয়ায় পড়েন। আমরা দেখতে পাই ডাঃ ভেনিস তাঁর শরীর সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্র লিখছেন। তিনি লিখছেন,

কুইন্স কলেজ
বেনারস
১৪ই মে, ১৯১১

প্রিয় কবিরাজ,

তোমার ১০ তারিখের লেখা চিঠি পেয়ে দুঃখিত হলাম এই জেনে যে তুমি আবার ভয়ঙ্কর জ্বরে শয্যাশায়ী হয়েছ। আশা করি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবে। তুমি কি এই পরিস্থিতিতে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত আবহাওয়ায় বাংলা-দেশেই থাকতে চাও? তুমি ইপিগ্রাফির আগামী লেকচার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। ১৮ই জুলাই থেকেই লেকচারগুলো সুরু হওয়া দরকার। যদি তুমি আগেই ফিরে আস তাহলে আমার কাছে পড়ার সুযোগ পেতে পারতে, কেন না, এ সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি কাশী ছেড়ে যেতে চাই না।

ভবদীয়
এ· ভেনিস

গোপীনাথের সংগে এই অল্প কিছুদিনেই তাঁর অধ্যাপকের সংগে যে হৃদ্যতা জন্মেছিল এই চিঠিই তার প্রমাণ। ক্রমে ক্রমে সেই হৃদ্যতা আরো বাড়ে।

গরমের ছুটি শেষ হতেই গোপীনাথ কাশীতে ফিরে এলেন, কিন্তু এবার তাঁকে ম্যালেরিয়া খুব কাবু করেছে। মাঝে মাঝেই জ্বরে পড়েন, পড়াশুনা ঠিক মতো করতে পারেন না।

এই সময় জ্বরের সংগে আর এক উপদ্রব দেখা দিল। তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলেন। আর যেন শরীর নিয়ে চলতে পারেন না। ডাঃ ভেনিস গোপীনাথের অবস্থা দেখে চিন্তিত হলেন। কাশীতে চিকিৎসা হল কিন্তু

ফল কিছু হল না দেখে তিনি নির্দেশ দিলেন কলকাতা গিয়ে ভাল চিকিৎসকের অধীনে থেকে চিকিৎসা করাতে।

বললেন, তুমি যে বৃত্তি কলেজ থেকে পাচ্ছ তা বন্ধ হবে না। পড়াশুনো এক বছরের জন্য স্থগিত করতেই হবে, এ ছাড়া উপায় নেই।

ডাঃ ভেনিসের নির্দেশে গোপীনাথ মাকে সব লিখে জানালেন। তারপর কলকাতা রওনা হলেন। কলকাতায় ভাল চিকিৎসকের অধীনে তিন মাস থেকে চিকিৎসা চলল, তখন মা সুখদাসুন্দরী কাছেই ছিলেন।

শরীর একটু সুস্থ হতেই অক্টোবর মাসে দান্যার জানকী রায়ের ছেলে সুরেন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল ও মাকে সঙ্গে নিয়ে পুরীতে স্বর্গদ্বার পল্লীতে হরিদাস মঠের কাছে একটি ভাড়া বাড়ীতে রইলেন কিছুদিন।

পুরীতে অল্প কদিনেই গোপীনাথ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তখন মন্দির দর্শন এবং নিকটবর্তী যা কিছু দর্শনীয় দেখে দেশে ফিরে গেলেন।

দেশে রইলেন প্রায় দু মাস। এবার আর জ্বর হয়নি। স্বাস্থ্যও আগের থেকে ভাল হয়েছে দেখে জানুয়ারী মাসে কাশী ফিরে এলেন। এখন তো কলেজে পড়া নেই, তবে নিয়মিত পাঠ না থাকলেও ডাঃ ভেনিসের কাছে যাওয়া এবং পণ্ডিত ন্যায়াচার্যের কাছে পাঠ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না।

পিতামহ কেদার ঘাটের বাসস্থান ছেড়ে দেবনাথপুরায় উঠে এসেছেন তখন, গোপীনাথও সেখানে উঠেছেন। একদিন তাঁর এক বন্ধু নৃপেশ গুহ প্রস্তাব দিলেন, 'চলো আমরা হরিদ্বার ঘুরে আসি, তীর্থ দর্শন হবে এবং অন্য সব প্রসিদ্ধ জায়গাও দেখা হবে। পাহাড়ের জল হাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের অনুকূলও হবে। যাবে তো, সব গুছিয়ে নাও।'

গোপীনাথ ভাবলেন, প্রস্তাব মন্দ নয়। তিনি সব ঠিক করে একদিন বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় দু মাস কাটল হরিদ্বার, কনখল, ঋষীকেশ, লছমনঝুলা, মসুরী, দেরাদুন দেখে। এপ্রিল কাটতেই আবার কাশী ফিরে এলেন এবং অল্পদিন পরেই দেশে গেলেন গরমের ছুটিতে।

দেশে গরমের ছুটি কাটল। মনে কিন্তু আনন্দ নেই। শরীর ভাল না থাকায় একটা বছর নষ্ট হল। এ বছর পরীক্ষা দেওয়া হল না। একটু পেছিয়ে পড়লেন, যারা ছিল তাঁর সহাধ্যায়ী তারা সব চলে যাবে, আর যারা তাঁর থেকে এক বছর পেছনে ছিল এখন তারা তাঁর সঙ্গে পড়বে। ভেবে কি হবে? দেশে বই পড়া, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ করে দিন কাটত।

যেখানেই থেকেছেন বন্ধুদের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগ রাখা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে ছিল। জয়পুরেও অনেক বন্ধু জুটেছিল, ঢাকাতে তো ছিলই। ব্রজগোপাল তাঁকে নিয়মিত পত্র লিখত। আর লিখত দীনেশ, বীরেন, নগেন্দ্র।

বন্ধু না হয়েও বন্ধুর মতো ব্যবহার ছিল অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের। তাঁর সম্পর্কে আসেন ধামরাই থাকার সময় থেকেই। তাঁর কাছেই রবীন্দ্রনাথের

গল্পগুচ্ছ দেখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বেশ অধিকার ছিল, সংস্কৃতে কবিতা রচনা করতে পারতেন বেশ। আচার্যদেব বলতেন, 'অক্ষয়বাবু সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় সমান অধিকার রাখতেন। তাঁর একটা ইনসাইট্ ছিল।'

অক্ষয় দত্তগুপ্ত গোপীনাথ থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে পরিচয় ও হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তা কিন্তু পত্র প্রভৃতিতেই সীমিত ছিল না। গোপীনাথ জয়পুর বা কাশী থেকে এলেই অক্ষয়বাবুর খোঁজ নিতেন। দেখা হলে দুজনেই খুশী হতেন। যোগেশ ঘোষ নামে আর একজন বন্ধু ছিল, তার সঙ্গেও নিয়মিত পত্র ব্যবহার চলত। সে ঢাকা ছেড়ে কলকাতা আসে। রিপন কলেজে তার পড়া আরম্ভ হয়। বন্ধু যতীনের অনুরোধে ইংরেজীতে কবিতা লিখেছিলেন, 'এ সামার্স নুন টাইড', এতে ১৫টি স্ট্যাঞ্জা ছিল। বন্ধুকে পাঠিয়ে দেন সে কবিতা, যোগেশ ঘোষকেও পাঠিয়েছিলেন সেটি। তখন ইংরেজী ও বাংলায় কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল খুব। আর একজন বন্ধু ছিল আরজান, সে ছিল বাংলা সাহিত্যের ভক্ত। তার কাছেই রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যখানি নিয়ে এসে পড়েন। এই কবিতার বই পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে শেখেন। এর পর তার কাছ থেকে এনে পড়তে পান 'মানসী'। সে সময় রচনা করেন 'ইন মেমোরিয়াম' নামে কবিতা, পড়তে দেন অক্ষয়বাবুকে। তিনি বলেছিলেন—'তাঁর প্রথম উদ্যমের পক্ষে কবিতা ভালই হয়েছে। তবে দু একটি পংক্তি সুরচিত হয়নি, দু একটি শব্দের প্রয়োগও যথোচিত হয়নি, ছন্দের তারতম্য কোথাও কোথাও হয়েছে।'

এ সময় (১৯০৩) লিখেছিলেন 'বাসনা ও আশা', 'বসন্তাগমে' আর একটি কবিতা রচনা করেন—যার প্রথম পংক্তি হল—'মনে পড়ে সেইদিন সুখের বেলায়' ও একটি সনেট 'টু দি স্টার ইন দি স্টর্মি ওয়েদার'।

তাঁর কবিতা রচনার একটি ইতিহাস আছে, সে কথায় বলেছেন—'তখন মনটা জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বাইরের দিক হইতে আমার অভিজ্ঞতা তখন খুবই কম, কিন্তু মনে এক তীব্র জিজ্ঞাসার ভাব জাগিয়াছিল। এ যে শুধু স্বাস্থ্যের অপূর্ণতা হইতে হইয়াছিল তা নয়, ভিতরে ভিতরে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে আমার অনুভব হইত যে মানুষের এই বাইরের জীবন প্রকৃত জীবন নয়। তার জীবন সত্তার কোন্ গভীর স্তরে নিহিত। আমি কবিতার মধ্য দিয়া জীবনের অতৃপ্তি অথবা বেদনার অনুভব প্রকাশ করিতে চেণ্টা করিতাম, নানা জ্ঞানী ও গুণীজনের কাছেও এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পরাঙ্মুখ হইতাম না।'

মনের এই ভাবনার কথা লিখেছিলেন অক্ষয়বাবুর কাছে। তিনি তাঁকে দীর্ঘ পত্র দিয়েছিলেন আশ্বাস দিয়ে।

এই অক্ষয়বাবু একদিন তাঁর 'গুরুভাই' হন এবং তাঁরই মাধ্যমে গুরু বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সতীর্থ নয়, গুরুভাই কিন্তু

তারও আগে এই দুজনের যে প্রীতি ও হৃদ্যতা তা অনুকরণীয়। তাঁরা পরস্পর মিলিত হলে কোন দিন আবৃত্তি, কোনদিন পাঠ চলত রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে। কোনোদিন পাঠ হত কর্ণকুন্তী সংবাদ, বিদায় অভিশাপ আবার অক্ষয়বাবু মেঘদূত সমালোচনা করতেন। কখনো বই আনতেন তাঁর কাছ থেকে—সর্বদর্শন সংগ্রহ ও ম্যাক্সমুলার-এর 'সায়েন্স অব ল্যাংগুয়েজ'।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখিত 'বেদান্তের প্রথম কথা' পড়ে ভাল লেগেছিল তখন, নিজে ঐ প্রবন্ধ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এই অক্ষয়বাবুর সংগে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় যমুনা' কবিতার যে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন তার সূত্রপাত এই সময়ে ঘটে। গোপীনাথের সাহিত্য-প্রীতির বীজ রোপিত হয়েছিল অক্ষয়বাবুর সম্পর্কে এসে, এই রসাস্বাদ ও সৌন্দর্যবোধ আরও ব্যাপক ও গভীর হয়ে প্রকাশ পায় কয়েক বছর পর। যে বয়স ভাব ও আবেগের সেই বয়স পেরিয়ে এসে অনুসন্ধিৎসু গবেষকরূপে তাঁর যে আত্ম-প্রকাশ ঘটেছিল তার পেছনে ছিল আর্থার ভেনিসের জাগ্রত দৃষ্টি। আবার সেই সংগে ন্যায় ও বৈশেষিকের বিচার কৌশলের সূক্ষ্মতা তাঁর চিন্তাধারাকে কিভাবে পরিণত, মার্জিত ও গম্ভীরতা মণ্ডিত করেছিল আমরা এবার তাঁর জীবনের সেই পর্যায়ে প্রবেশ করব।

অধ্যয়ন ও গবেষণা

গোপীনাথ ১৯১২ সালে জুলাই মাসে এম-এ দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করলেন। আবার কলেজে যাতায়াত শুরু হল। দেবনাথপুরা মহল্লা থেকে কলেজ, আবার কলেজ থেকে বাড়ী। দুবার যেতে হত। মাঝে মাঝেই জ্বর হত বলে কষ্ট ছিল।

শ্রীবলদেব মিশ্র নামে একজন সংস্কৃতের বিদ্যার্থী সে সময় কলেজ হোস্টেলে থাকতেন। তিনি কি করে গোপীনাথের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন সেই প্রসংগে বলছেন 'কবিরাজজীর সংগে আমার পরিচয় সম্ভবতঃ ১৯১২ সালে আগস্ট মাসে বারাণসী কুইন্স কলেজ হোস্টেলে হয়েছিল। তিনি তখন এপিগ্রাফি নিয়ে এম, এর অন্তিম বর্ষের ছাত্র। এই ক্লাশেই ফৈজাবাদের আর একজন ছাত্র পড়তেন—নাম ছিল নরেন্দ্রদেব। তিনি কলেজের বোর্ডিং হাউসে থাকতেন।'

গোপীনাথ যেদিন বোর্ডিং হাউসে এলেন তখন সন্ধ্যাবেলা। তাঁর জন্য তখনও কোনো কামরা দেওয়া হয়নি, তাই তাঁর পূর্ব পরিচিত নরেন্দ্রদেবের ঘরে সেদিনকার মতো থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ডাঃ ভেনিস গোপীনাথের স্বাস্থ্য দেখে প্রতিদিন দুবার কলেজে আসার শ্রম থেকে রেহাই দেবেন ঠিক করেন এবং বোর্ডিংয়ে থাকলে তাঁর পড়াশুনার

সুবিধা হবে মনে করলেন। সেই অনুসারে অগাস্ট মাস থেকে বোর্ডিং হাউসে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন।

মিশ্রজী লিখছেন, 'যেদিন গোপীনাথ আসবেন সেদিনই আমি নরেন্দ্র-দেবের কাছে তা জানতে পারি যে তিনি আসছেন। তাঁরই কাছে আমি আরও জানতে পারি যে গোপীনাথ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ এবং প্রাচীন রীতি ও ব্যবহারে আস্থাসম্পন্ন ও তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

নরেন্দ্রদেবের কাছে এ কথা শুনে গোপীনাথজীকে দেখবার এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমার মনে আগ্রহ জন্মে।

যেদিন গোপীনাথ বোর্ডিং হাউসে স্থায়িভাবে থাকার জন্য সব জিনিস পত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কিছুক্ষণ পরেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেদিনও তিনি অসুস্থ ছিলেন, একটু জ্বরভাব ছিল।'

আচার্যদেব 'নরেন্দ্রদেব—এক সংস্মরণ' নামক নিবন্ধে সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য জীবনের একটি পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমরা দেখতে পাই ১৯১২ সালে আচার্য গোপীনাথ, নরেন্দ্রদেব ও দিবেকর ডাঃ ভেনিসের নিকট থেকে শিলালিপি, এপিগ্রাফী ও ন্যুমিসম্যাটিক্স্-এর পাঠ নিতেন ডাঃ ভেনিসের বাংলোতে বারান্দায় বসে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আচার্য ভেনিসের হৃদ্যতা থাকায় শিলালেখের আদর্শ মুদ্রিত প্রতিলিপি অনায়াসে জুটত। তাঁরা তিন ছাত্র মিলে সে সবের পাঠ-উদ্ধারের কাজে অবিলম্বে লেগে যেতেন। তাঁদের দীর্ঘ আলোচনা চলত জার্মান, ফ্রেঞ্চ অথবা ইটালিয়ান শিলালেখের অধ্যয়নে এবং অনেক সময় কাটত ব্রাহ্মী লিপি, কুষাণ ও গুপ্ত লিপির ক্রমবিবর্তনের অধ্যয়নে। সে সময় তাঁদের পাঠ্যগ্রন্থ ছিল বুহ্লারস্ ইণ্ডিয়ান পেলিওগ্রাফি। এ পাঠ চলত সকালে, আবার বিকেলে হত প্রফেসর নরমান সাহেবের ক্লাশ। তিনি জার্মান, ফ্রেঞ্চ, প্রাকৃত ও পালি পড়াতেন। বই পাঠ্য ছিল এণ্ডারসন রচিত পালি রিডার, আবার প্রাকৃতের বই ছিল রিচার্ড পিসচেল রচিত প্রাকৃতের বই, মূল জার্মান ভাষায় রচিত। তাঁদের ঐ বই থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করতে হত এবং শোনাতে হত প্রফেসর নরমানকে। তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে ভুল শুধরে দিতেন।

যেদিন পালি বা প্রাকৃত হত না সেদিন চলত বিদেশী ভাষার পাঠ। পালি ও প্রাকৃতের ক্লাশে পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রীও তাঁদের সঙ্গে পাঠ শুনতেন, আবার বিদেশী ভাষার ক্লাশে পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্যের ছোট ভাই পণ্ডিত তারাচরণ তাঁদের সহপাঠী হতেন।

বলদেব মিশ্রজীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল গোপীনাথের। তিনি সংস্কৃত পড়তেন। তাঁর মনে ইংরেজী শেখার আগ্রহ হয়েছিল। তিনি এক-দিন গোপীনাথকে বললেন তাঁর মনের কথা। মিশ্রজীর অল্প ইংরেজী

শিক্ষা ছিল, কিন্তু কিভাবে আরো ভাল করে শেখা যায় তা জানতে তাঁর সংগে একদিন কথা বললেন। তিনি তাঁকে লালবিহারী দে রচিত 'ফোক টেলস্ অব বেংগল' পড়তে বললেন। বই কিনে আনা হলে গোপীনাথ তাঁর বইয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে কঠিন শব্দগুলো চিহ্নিত করে দিলেন এবং বললেন—'এগুলো কোনো খাতায় লিখে নিন্, পরে সব শব্দের অর্থ হিন্দীতে আমার কাছে জেনে নেবেন।' মিশ্রজী তাই করতে লাগলেন এবং এভাবে পাঠ এগোতে লাগল। শুধু অর্থ নয় বিষয়ও তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন।

যখন অবসর হত মিশ্রজীর সংগে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে যেতেন। উদ্দেশ্য থাকত বেড়ানো এবং সম্ভব হলে কোনো প্রবচন শোনা অথবা ধার্মিক আলোচনা শোনা।

প্রসংগক্রমে বলতে হয় যে যুগে গোপীনাথ কাশীর ঘাটে বেড়াতে যেতেন তা আজকের কাশীর ঘাট থেকে অনেক ভিন্ন। দশাশ্বমেধ ও অহল্যাবাঈ ঘাটে তখন সন্ধ্যা বেলায় নিয়ম করে কীর্তন, পাঠ, কথকতা হত। আবার কোনো নির্জন বুরুজে বসে হয়ত কোনো মহাত্মা তত্ত্বকথা বলতেন। কোথাও গীতার প্রবচন আবার কোথাও ভাগবত পাঠ হত। যারা আগ্রহ নিয়ে শুনত তাদের সংখ্যাও কম ছিল না।

এখানেই গোপীনাথ তাঁর পরবর্তী জীবনে দেখা সাধুদের বিষয়ে শুনতে পান। তাই প্রতিদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে যাওয়া তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। পরিণত বয়সে কর্মজীবনে এবং কর্মজীবন সমাপ্ত হবার পরও তাঁর এই অভ্যাস যায়নি। ওখানেই বসে শাস্ত্রার্থ শুনেছেন, শুনেছেন অজ্ঞাত সাধুদের সাধন ধারার কথা। অনেক নতুন নতুন মানুষের সন্ধান পেয়েছেন কাশীর বিভিন্ন ঘাটে ও পথে।

মিশ্রজী বলছেন, "আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। একদিন আমরা বসে আছি কজনা, আমাকে বললেন, 'কিছু শোনাও।'

আমি সংস্কৃত শ্লোক শোনালাম। তারপর মৈথিল ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনালাম। যখন ওঁর পালা এল তখন গোপীনাথ রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' থেকে আবৃত্তি করলেন।

যদিও আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনো দিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝংকারে

দয়া করে তুমি ক্ষণেক দাঁড়ায়ো
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

অব আহ্বানে যদি কভু মোর
নাহি ভেঙে যায় সুপ্তির ঘোর
বজ্র বেদনে জাগায়ো আমায়
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

যদি কোনোদিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে
চিরদিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

বাংলায় তাঁর আবৃত্তি শুনে আমরা মুগ্ধ হলাম। কয়েকজন বন্ধু সেখানে ছিলেন, তাঁরা বললেন—এবার ইংরেজীতে বলুন।

তখন গোপীনাথ গ্রের 'এলিজি' থেকে শোনালেন ঃ

Full many a gem of the purest ray serene
The dark unfathomed caves of the ocean bear
Full many a flower is blown and blush unseen
And wastes its sweetness in the desert air."

বোর্ডিং হাউসে থাকার সময় গোপীনাথ মেসে একবেলা খেতেন কিন্তু রাত্রির খাবার কখনো কখনো ছাত্ররা যা তৈরী করত তাদের সঙ্গে খেতেন। ছুটির সময় মেস বন্ধ থাকলে মিশ্রজীর আগ্রহে তাঁদের সঙ্গেই খেতেন।

যখনই কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন তা অধিকাংশ হতো বিদ্যা সম্বন্ধী আলোচনা। কখনো সাংসারিক কথা বলতেন না। মিশ্রজী বলেছেন, 'আমরা এত কাছের মানুষ ছিলাম তা সত্ত্বেও জানতে পারিনি কোথায় তাঁর নিজের বাড়ী, পরিবারে কে কে আছেন, তাঁদের জীবন কি ভাবে চলে, এসব কথা কখনো বলতেন না।'

আমরা দেখেছি ঘুম থেকে উঠতেন খুব ভোরে। অনেকক্ষণ ধরে সূর্যের প্রকাশে আলোকিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর কলম চলতে থাকত সে সময়। ডায়েরী লিখতেন অথবা পত্র লিখতেন।

তাঁর সমকালে যে সব ছাত্র বোর্ডিং হাউসে থাকতেন তাঁরা হলেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষের জামাতা নলিনীমোহন বসু। ইনি ছিলেন গোপীনাথের রুমমেট। তিনি ডাঃ গণেশ প্রসাদজীর (গণিতজ্ঞ) ছাত্র ছিলেন। আর ছিলেন মুরলীধর ঠকুর, বলদেব মিশ্র, গঙ্গাধর মিশ্র, গিরীশচন্দ্র অবস্থী, রামেশ্বরদেব, ললিতাপ্রসাদ, কালিকাপ্রসাদ ও জানকীশরণ।

১৯১৩ সালে এপ্রিল মাসে এম-এ অন্তিম বর্ষের পরীক্ষা দিতে নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে গোপীনাথ এলাহাবাদ যান। তখন মৌখিক পরীক্ষা নিতে আসেন ডাঃ ডি· আর· ভাণ্ডারকর। তিনি আসেন পুণা থেকে। তিনি গোপীনাথের নানা বিষয়ে যেমন ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে নবীনতম গবেষণার গভীর পরিচয় দেখে বিস্মিত ও প্রভাবিত হন।

এপ্রিল মাসে একটি দুঃসংবাদে গোপীনাথ মর্মাহত হন। তাঁদের প্রিয় অধ্যাপক প্রফেসর নর্ম্যান হঠাৎ আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটি তাঁকে খুবই বেদনা দেয়; যেমন ডাঃ ভেনিস তাঁর পিতৃসম তেমনি নর্ম্যান সাহেবও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে দেখতেন।

পরীক্ষা শেষ হলে তিনি কাশী ফিরে আসেন এবং আবার জ্বরে পড়েন। চিকিৎসা যথোচিতভাবে হওয়ায় জ্বর চলে যায় কিন্তু শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। ডাঃ ভেনিস তাঁকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নৈনীতাল যেতে বলেন। সেখানে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হবে, কিন্তু থাকবেন কোথায় এসব চিন্তা ডাঃ ভেনিস নিজেই দূর করলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে গোপীনাথের জন্য নৈনীতালে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য লিখলেন। চক্রবর্তী মহাশয় আবার তাঁর জামাতা জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সেকথা লিখলেন। তিনি তখন কাশ্মীর সরকারে অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করতেন। তিনি কাশ্মীর শৈবগ্রন্থমালা নামক গ্রন্থ প্রকাশনের ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর সময়ে বহু শৈব আগমের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর বন্ধু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় হাই কমিশনার ছিলেন কিছুকাল। নৈনীতালে তাঁর 'তারা কটেজ' নামে একখানা বাড়ী ছিল। গরমে এসে তিনি এখানে থাকতেন।

জ্ঞান চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর থাকার স্থান 'তারা কটেজে' না করে পুরনো গভর্নমেন্ট হাউসে করে দিলেন। ডাঃ ভেনিস সেকথা জানালেন তাঁকে।

গোপীনাথের কয়েকজন বন্ধু তখন দিল্লীতে ছিলেন। মেঘনাথবাবুর ছেলে নৃত্যগোপাল তো সেখানে থাকতেনই, আবার গরমের ছুটি হতেই ব্রজগোপালও সেখানে এলেন। মেঘনাথবাবুর বন্ধু অক্ষয়কুমার মুখার্জির আশ্রয়ে এঁরা থাকতেন। তাঁর ছেলে নগেন্দ্রনাথও এঁদের সমবয়স্ক। গোপীনাথ দিল্লী এসে ওখানে উঠলেন। তাঁরা সকলে ঠিক করলেন সকলে একসঙ্গে নৈনীতাল যাবেন। তাই ব্রজগোপাল ও নগেন্দ্রনাথ সঙ্গে এলেন। নৈনীতালে আনন্দে দিন কাটল তাঁদের।

আনন্দে থেকেও মন কিন্তু পরীক্ষার ফল কি হবে ভেবে একটু চিন্তিত ছিল। জুন তো প্রায় কেটে এল—পরীক্ষার ফল কবে বেরবে কে জানে? তখন সংবাদপত্রে ফল বেরুত। ডাঃ ভেনিস ফল প্রকাশিত হবার আগেই গোপীনাথের পরীক্ষা ফল জানতেন, কিন্তু বলেন নি তাঁকে। পরীক্ষার ফল

যখন বেরুল তখন দেখা গেল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষায় এত বেশী মার্ক পেয়ে কেউ এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারে নি। গোপীনাথ হয়েছেন প্রথম বিভাগে প্রথম নিজের বিভাগে। ডাঃ ভেনিস তখন নৈনীতালে, তিনি বললেন, 'যে সাধোলাল বৃত্তি তুমি এতকাল পেয়ে আসছ তার প্রবর্তক মাধোলালজী এখানেই আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার পরীক্ষার খবর জানিয়ে এসো।'

গোপীনাথ গেলেন মুন্সী মাধোলালের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং ভবিষ্যতেও যথেষ্ট সাহায্য দেবেন এরূপ আশ্বাস দিলেন।

পরীক্ষার ফল বেরবার পর কি করবেন সে বিষয়ে নিজের কোনো ভাবনা ছিল না। দু-একদিন কাটল, অবশেষে ডাঃ ভেনিস তাঁকে বললেন, 'আমার কাছে দু জায়গা থেকে তোমার নিযুক্তি সম্বন্ধে টেলিগ্রাম এসেছে। একটি এসেছে লাহোর কলেজ থেকে, করেছেন প্রিন্সিপাল এ· সী· উলনার এবং আর একটি জয়পুর থেকে। এটি করেছেন প্রিন্সিপাল সঞ্জীবন গাঙ্গুলী। তিনি তোমাকে চান আজমীর মেয়ো কলেজে সংস্কৃতের প্রফেসর পদের জন্য।' ডাঃ ভেনিস যদিও তাঁর প্রিয় শিষ্যের সম্বন্ধে কি করবেন পূর্বেই ঠিক করেছিলেন, তবু বললেন, 'তুমি কি চাও?'

এর উত্তরে গোপীনাথ বললেন, 'আপনি যেমন পরামর্শ দেবেন তেমনি হবে।'

তখন ডাঃ ভেনিস বললেন, 'যদি আমার পরামর্শ নাও তাহলে এ দুটি পদের কোনটিও নিও না। তুমি স্কলারশিপ নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ কর।'

এই ব্যবস্থায় হয়ত আর্থিক ক্ষতি হল, কিন্তু জ্ঞানের অনুসন্ধানে যে তপস্যা ও ত্যাগ প্রয়োজন তা তাঁর ছিল। তিনি প্রসন্ন মনে ডাঃ ভেনিসের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯১৩ সালে জুলাই মাসে নৈনীতাল থেকে তিনি কাশী ফিরে এলেন। ডাঃ ভেনিস তাঁকে কলেজের ছাত্রাবাসে স্থান করে দিলেন।

এখন আমরা একটা পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। কাশীতে ১৯১০ সালে এসেই তাঁর মনে যে জ্ঞানপিপাসা ছিল তা অনেকাংশে নিবৃত্ত হত নানা গ্রন্থ পাঠে; কিন্তু আদর্শ জ্ঞানীর সঙ্গে তখনো গোপীনাথের পরিচয় আরম্ভ হয়নি। ১৯১০/১৯১১ সালের কোনো সময়ে তিনি শুনতে পান ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর তখন কাশীতেই আছেন।

এই মহাপুরুষের নাম শুনেছিলেন জয়পুর থাকতে। নাম শোনার পর থেকেই তাঁর মনে তাঁকে দর্শন করার জন্য এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই আকাঙ্ক্ষার একটা ইতিহাস আছে।

যখন তিনি এনট্রেন্স পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন একটি

বই তাঁর চোখে পড়ে। বইটি অন্য অনেক বইয়ের সংগে বিক্রী হচ্ছিল। সবই ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ের বই। তাই ঐ বইয়ের দু-একখানা কম দামে তিনি কিনে নিলেন। এই বইগুলোর মধ্যে একটি ছিল 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ'। বইটির দুটি খন্ড। অন্য বই পড়ার পর সময় পেলেই তিনি এই বইটি পড়তে থাকেন। বইটি পড়ে লেখকের অসামান্য বিদ্বত্তা, তাঁর কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ প্রভৃতি বিষয়ে গভীরতা দেখে তিনি অভিভূত হন। তখন মনে হয়েছিল যদি সৌভাগ্যক্রমে লেখকের সংগে কখনো সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁর কাছে বসে নানা তত্ত্ব কথা শুনবেন। কিন্তু বইটির কোথাও লেখকের নাম ছিল না।

জয়পুরে থাকতে একদিন জয়পুর স্টেটের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগে প্রসংগতঃ কর্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি সে সময় কর্মবাদের গভীর রহস্য কথা বলেছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান শুনে তাঁর আগ্রহ জন্মে এবং তাঁর কাছে জানতে চান তিনি কোন্ শাস্ত্রের ভিত্তিতে এরূপে সুন্দর ভাবে বলছেন। তখন তিনি বললেন, 'এই ব্যাখ্যান আমার নয়। আমি কোনো মহাপুরুষের কাছে এমনটা শুনেছি। সেই মহাপুরুষ অতি সংগোপনে থাকেন এবং সাধারণতঃ আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং আমার দাদা প্রেমানন্দ এক সময় তাঁর কাছে যেতেন। তখন তিনি বরানগর অথবা বালির নিকট থাকতেন।'

গোপীনাথ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কোনো বই লিখেছেন ?

সত্যেনবাবু বললেন, তিনি অনেক বই লিখেছেন, তার মধ্যে 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ' প্রধান। লেখকের নাম শশিভূষণ সান্যাল।

সত্যেনবাবুর নিকট থেকে আর্যশাস্ত্র প্রদীপ রচয়িতার নাম তিনি প্রথম জানতে পারেন। তিনি আরো শুনেছিলেন যে ঐ শশিভূষণ সান্যাল মহাশয় একজন গৃহস্থ যোগী, তাঁর অন্য এক নাম ভার্গব যোগত্রয়ানন্দ শিবরাম কিংকর।

নাম তো জানা হল, এখন তাঁর দর্শন কিভাবে হয়েছিল তার বিশদ বর্ণনা আচার্য গোপীনাথ তাঁর রচিত 'সাধু দর্শন ও সৎপ্রসংগের' দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। আমরা প্রাসংগিক বিবেচনায় সংক্ষেপে এখানে তার কিছু উল্লেখ করছি।

একদিন কাশীতে দশাশ্বমেধে গোপীনাথ নিজ বন্ধুদের সংগে আলাপ করছিলেন, তখন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল নামে একটি বিশেষ পরিচিত বন্ধু তাঁকে বললেন যে কাশীতে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ আছে, বহু দেশ থেকে বহু লোক তাঁকে দর্শন করতে আসেন। কিন্তু তাঁর দর্শন লাভ করা বিশেষ কঠিন।

তিনি প্রস্তাব করলেন, চলুন, একদিন আমরা তাঁকে দর্শন করে আসি।।

তিনি একথা শুনে বললেন, যদি দর্শন লাভ কঠিন হয়, তাহলে আমরাই বা কিভাবে তাঁর দর্শন পাব?

তখন শচীন বললেন, আমাদের পক্ষে দর্শনে অসুবিধা হবে না। কেননা ঐ মহাপুরুষের ছোটো ছেলে আমার সহপাঠী, আমার মনে হয় এ বিষয়ে সে আমাদের সহায় হবে।

গোপীনাথ ভাবলেন যদি দর্শন করতে গিয়ে দর্শন না হয় তাহলে তো দুঃখ হবে, আবার একথাও মনে হল দর্শন করে লাভই বা কি হবে? যা হোক, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহাপুরুষটির নাম কি এবং কোথায় থাকেন?

শচীন বললেন, মহাপুরুষের নাম শশিভূষণ সান্যাল, আর থাকেন সোনারপুরা মহল্লায়। তাঁর ছেলের নাম ইন্দুভূষণ সান্যাল।

এ কথা শুনে গোপীনাথের মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। ঠিক করলেন যাবেন। তবে শচীন যদি জানেন এই কি সেই শশিভূষণ সান্যাল যিনি আর্যশাস্ত্র প্রদীপ লিখেছেন? শচীনকে জিজ্ঞেস করায় সে কিছু বলতে পারল না, শুধু বললে, এইটুকু জানি যে তিনি মহাপুরুষ ও মহাপণ্ডিত। কোনো পুস্তক লিখেছেন কিনা আমি জানি না।

শচীন ইন্দুভূষণের সঙ্গে পরামর্শ করে দর্শনের জন্য একটা দিন ঠিক করলেন এবং ঠিক হল সেই বিশেষ দিনে শচীন ও গোপীনাথ দুজনে দর্শনে যাবেন। তাঁরা আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা সেখানে থাকতে পারবেন এরূপ ব্যবস্থার কথা ইন্দু তাঁদের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁরা যখন যোগত্রয়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে যান তখন বেলা দুটো বেজেছিল। তাঁরা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরেই ইন্দু খোঁজ নিতে এসে বলল—'এখানে দেরী করতে হবে না, বাবা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

তাঁরা ইন্দুভূষণের অনুগমন করে দোতলায় উঠে এলেন। দেখলেন একটা বড়ো হল ঘরে স্তরে স্তরে অসংখ্য বই সাজানো আছে। কোনো কোনো বই চক্রাকারে অথবা অর্ধচক্রাকারে সাজানো, আর তার ভেতর দিয়ে পথ গিয়েছে। তাঁরা একটি মুল গলি ধরে হলের প্রান্তভাগে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, 'একখানা সাধারণ মাদুরের আসনে মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ তাকিয়া এবং সম্মুখে ও চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাগজপত্র ও পুস্তকাদি রাখা ছিল।'

মনে আশঙ্কা ছিল এত বড় মহাপুরুষের সামনে উপস্থিত হয়েছেন কি বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন বা নিজের মনোভাব প্রকাশ করবেন। 'দেখিলাম মূর্তিটি অতি সৌম্য, প্রশান্ত ও গম্ভীর। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও বালকোচিত সরলতা যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে ভাসিতেছিল।'

তিনি গোপীনাথকে তাঁর পরিচয় এবং কোথায় কি পড়েন জিজ্ঞেস

করলেন। প্রাথমিক পরিচয় শেষ হলে তিনি বললেন, 'বাবা, তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পার।'

তাঁর স্নেহ ও করুণামাখা কথা শুনে গোপীনাথের সব সংকোচ দূরে গেল। মনে কোনো প্রশ্ন না উঠলেও তাঁর নিকট থেকে উপদেশ শোনার আকাঙ্ক্ষায় একটি কৃত্রিম প্রশ্ন করলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, সত্য এক ও অখণ্ড, ইহাই গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি। মুনি ঋষি সকলেই সর্বজ্ঞ, ইহাও শুনিয়াছি। সত্য যদি একই হয় এবং মুনি ঋষিরা যদি সকলেই সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য হয় কেন? 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'—এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য কি? এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, নানা মুনির নানা মত। এই ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মবিৎ দুইজন মুনির কি এক মত হইতে পারে না?'

গোপীনাথের এই প্রশ্ন শুনে বাবাজী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, তোমার প্রশ্ন আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে, এর মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। শুধু তোমার কেন, অনেকের মনেই এই প্রশ্ন জাগে। এর সমাধান না হলে জ্ঞানের প্রকৃত গৌরব ধারণা করা যায় না। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার প্রশ্নের মধ্যেই এর সমাধান রয়েছে। মুনি কাকে বলে? যিনি মননশীল তিনি মুনিপদবাচ্য। মত কাকে বলে? মনের দ্বারা যা অঙ্গীকৃত হয়। অর্থাৎ অখণ্ড সত্যের যে অংশটুকু খণ্ড মনের দ্বারা গৃহীত হয় তা হল মত। যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে অবলম্বন করে সত্যের সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অখণ্ড সত্যের দর্শনলাভ সুদূর পরাহত। অখণ্ড সত্যের ধারণা করতে হলে মনকে নিরুদ্ধ করে এবং শুধু মনকে নয় অন্তঃকরণের সব বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করে অন্তঃকরণের বাইরে যেতে হবে। অন্তঃকরণের পৃষ্ঠভূমিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক অবস্থিত। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন ঐ আলোককে ভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। মনের এটি দোষ নয়, এ তার স্বভাব।

বিকল্পশূন্য পরম সত্যকে পেতে হলে মনের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এই অবস্থায় মতামতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ মনই যেখানে নেই সেখানে মত কোথায়? কিন্তু প্রকৃত সত্যের স্বরূপ অজ্ঞানীকে দেওয়া যায় না, কারণ তার তো সংক্রমণ হয় না, অর্থাৎ এক আধার থেকে অন্য আধারে সঞ্চার হয় না। যার চিত্ত ঐ স্বয়ংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবেশ করবে তার নিকট সে তো আপনি প্রকাশিত হয়। কিন্তু অজ্ঞান জগতে জ্ঞানলাভের কোনো উপায় তা থেকে হয় না। ঐ অবস্থা যার হয়, শুধু তা তারই হয়। ঐ জ্ঞান অজ্ঞানী কিন্তু অনুরাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞাসুজনকে দিতে হলে মনের আশ্রয় নিয়েই দিতে হয়। মনের ধর্মই কল্পনা বা বিকল্প। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে জিজ্ঞাসুর নিকট উপস্থাপিত করতে হয়। বিকল্প

নানা প্রকার। জিজ্ঞাসুর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচার করে তত্ত্বজ্ঞ গুরু তদনুসারে শব্দের সাহায্যে তাকে ঐ জ্ঞান দান করেন।

এখানেই মনের সার্থকতা এবং এখান হতেই মতের উদ্ভব হয়। যিনি পূর্ণ সত্যকে মনের দ্বারা ধারণ করতে যান তাঁর তো মত থাকবেই। কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ করে পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরও মত থাকে—তখন তিনি মনোভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকারসম্পন্ন জিজ্ঞাসুর নিকট ঐ জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্যই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ ভেদ না থাকলেও অধিকার ভেদে তাঁদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য আসে।'

আচার্য গোপীনাথ যোগত্রয়ানন্দজীর সম্পর্কে প্রথম যান ১৯১০ সালে, ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ঐ মহাপুরুষের সঙ্গে গভীর পরিচয় ও সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কিন্তু সেদিন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁদের আনন্দ ও বিস্ময়ে ঐ মহাপুরুষের সান্নিধ্যে কাটে। কখন যে সন্ধ্যার সময় প্রায় উপস্থিত তাঁরা কেউ জানতেও পারেন নি।

তিনি লিখছেন, 'ঐ সময় হইতে আমি প্রায়ই সময় পাইলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বৈকাল বেলা তাঁহার নিকট যাইতাম। আমি গেলে সাধারণতঃ আমাকে বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে হইত না, আমি অবাধে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার অনুমতিপ্রাপ্ত হইতাম।'

পরে তিনি তাঁর সম্বন্ধে বহু কথা জানতে পারেন। তাঁর সর্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ'। এই মহাগ্রন্থ এক পরিকল্পিত গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাও অতি বিশাল ও অপূর্ব। আচার্যদেব লিখেছেন, 'হার্বার্ট স্পেনসার যেরূপ 'সিন্থেটিক ফিলোসফির' পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বিরাট পকিল্পনা ছিল আর্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ইহা হইয়া উঠে নাই।'

তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত শিবরাত্রি ও শিবপূজা, পরলোকতত্ত্ব, পূজাতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বাবাজীর পূর্ব নাম ছিল শশিভূষণ সান্যাল, তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীশ্রীশিবরামানন্দ পরমহংস। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের যোগ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল এবং তিনেই তাঁর সমান রুচি ও অধিকার ছিল বলে ভক্তগণ তাঁকে যোগত্রয়ানন্দ নামে উল্লেখ করতে থাকেন। গুরুচরণ আশ্রয় করার পর থেকে তিনি পূর্ব নাম ত্যাগ করে নিজেকে ভার্গব শিবরাম কিঙ্কররূপে প্রকাশিত করেন।

তাঁর জীবনের বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করে পরবর্তী সময়ে আচার্যদেব প্রথমে হিমাদ্রি পত্রিকায় এবং পরিশেষে 'সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করেছেন। তিনি তাঁকে যেভাবে পেয়েছিলেন আমরা তাঁর কথা তাঁরই ভাষায় উল্লেখ করছি।

'আমি ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বাবার সহিত ঘনিষ্ঠ-রূপে মিলিত হইয়া নানা প্রকার আলোচনাতে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে ঐ স্থানে অনেক জিনিস দেখিবার অবকাশ হইয়াছে এবং অনেক অজানা বিষয় জানিবারও সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমি তাঁহার মধ্যে একাধারে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন প্রণালীর যে অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়াছি তাহার তুলনা নাই। শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার অসাধারণ ছিল, এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি প্রগাঢ় ছিল। তিনি যে দৃষ্টিতে ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রকে দেখিতেন—অপৌরুষেয় বেদাদির ত কথাই নাই—সেইরূপে দৃষ্টি বর্তমান যুগে প্রাচীন সংস্কার-সম্পন্ন, পূর্বাচারের অনুবর্তনকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেও সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদাদি সহ সমগ্র শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও স্মৃতিনিবন্ধ, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্রসাহিত্য, সর্বাঙ্গসম্পন্ন জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানের মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় গ্রন্থই তাঁহার নিকট বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ তাঁহার অধ্যয়নশালাতে বিদ্যমান ছিল। সব গ্রন্থই তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িতেন এবং তুলনামূলক আলোচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সত্য নিরূ-পণের কষ্টিপাথর ছিল ঋষিবাক্য।...বাক্যপদীয় ব্যাকরণের দর্শনগ্রন্থ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস—তিনি তাঁহার অনুপম প্রতিভার আলোকে বাক্যপদীয়ের মূলী-ভূত ব্যাকরণ আগমের রহস্য যে প্রকার বুঝিয়াছেন তাহার তুলনা কোথাও নাই।...বাবাজী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু দূরে দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাঁহার নিকট সদ্উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধূত, যোগী, কর্মী, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আসিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধানপ্রাপ্ত হইতেন। সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন।'

আচার্যদেব অন্য একখানি গ্রন্থে এই মহাপুরুষের কথা যেরূপ শ্রদ্ধা বিনম্রচিত্তে প্রকাশ করেছেন আমরা তা থেকে উক্ত মহাপুরুষের যে অমলিন প্রভাব তাঁর চিত্তে পড়েছিল তার উল্লেখ করতে পারি।

'আমি অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্প-বিস্তর প্রাণের আকর্ষণও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। বিশেষতঃ, একজন মহাপুরুষের অপার্থিব কৃপা ও ভালবাসা আমি অযোগ্য হইয়াও প্রায় সাত বৎসরকাল অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিয়া আসিয়াছি। অনেক সময়ে তাঁহাকে আত্মজীবনের আদর্শস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছি ও নীরবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছি। তেমন সাধনা, তেমন পাণ্ডিত্য, (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নবীন

ও প্রাচীন সর্ববিষয়ে), তেমন শাস্ত্রবিশ্বাস, সদাচার ও উদার হৃদয় আমি পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তাঁহার কৃপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আমি দৈহিক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। তাঁহার অযাচিত করুণার প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কখনও দিতে পারিব না। বুদ্ধি সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য অতুলনীয়—শুধু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাৎভাবেও তিনি বহু জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, পবিত্র হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য।'

আচার্যদেবের জীবনে আর্যশাস্ত্রপ্রদীপিকার যোগত্রয়ানন্দের যে প্রভাব পড়েছিল তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি মুখেও অনেক সময় বলতেন যে, শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনের যে রীতি তাঁর নিজ ব্যাখ্যা ও রচনায় লক্ষিত হত যোগত্রয়ানন্দের ব্যাখ্যারীতি তা থেকে অভিন্ন। তাঁর যোগভাষ্যের যে ব্যাখ্যা তাঁর অসংখ্য শিষ্যগণ দীর্ঘদিন ধরে শুনেছেন তাঁরা এ তথ্যের সাক্ষী। তাঁর নিজ মননে হয়ত তা আরও বিশদ ও গম্ভীর হয়েছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রের রহস্য কথা, তার গূঢ় ইঙ্গিত তিনি অশেষ শাস্ত্রবিদ্ যোগ-ত্রয়ানন্দের নিকট থেকে যে লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আচার্য গোপীনাথের জীবনে দুটি ধারা কাশীতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। ঐ দুটি ধারার একটি অপার জ্ঞানরাশি আহরণ ও মনন এবং অন্যটি ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার রহস্য অধিগমে প্রযত্ন। তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের প্রথম উন্মেষ কিশোর ও যৌবনের প্রারম্ভেই দেখা দিয়ে-ছিল। যখনই যে বই পড়েছেন তখন ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য ছিল বেশী। অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্ক্ষার যে বীজ কিশোর বয়সে জন্মেছিল তা আরও বিকাশ লাভ করে কাশী এসে। অধ্যাত্মজীবনের প্রথম উন্মেষ হতেই সাধুদর্শন ও সৎসঙ্গের জন্য হৃদয়ে প্রবল পিপাসা অনুভব করতেন। ঢাকা, জয়পুর ও কাশী এই তিন স্থানেই নানাবিধ উপায়ে অর্থাৎ লাইব্রেরী থেকে, কখনো কোনো বন্ধুর নিকট থেকে বই এনে পড়তেন। সম্ভব হলে কিনেও নিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ত ও ভক্তগণের জীবন চরিত ও তাঁদের সাধনক্রম জানার জন্য কত যে বই পড়েছেন তা সংখ্যা করা যায় না। জয়পুরে থিয়োজফির বই ছিল অসংখ্য। তিনি সে সব বই আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। কিন্তু তাই বলে লৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পড়তেন না তা নয়। নিয়মিত

ভাবে অধ্যয়ন করতেন সে সব বইঃ কাব্য, উপন্যাস ও সমালোচনা। তাতে ইংরেজী সাহিত্যেই সীমিত থাকত না, বহু ভাষায় অনূদিত বইও পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হলেই হয় কিনতেন, সম্ভব না হলে অন্য কোনভাবে সংগ্রহ করে পড়ে নিতেন। তাঁর পড়া সাধারণ পাঠকের মতো ছিল না। অধ্যয়ন ও মনন এ যেন সর্বদা অনুষঙ্গী ছিল। পড়াটা অবসর যাপনের বিষয় হয়ে ওঠেনি কোনোকালে। কোন বই তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করেছেন, আবার কোনোটি চিরদিনের সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অসাধারণ স্মৃতিধর ছিলেন বলে অনেক কথা মনে থাকত। কিন্তু মনে রাখবার সুবিধার জন্য অসংখ্য নোট বই ছিল; তাতে বিষয়, বক্তব্য ও উদ্ধরণ আলাদা করে রাখতেন। বিষয় অনুসারে সাজিয়ে লিখে রাখতেন। পরে দেখেছি কোনো বিদ্যার্থী কোনো নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করবে বলে এসেছে, তাকে সাহায্য করতে হবে। প্রথম দিন পরিচয় পর্ব শেষ হলে তাকে কি কি বই পড়তে হবে, কোন্ কোন্ নিবন্ধ কোথায় কোন্ জার্নাল থেকে খুঁজে পড়তে হবে তার এক বিশাল গ্রন্থসূচী মুখে মুখে বলে গেলেন। পরদিন হয়ত ঐ বিদ্যার্থীকে দু-তিন ঘন্টা ধরে তার ভবিষ্যৎ গবেষণার বিষয়ে দীর্ঘ প্রবচন দিলেন। এই প্রবচন দেবার আগে হয়ত দেখা গেছে তিনি তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত নোট থেকে একটু সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর অধ্যয়ন ছিল মেথডিক্যাল, এতে ভুল হত না।

তাঁর স্মৃতির প্রসঙ্গে মনে পড়ে একদিন আমাকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা প্রসঙ্গে বই কিছু পড়েছি। তাঁর জীবনস্মৃতিও পড়েছি কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে অন্যের লেখা বই আমাকে এনে দিতে পার তো ভাল হয়।

আমার সঙ্গে একটি বাংলা গ্রন্থাগারের যোগ ছিল। সেখান থেকে একটি একটি করে অনেক বই এনে দিতাম। সবই রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা টুকরো ছবি, বহু অন্তরঙ্গ ঘটনা ও বিবরণ তাতে থাকত। দ্রুত পড়তেন বলে বইয়ের ভাণ্ডার গেল ফুরিয়ে, শেষে দিলাম রবীন্দ্রজীবনীর কয়েক খণ্ড।

একদিন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের লাইব্রেরী তো খুবই পুরনো, 'বান্ধব' পত্রিকার কোন সংখ্যা সেখানে আছে কিনা দেখো। জান কি বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

আমি চুপ করে রইলাম দেখে বললেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাম শুনেছ? তিনি ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।

আমার মনে এল কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম। আচার্যদেব তখন বললেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিশীথ চিন্তা, নিভৃত চিন্তা পড়োনি কোনো দিন? তোমরা বাংলা সাহিত্যের কিছু খবরই রাখ না দেখি। এই বলে তিনি 'নিশীথ চিন্তা'র দীর্ঘ গদ্যাংশ আবৃত্তি করে শোনালেন বেশ কিছুক্ষণ। যারা

সাহিত্য নিয়ে সর্বদা ব্যাপৃত তাদের এ-ধরণের স্মৃতিশক্তি এক বড় সম্পদ কিন্তু তাঁর মতো দার্শনিকের যে এমন শক্তি ছিল তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

কখনো প্রেম ও বিরহের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কালে অনায়াসে বহু কবিতা রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করতে শুনেছি। একটি কবিতা প্রায়ই শুনতাম তাঁর মুখে যখন বলতেন—নিত্য মিলনেও বিরহের বেদনা তীব্রবেগে জেগে ওঠে, পক্ষান্তরে নিত্য বিরহেও নিত্য মিলন প্রস্ফুটভাবে ভাগ্যবান ভক্তের নিকট অনুভবগোচর হয়, তাই বিরহের মধ্যেও অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি জন্মে। একেই বিরহানন্দ বলে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ একদিন এই বিরহের আনন্দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।
আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি। ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথের কবিতার তিনি সহৃদয় পাঠক ছিলেন। শুধু সহৃদয় পাঠক নয়, কবিতার মর্মকথা তাঁর অন্তরে যে ভাব ও আনন্দের দোলা দিত তা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের কতগুলো ছোট ছোট বইয়ের সংগ্রহ ছিল, গল্প, উপন্যাস বা নাটক নয়, কবিতা। পড়তেন কখন জানি না। যেবার রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত করেন তখন তা সংগ্রহ করেন।

জীবনের শেষ সময়েও তাঁর এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কমেনি।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি লাইন। লাইন দুটি বললেন—

হৃদয় আমার সূর্যমুখীর মতো
মুখ পানে তব চেয়ে রয় অবিরত॥

বললেন, কথা কয়টি অতি সহজ। অনায়াসে কবির লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে। কিন্তু এর যে কি গভীর তাৎপর্য বর্তমান একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। সূর্যমুখী যেমন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তেমনি নিজের সত্তাটিকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করে রাখতে হবে। এই উন্মুখতাই সাধনা। ভগবানের অনন্ত রূপ ও অনন্ত গুণের ধারণা করা সম্ভব নয় বলে তাঁকে একটা বিশেষ ভাবের বা রূপের মধ্যে গ্রহণ করা কোটি জীবনের সাধনাতেও সম্ভব নয়। ইষ্টের সমগ্র ও অখণ্ড স্বরূপকে ধ্যানের মধ্যে পেতে হলে এই উন্মুখতাই সাধককে তাঁর স্বরূপে উপনীত করে।

১৯৭২ সালের অক্টোবরের একদিন মা আনন্দময়ীর আশ্রমে সন্ধ্যায় প্রখ্যাত গায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্যদেবকে গান শুনিয়েছেন। সব গান রবীন্দ্রনাথের। রজনীকান্ত সেন ও রবীন্দ্রনাথের গানের ভক্ত ছিলেন

খুব। গান শেষ হয়েছে কিন্তু মনটা তাঁর রবীন্দ্র সংগীতের কয়েকটি বিশেষ কথাতেই নিবদ্ধ রয়েছে। বার বার বলছেন, কি যেন গানের লাইনগুলো? অনেক দিন আগে গানটা শুনেছিলাম। গানের প্রতিটি লাইন মনে ছিল এক দিন। আজও ছাড়া ছাড়া ভাবে মনে পড়ে। আবার শুনলে সব কথা মনে পড়বে। জগদীশ্বর, বল না লাইনগুলো। জগদীশ্বর নীচে গিয়ে লিখে আনলেন, পড়ে শোনালেন গানটা।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ।
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার, শূন্য মনের বৃথা উপহার
পুষ্প বিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তি বিহীন তান॥
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান॥ (পূজা ৪৭৯)

পরম স্মৃতিধর ছিলেন একদিন, তখন অর্থাৎ ৮৫ বছর বয়সে স্মৃতি ম্লান হয়েছে। সব কথা অর্থাৎ লৌকিক জীবনের অনেক কথা মনে তেমন থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনগুলো যখন পাঠ করে শোনানো হল তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আবৃত্তি করে চললেন আর চলল প্রশংসা। তার-পর বললেন, ওঁর সমগ্র জীবনকথা কে যেন লিখেছিলেন?

বললাম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পাঁচ খণ্ডে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনী। একবার এনে দিয়েছিলাম আপনাকে।

এবার জিজ্ঞেস করলেন, রবীন্দ্রনাথের শেষ দিনগুলো কিভাবে কেটেছে বলতে পার?

যতটা জানা ছিল বললাম সেকথা। বললাম—তাঁর মৃত্যুর দু এক দিন আগেও কবিতা লিখেছেন। শুনে আগ্রহভরে বলে উঠলেন, এনে দেবে সে কবিতা?

সে কবিতাও শুনেছেন। এই ছিল তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতি।

আচার্যদেব যে বিরাট সাহিত্য-সম্ভার সৃষ্টি করেছেন তাতে আছে বিশ্বের বিস্তীর্ণ সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে অনায়াস উদ্ধরণ ও তার তাৎপর্য নিরূপণ। এই অসাধারণ বিদগ্ধতার কথা ভাবলে অবাক লাগে। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি আবার পরক্ষণেই সুফী সন্তগণের, খৃষ্টীয় মিস্টিকদের সাহিত্যে প্রবেশ করে তা থেকে নানা অম্লান কুসুম আহরণে ও বিন্যাসে নিজ বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন অসামান্য দক্ষতায়। উপনিষদ থেকে ভাগবত, আবার সন্ত সাহিত্য থেকে বৈষ্ণব কাব্য—এই আরোহণ ও উত্তরণে তাঁর প্রতিটি নিবন্ধ রসরূপতা লাভ করেছে।

আবার আমরা পুরনো কথায় ফিরে যেতে চাই। গোপীনাথ সংস্কৃত কলেজে 'সাধোলাল স্কলার' হিসেবে গবেষক ছাত্ররূপে নিযুক্ত হলেন ১৯১৩ সালের জুলাই থেকে। তাঁকে ডাঃ ভেনিস অশোক শিলালেখের একটি পপুলার এডিশন তৈরী করার ভার দিলেন। এ ভার তিনি সাগ্রহে হাতে নিলেন। কাজ শেষ করতে সময় লেগেছিল প্রায় এক বছর। তখন থাকতেন গরুড়েশ্বর মহল্লায় পুরনো দুর্গাবাড়ীর কাছে একটি বাড়ীতে। এখানে থাকার সময় শচীন সান্যালের সংগে ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ে। তারও বাড়ী ছিল এই একই পাড়ায়। ওখানেই ছিল যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ী। সেখানে যেতেন সময় পেলেই। শুধু তখনই নয় পরবর্তী জীবনেও বহুবার সে গৃহে গিয়েছেন, বসেছেন চুপ করে কিছুকাল যোগিরাজের চিত্রের সামনে।

তাঁর কাজ যেমন এগিয়ে চলল তেমনি চলল নানা সাহিত্য পাঠ। এখন সৌভাগ্যক্রমে দেখেছেন ভার্গব শিবরাম কিংকর যোগত্রয়ানন্দকে। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে সম্পর্কের গভীরতা যেমন বাড়তে লাগল তেমনি তাঁর নিজের মধ্যেও দৃষ্টির গভীরতাও দেখা ছিল।

এতদিন ছিল ভারতীয় ও বিদেশী সাহিত্য পাঠ, তার রস গ্রহণ, এবার কিন্তু 'মিস্টিক' অর্থাৎ রহস্যবাদের বই তাঁর মনকে সমগ্রভাবে অধিকার করল। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন দার্শনিক বিচার বিমর্শময় চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে চলল। কাশীতে আসার পর থেকেই ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের জটিল ও যুক্তিবহুল বিচার-প্রণালীর সংগে পরিচয় প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বামাচরণ ন্যায়াচার্যের কাছে পাঠ গ্রহণের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। তিন বৎসরের নিবিড় অধ্যয়নে চেতনা আরও পরিণতি লাভ করেছে একথা আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি। কিন্তু এ সব অধ্যয়ন সত্ত্বেও তাঁকে যা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করত তা হল দেশ বিদেশের সাধনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ ও মনন। জয়পুরে অবস্থান কালে থিওসফির গ্রন্থ পাঠ তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। কাশীতে ডঃ ভগবানদাসের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁকে এ সময় নবীন প্রেরণা দান করে।

১৯১৪ সালে ডঃ ভেনিস সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকার তাঁকে অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব থেকে অবসর না দিয়ে তাঁর কর্ম-ভারকে পুনর্বিন্যাস করেন, উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁর মতো বিদ্বানের সেবা থেকে বিদ্বৎসমাজকে বঞ্চিত না করা। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে সংস্কৃত কলেজে একটি নবীন বিভাগ প্রবর্তিত হয়। তখন থেকে ডঃ ভেনিস হলেন সুপারিনটেনডেন্ট অব্ স্যানস্ক্রিট স্টাডিজ ইন ইউ. পি। পূর্বে সংস্কৃত কলেজে দুটি বিভাগের অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন। নতুন ব্যবস্থায় ১৯১৪ সাল থেকে ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ হলেন পি. এস. বরেল এবং ডঃ ভেনিস হলেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ, সুপারিন-টেনডেন্ট অব স্যানস্ক্রিট স্টাডিজ এবং সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষার রেজিস্ট্রার।

এই নবীন পদবিন্যাসে এবং ডঃ ভেনিস উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সংস্কৃত বিভাগে গবেষণাত্মক আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হল।

ডঃ ভেনিস শিষ্য গোপীনাথকে গবেষণার কাজে লাগিয়ে নিজে নির্লিপ্ত রইলেন না; সর্বদাই তাঁকে ঠিক পথের নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিজের আলোচনার ক্ষেত্র ছিল ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা নিরূপণ; সেইজন্য গোপীনাথকে সেই কাজে লাগিয়ে নিজেও ব্যস্ত থাকতেন একই কাজে।

তিনি কিভাবে তাঁকে সাহায্য করছিলেন তার একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখছেন—আমি তোমাকে অধ্যাপক স্যুয়ালি লিখিত ভারতীয় দর্শনের পাণ্ডুলিপির আট পাতা আমার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। ভাষা হয়ত তেমন মাজা ঘষা নেই—তুমি নিজেই তা বুঝবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে এবং তুমি মূল গ্রন্থের সব তথ্য এতে পাবে, ফলে এসব তোমার গবেষণায় কাজে লাগবে। সন্দেহ নেই, স্যুয়ালি কৃত সব তথ্যই তোমার জানা কিন্তু তাঁর বিচার পদ্ধতি ও আলোচনা তোমার ঔৎসুক্য বাড়াবে। হয়ত তুমি আমার অনুবাদের একটা সারাংশ তৈরী করবে যাতে তুমি তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তা লাগাতে পার। সংক্ষেপ করলে দুটো কপি অবশ্য করে জগনন্দনকে দিয়ে টাইপ করে একটি আমাকে পাঠিও। স্যুয়ালি উইনডিসের একটা মত তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে বাৎস্যায়নভাষ্যে কোনো কোনো অংশে বার্ত্তিকের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ভারতীয় বিদ্বানগণের দৃষ্টিতে সেই সেই অংশের বার্ত্তিকত্ব দৃষ্টিতে পড়েনি।

আমি আনন্দের সঙ্গে স্যুয়ালির আরো এক খেপ তোমাকে পাঠাতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় স্যুয়ালির কথার সারাংশ নিয়েই কাজ চলতে পারবে, শুধু সেই অংশগুলো যথাযথ স্যুয়ালির কথাই থাকা দরকার যেখানে তোমার মনে হবে স্যুয়ালি ঠিক ঠিক কি কথা লিখেছেন তা জানতে, কেননা তিনি খুব পরিশ্রম করে সব সিদ্ধান্তবিদের মত সংগ্রহ করেছেন। স্যুয়ালির মত জানা তোমার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক কেননা তুমি নিজেই তো ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণে ব্রতী হয়েছ। আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিতে চাই তা হল তুমি তোমার গবেষণার ফলে যে সব তথ্য খুঁজে পাচ্ছ তা ভাল করে লিখে সেগুলো প্রকাশিত করা প্রয়োজন। মনে হয় এ করা বিশেষ কঠিন হবে না।

এর পর ডঃ ভেনিস বলেছেন যে, তাঁর (অর্থাৎ গোপীনাথের) নিবন্ধগুলো প্রকাশিত হলে তা বাস্তব দৃষ্টিতে তাঁর সরকারী পদ অর্থাৎ গ্রন্থাগারিক রূপে তাঁর স্থিতি এবং রীডার (নির্বাচিত) রূপে তাঁর মর্যাদা বিদ্বানের দৃষ্টিতে বাড়বে।

এখানে একটি কথা বলে নিলে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষিত হয় বলে আমরা একটু আগের কথায় ফিরে যেতে চাই। ডঃ ভেনিস যখন অধ্যক্ষরূপে সম্পূর্ণ

কলেজের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন তখন কলেজের সংগৃহীত গ্রন্থ (মুদ্রিত ও হস্তলিখিত) সংস্কৃত কলেজ ভবনে ছিল। এবার ১৯১৪, ৪ঠা এপ্রিল মূল ভবনের পূর্বে একটি গৃহে সংস্কৃত গ্রন্থের ভান্ডার স্থানান্তরিত হয়। এই ভবনটির নাম হয় সরস্বতী ভবন। উক্ত তারিখে ভবনের দ্বার উদ্ঘাটিত হল এবং ঐ একই দিনে আচার্য গোপীনাথ সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন এবং সহযোগী হলেন পন্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী। তিনি পূর্বে গ্রন্থাগারিক ছিলেন কিন্তু নবীন ব্যবস্থায় হলেন সহকারী গ্রন্থাগারিক। তাঁর হাতে রইল অমুদ্রিত হস্তলিখিত গ্রন্থরাজির ভার।

এই যে নতুন ব্যবস্থা তাতে আচার্য গোপীনাথের হাতে এল এক গুরুত্ব-পূর্ণ দায়িত্ব। এই সময়ের কাছাকাছি আচার্য গোপীনাথ এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোস্ট-বৈদিক স্টাডিজ-এর অন্তর্গত কতিপয় গবেষকের কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার পদ গ্রহণ করেন। অবশ্য বিভাগটি সঞ্চালিত হত কাশী সংস্কৃত কলেজ থেকে, তার ফলে আচার্য গোপীনাথকে এলাহাবাদ যেতে হত না। গবেষকগণ কাশীতে বসেই গবেষণা করতেন। আচার্য গোপীনাথের অধীনে গবেষণা করতে এলেন জয়পুর মহারাজা কলেজ থেকে একজন। আর একজন এলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এঁদের বিষয় ছিল 'এ ক্রিটিকাল স্টাডি অব্ দি বেসিস অব্ কটক ভাষ্য' এবং 'এডিটিং অব্ দি ভোকাবুলারি অব্ পোস্ট-অশোকান এন্ড প্রি-গুপ্ত ইন্সক্রিপসন্স্'। কিছু দিন পর আর একজন এলেন আচার্য গোপীনাথের কাছে গবেষণা করতে। তিনি এসেছিলেন জয়পুর থেকে, তিনি এক সময় আচার্য গোপীনাথের শিক্ষক ছিলেন জয়পুরে। তাঁকে ন্যায়শাস্ত্রে গবেষণার কাজ দেওয়া হল।

এই সময় ডঃ ভেনিস উদ্যোগী হয়ে ওঠেন সংযুক্ত প্রদেশে একটি হিসটোরিক্যাল সোসাইটি গঠন করতে। এই প্রদেশে ইতিহাস গবেষণা সংস্থা গড়ে উঠুক এটি তিনি মনে প্রাণে চাইতেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্যের কাছে আশা করতেন যে সংস্থাটি গড়ে উঠলে তাঁর নিবন্ধগুলো এতে প্রকাশিত হতে পারবে। তিনি আচার্য গোপীনাথের কাছে তাঁর পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে একটি পত্রে লিখে জানান। তার সারাংশ হলঃ এই এলাকা ভারতীয় ইতিহাস চর্চার একটি মহত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ প্রদেশে বহু প্রাচীন স্থান ও বড়ো বড়ো প্রাচীন নগর বিদ্যমান। এখনও প্রাচীন পরম্পরা এখানে সজীব রয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু মূল্যবান তথ্যাদি আছে, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এ সবই সংগ্রহ করে প্রকাশিত করার যোগ্য। এ কথাও বিবেচ্য যে গবেষণার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক-তর করা হবে, যাতে এখানকার সাহিত্য, ভাষা, অর্থনীতি প্রভৃতিও এতে অঙ্গীভূত হতে পারবে।

তিনি তাঁকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে বিদ্বানগণের প্রতিক্রিয়া কি হয় জানতে চেয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে ১৯১৫ সালের নভেম্বরে একটি আলোচনা সভা এলাহাবাদে হবে এবং তখন কার্যকারিনী সভা গঠিত হবে। পরিশেষে ঐ সভা স্থাপিত হয় এবং ঐ হিসটোরিক্যাল সোসাইটি নির্মিত হয়। ঐ সংগঠনের জার্নালে আচার্য গোপীনাথের দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় দুটি সংখ্যায়। নিবন্ধ দুটির নাম (১) নোট্‌স্‌ অন্‌ শ্রুঘ্ন (২) নোট্‌স্‌ এ্যান্ড কোয়েরিজ।

এবার আমরা আচার্য গোপীনাথের গবেষণার রীতি প্রকৃতির কথা একটু আলোচনা করব। গোপীনাথ এম-এ ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই গবেষণার কাজে রত ছিলেন। যখন তিনি সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিকের কার্যভার গ্রহণ করেন তখন ডঃ ভেনিসের নির্দেশে ভারতীয় দর্শনের অজ্ঞাত ও অল্প-জ্ঞাত বিষয়ের অনুসন্ধান করতে থাকেন। তাঁর প্রথম অন্বেষণ আরম্ভ হয় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন নিয়ে। তিনি বলেছেন—'প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে যখন আমি গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে, কাশীতে সেবকরূপে প্রবেশ করি এবং সেখানে সরস্বতী-ভবনরূপী গ্রন্থ-রত্নাগার উন্মুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকি এবং প্রসঙ্গতঃ ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্যের ইতিহাস সংকলন কার্যে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ দেখার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।'

তাঁর এই অনুসন্ধান কার্য শুধুমাত্র সরস্বতী ভবনের পুস্তক পাঠে এবং তা থেকে তথ্য সংগ্রহে সীমিত ছিল তা নয়। বরং তিনি কাশীর বিশিষ্ট বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত সংগ্রহ দেখতে উদ্যোগী হতেন।

তিনি বলেছেন, 'এই তথ্য সংগ্রহ কার্যে আমি বাবুলাল জড়ে, মহাদেব শাস্ত্রী পুণতাম্বেকর প্রভৃতি বিদ্বানের পুস্তক ভাণ্ডারও দেখিয়াছি। শুক্ল যজুর্বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার বৈদিক ও তান্ত্রিক মহীধরের পুস্তক সংগ্রহ দেখিবার সুযোগও সে সময় আমি পাই। পণ্ডিত দামোদরলাল গোস্বামীর পুস্তকালয়ও আমি স্বর্গীয় গোপালদাসজীর সৌজন্যে ১৯১৬/'১৭ দেখি।'

যেখান থেকে গ্রন্থ আনা সম্ভব হত না সেখানে বসেই সে বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশ লিখে আনতেন ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগবে বলে। 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুলিপি অথবা সার সংকলন দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করিতাম। সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ের সকল বিষয়ই আমার আলোচনা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল।'

তারপর ঐ সংগৃহীত তথ্যগুলো তিনি কালানুসারে বিভক্ত করে এবং বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করতেন। মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না যে তা দিয়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। 'তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মসন্তোষ।'

আচার্য গোপীনাথ একটি লক্ষ্য নিয়ে গবেষণার কাজে অগ্রসর হন। তাঁর

এবং আচার্য ভেনিসের মনে হয়েছিল যে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস ভাল করে লেখা প্রয়োজন, কেন না এ বিষয়ে এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে বিশদ বিবরণের অভাব লক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে ন্যায়-বৈশেষিকের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে সাবধানী ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখা প্রয়োজন তাহলে ঐ সংগৃহীত তথ্যসমূহের যথার্থ ও সর্বাধুনিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

তখন তাঁর মনে হয়েছিল যদিও সুয়ালি, ফাডেগন ও কীথ এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কার্য করেছেন এবং তাঁরা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বহু অনালোকিত দিক প্রকাশিত করেছেন, কিন্তু স্বল্প তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে তাঁদের রচিত গ্রন্থ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস রূপে অভিহিত হতে পারে না।

তিনি বলেছেন, 'দীনেশ চক্রবর্তীর 'বঙ্গে নব্য ন্যায়' খুবই সুন্দর, কিন্তু এর ক্ষেত্র সীমিত ও বিবরণ সংক্ষিপ্ত। সতীশ বিদ্যাভূষণের হিস্ট্রী অব্ ইণ্ডিয়ান লজিক খুবই আকর্ষক, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় এতেও সেই সীমিত দোষ বর্তমান। আমার মনে হয় এই গ্রন্থের রিভিসন প্রয়োজন, বিশেষ করে সেই সব স্থানে যেখানে মধ্য ও আধুনিক যুগের গ্রন্থপঞ্জী আলোচিত হয়েছে।'

তিনি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে হিস্ট্রি এণ্ড বিবলিওগ্রাফী অব ন্যায়-বৈশেষিক লিটারেচার নামে বিষয়ের অধ্যয়নে ব্যাপৃত হন। তিনি সরস্বতী ভবন স্টাডিজ নামে জার্নালে তাঁর নিবন্ধগুলো পরে প্রকাশিত করেন। এই অনুসন্ধান কার্যে ব্যস্ত থাকাকালে তিনি সরস্বতী ভবনে রক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি দেখতে থাকেন এবং প্রায় ১৫০০ পুঁথি তাঁকে দেখতে হয়। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত পুঁথিও তিনি দেখেন এবং বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ্ও তিনি দেখেছিলেন।

তাঁর তখন কল্পনা ছিল এই ইতিহাস ও গ্রন্থপঞ্জীর কাজ শেষ করে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস রচনায় হাত লাগাবেন। পরবর্তীকালে সরস্বতী ভবন স্টাডীজ নামক জার্নালে যে নিবন্ধগুলো প্রকাশিত হয় তাতে দেখি যে তিনি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস রচনার প্রথম পদক্ষেপ রূপে মধ্য-যুগকে গ্রহণ করেছেন, প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন নি। কেননা তাঁর কল্পনা ছিল যে উক্ত দর্শনের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা অন্য কোনো পৃথক নিবন্ধে করবেন। তিনি যে এ বিষয়ে গবেষণায় রত ছিলেন তা আমরা তাঁকে লেখা ডঃ ভেনিসের চিঠিতে জানতে পারি।

মধ্য যুগের যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের জীবন ও রচনা নিয়ে তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন তিনি হলেন দার্শনিকপ্রবর ভাসর্বজ্ঞ। তাঁর এই অনুসন্ধান কার্যে প্রেরণা দিয়েছেন আচার্য ভেনিস তাঁর চিন্তাধারায় ভাসর্বজ্ঞ সম্বন্ধে নানা বিরোধী ধারণার প্রশ্ন তুলে এবং তার সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে।

তাই তিনি ভাসর্বজ্ঞের প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেন। তিনি এই নির্ণয়ে পৌঁছান যে যোগদর্শনই ভাসর্বজ্ঞের দৃষ্টিকে অবশ্য প্রভাবিত করেছিল।

তাঁর আলোচনায় তিনি তাৎপর্যাচার্য, ত্রিলোচন, বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, ব্যোমশিবাচার্য, উদয়নাচার্য, শ্রীধর, শিবাদিত্য মিশ্র, বরদরাজ, বল্লভাচার্য, শশধর, বাদীন্দ্র, ভট্টরাঘব প্রভৃতি মধ্যযুগের ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ সম্বন্ধে আলোচনা শেষে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেন। এই যুগের আরম্ভ আচার্য-গংগেশ উপাধ্যায় থেকে। আধুনিক যে ধারা আচার্য গংগেশ থেকে আরব্ধ হয় সেটি এক নবীন ধারা এবং তার পথিকৃৎ আচার্য গংগেশ স্বয়ং এবং তাঁর অমূল্য রচনা তত্ত্বচিন্তামণি।

আচার্য গোপীনাথ এই নবীন ধারাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ (ক) মৈথিল সম্প্রদায়ের ধারা (খ) বাংলা ধারা (গ) দক্ষিণের ধারা।

মিথিলায় গংগেশ উপাধ্যায় কর্তৃক ন্যায়ে যে নবীন ধারার প্রবর্তন ঘটে ভারতীয় মননশীলতার ক্ষেত্রে তা এক অভূতপূর্ব অবদান। গংগেশ প্রাচীন শৈলীতে দার্শনিক পদার্থ বিচারের পথ পরিহার করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক ও যুক্তিজালের প্রয়োগাত্মক যে নবীন শৈলী প্রদর্শন করেন তা শুধু ন্যায় দর্শনের বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, পরবর্তী অন্য সব শাস্ত্রেও অনস্বী-কার্য পরিপাটী রূপে গৃহীত হয়। আমরা নব্যন্যায়ের যে শৈলীর সংগে পরিচিত তার সবটাই গংগেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি ও তার টীকা এবং তারও টীকা টিপ্পনীর সংগে সম্পর্কিত।

গংগেশ উপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার তাঁর সুযোগ্য পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায়ে সংক্রান্ত হয়। বর্ধমানের পাণ্ডিত্যের কথা শেষে তিনি বলেছেন যে তাঁর প্রয়াণের পর মিথিলায় নব্যন্যায়ের চিন্তাধারায় যে শূন্যতা আসে তার পূর্তি ঘটে প্রায় শতবর্ষ পর পক্ষধরের আবির্ভাবে। এই পক্ষধরই একদিকে যেমন বাংলার বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণির গুরু, তেমনি অন্যদিকে মিথিলার বহু সুযোগ্য শিষ্যেরও গুরু। এঁদের মধ্যে ভগীরথ ঠক্কুর, বাসুদেব মিশ্র, রুচিদত্ত মিশ্র উল্লেখযোগ্য।

আচার্য গোপীনাথ নব্যন্যায়ে মিথিলার অসামান্য গৌরবের প্রসংগে গংগেশ উপাধ্যায়, বর্ধমান, পক্ষধর, বাসুদেব মিশ্র, রুচিদত্ত মিশ্র, রঘুপতি, ভগীরথ ঠক্কুর, মহেশ ঠক্কুর, জীবনাথ মিশ্র, ভবনাথ মিশ্র, শংকর মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র(২য়), মধুসূদন ঠক্কুর, দেবনাথ ঠক্কুর ও গোপীনাথ ঠক্কুর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বাংলা শৈলীর কথা আলোচনা প্রসংগে তিনি সর্বাগ্রে বাসুদেব সার্বভৌমের মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলায় নব্যন্যায়ের আচার্যরূপে বাসুদেব সার্বভৌম বিদ্বৎসমাজে চিহ্নিত হয়ে থাকেন, কিন্তু আচার্যদেব কন্দলীকার শ্রীধর ও অন্য বিস্মৃত আচার্যের কথা বলেছেন, বলেছেন তাঁরাই বাংলায়

ন্যায়ের পথিকৃৎ। তিনি বাংলায় নবীন ধারার প্রসংগে আরম্ভ করেছেন সার্ব-ভৌম পিতা মহেশ্বর বিশারদ থেকে। তারপর বাসুদেব সার্বভৌম, রত্নাকর, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য, জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির কথা। তারপর রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ, ভবানন্দ, রামরুদ্র, রামভদ্র সার্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য শতাবধান, রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, গৌরীকান্ত সার্বভৌম, হরিরাম তর্কবাগীশ, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, গদাধর ভট্টাচার্য, বসুদেব ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম তর্কালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, মহাদেব ভট্টাচার্য প্রভৃতির কথা।

দক্ষিণের ধারার কথা বলতে গিয়ে তিনি তর্কভাষার টীকাকার চেন্নুভট্টের কথা বলেছেন, তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর কাশীবাসী মহাদেব পুনতাম্বেকরের কথা, দণ্ডীস্বামী নারায়ণ তীর্থ, কোণ্ডভট্ট, কৃষ্ণভট্ট আর্দে, মাধব দেব, ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র, রামকৃষ্ণ অধ্বরীনের প্রসংগ উল্লেখ করে গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন।

আমরা দেখতে পাই যে তিনি আনুমানিক একাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্থিত ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণের গ্রন্থ বিবরণ উপস্থিত করেছেন। সরস্বতী ভবনে গ্রন্থাগারিক রূপে অবস্থান কালে তাঁর এই গবেষণা কার্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় একথা বিদ্বান মাত্রই স্বীকার করবেন।

আচার্য ভেনিসের সংগে তাঁর যে অন্তরংগতা গড়ে উঠেছিল তা প্রতিদিন নানা ব্যবহারে আরো গভীর হয়ে ওঠে। তিনি তাঁকে ধৈর্যশীল শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সুশিক্ষা ও পথপ্রদর্শন করে তাঁর প্রতিভার বিকাশে সহযোগী হয়ে ওঠেন।

আচার্য ভেনিস অবস্থান করতেন সরস্বতী ভবনের সংলগ্ন কক্ষে। গোপীনাথের সংগে তাঁর প্রতিদিন কত বিষয়ে আলোচনা হত তা হয়ত আজ জানা সম্ভব নয় কিন্তু তিনি যখন গ্রীষ্মের অবকাশে নৈনীতালে থাকতেন তখন তাঁর লিখিত চিঠিপত্রে যে অন্তরংগতার সুর ধ্বনিত হত এবং যে পথ প্রদর্শক আচার্যের রূপ প্রকাশ পেত তা কোনোদিন আচার্য গোপীনাথ ভোলেন নি। লৌকিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি আচার্য ভেনিসের কাছে যে প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছিলেন সে ঋণ কোনদিন তিনি ভুলতে পারেন নি।

আচার্য ভেনিস শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে যে শৈলীতে পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল তা যে বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তাধারার পক্ষে একান্ত উপযোগী এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি বলতেন, 'বর্তমান ধারার শিক্ষা প্রণালী উত্তম সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সংগে প্রাচীন ধারা রক্ষা একান্ত আবশ্যক, তা না হইলে প্রাচীন ধারা এক সময় লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং প্রাচীন বিদ্যার গম্ভীর রহস্য ও তার গৌরব পুনরুদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিবে না।'

তিনি সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। অবসর পেলে

তাঁর কাছে বসে কঠিন ও ক্লিষ্ট অংশের পাঠ গ্রহণ করতেন। 'অবচ্ছেদকতা' নামক ন্যায় গ্রন্থের টীকা রচনা করতে তিনিই শিরোমণি মহাশয়কে নির্দেশ দেন। শিরোমণি মহাশয়ও সহর্ষে সে ভার গ্রহণ করেন। আচার্য গোপীনাথের সে বই দেখবার সুযোগ হয়েছিল। শোনা যায় এই পুস্তকের একটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী দ্বিবেদীর নিকট রক্ষিত ছিল। আচার্য ভেনিস মহামহোপাধ্যায় কৈলাস শিরোমণিকে গুরুরূপে স্বীকার করতেন। ন্যায়-বৈশেষিক গ্রন্থপাঠও তাঁর কাছেই করেছিলেন এবং তাঁর যাতে বিষয়ে প্রবেশ হয় এজন্য সহজ ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। তিনি নিজে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের পর্যালোচনায় আনন্দ পেতেন বলে এই বিষয়ের বহু ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। এক সময় তিনি বেদান্ত পরিভাষা, বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, পঞ্চপাদিকা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ ইংরেজীতে করেছিলেন।

কলেজের প্রাচীন পণ্ডিতগণকে তিনি সর্বদা বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁরা প্রাচীন আদর্শ রক্ষার জন্য যে ত্যাগ ও তপস্যা করে চলেছেন সে জন্য তাঁদের সাধুবাদ দিতেন, বলতেন, 'নবীন ভাবে ডুবে যাবেন না, নিজ পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বদা প্রযত্নশীল থাকবেন।' যখন কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় বৃদ্ধ হয়ে কার্যে অশক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর অবসর নেবার সময় হয় তখন তিনি তাঁকে অব্যাহতি দিলেন না বরং তাঁর কার্যকাল বাড়িয়ে দিলেন। তারপরও যখন আরও অশক্ত হলেন তখন পালকী করে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন কলেজে আসতেন, এবং অল্প সময় থেকে চলে যেতেন। আচার্য ভেনিস তাঁর মূল বেতনের সবটাই আজীবন পেনসনের ব্যবস্থা করে দেন।

আচার্য ভেনিস পরলোকগমনের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত নিজ প্রিয় বিষয় পুরাতত্ত্ব ছেড়ে ন্যায়-বৈশেষিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু বিষয় সম্পূর্ণ না হতেই তাঁকে সংসার থেকে চলে যেতে হল। অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৪ই এপ্রিল ১৯১৮ সালে নৈনীতালে পরলোকগমন করেন।

তাঁর প্রসঙ্গে আচার্যদেব লিখছেন, 'তাঁহার অভাবে আমি এক প্রকার পিতৃহীন ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছিলাম। এই সময়ে শ্রীগুরুর স্নেহ-সম্বন্ধই আমার সান্ত্বনার মূল উপজীব্য ছিল।' মৃত্যুর কিছুকাল আগে আচার্য গোপীনাথকে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সরস্বতী ভবনে যে অমূল্য গ্রন্থরাজি বিদ্যমান ধীরে ধীরে সে সব গ্রন্থের মধ্যে যেগুলো অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ সেগুলো একটি একটি করে প্রকাশিত করতে হবে। তাঁর সম্পাদনা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সম্পন্ন করে তাতে বিস্তৃত ভূমিকা দিতে হবে। এর নাম কি হবে তারও নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন প্রকাশিত গ্রন্থের নাম হবে প্রিন্সেস্ অফ ওয়েলস্ সরস্বতী ভবন টেক্সট্স্, আর একটি হবে জার্নাল, তাতে গবেষণালব্ধ নিবন্ধ থাকবে।

আচার্য ভেনিসের একটি পুত্র ছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে পুত্রটি নিহত হয়, কন্যারও বিবাহ হয়ে যায়। স্বামীস্ত্রীর ছোট সংসারে আর কেউ ছিল না। পতির মৃত্যুর পর স্ত্রী আর্থিক বিপন্নতা অনুভব করতেন। আচার্য গোপীনাথের কাছে দু-একবার তিনি এসেছিলেন, তখন আচার্যদেব তাঁকে সে সময় সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

তাঁর অসুস্থতার সময় মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁর ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বাংলায় অনূদিত গ্রন্থটি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। আচার্য গোপীনাথ তাঁকে পরিচিত করলে তিনি স্বহস্তে ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আচার্য ভেনিসের হাতে তুলে দেন। আচার্য ভেনিস খুব প্রসন্ন হলেন গ্রন্থ পেয়ে। তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়কে অনেক শাস্ত্রীয় কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর তখন মনে পড়ল তিনি ঐ বাৎস্যায়ন ভাষ্য ও ন্যায়বার্তিক ভিজিয়ানাগ্রাম সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ঐ গ্রন্থের সম্পাদক। তর্কবাগীশ মহাশয় আচার্যের সঙ্গে কথা বলে প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন।

আচার্য ভেনিসের পরলোকগমনের পর ডঃ গঙ্গানাথ ঝা স্থায়িভাবে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। আচার্য গোপীনাথ ডাঃ ঝার সঙ্গে পূর্বপরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দও ছিল।

ডঃ ঝা আচার্য ভেনিসের স্থানাপন্ন হয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ হাতে তুলে নিলেন। তিনি প্রিন্সেস্ অফ ওয়েলস্ সরস্বতী ভবন স্ট্যাডিস্ নামক গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত করে তুলতে আগ্রহী হয়ে তাঁর যোজনা ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন, ইউ-পি-র কাছে পাঠালেন। তিনি জানতেন যে বেনারস সংস্কৃত কলেজের স্থাপনার কাল থেকে (১৭৯১) অধ্যক্ষ ব্যালানটাইন, গ্রিফিথ, থিবো ও ভেনিসের কাল পর্যন্ত যোগ্য ও বিদ্বান অধ্যক্ষগণের উদ্যমে এই কলেজের মাধ্যমে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঐ সব কাজের মহত্ত্বের কথা বিবেচনা করলে হর্ষ ও গর্ব অনুভূত হয়। বিদ্বান গবেষকগণ এ পর্যন্ত যা কিছু কাজ করেছেন তা অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। কলেজের নিজস্ব কোন জার্নাল ছিল না। ডঃ গঙ্গানাথ ঝা মনে করলেন যে বিদ্বান ও গবেষকের দীর্ঘশ্রমে আহৃত তথ্য ও সামগ্রী নিবন্ধ রূপে প্রকাশিত করতে হবে এবং তা হবে কলেজের নিজস্ব জার্নালে, তা হলে বিদ্বানদের নিবন্ধাবলী প্রকাশনার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে না।

তিনি লিখছেন, 'আমাদের পক্ষ হইতে একটি জার্নাল প্রকাশ করা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ঐ জার্নালে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রূপে আমার, আমাদের প্রতিভাশালী গ্রন্থাগারিক গোপীনাথ কবিরাজের, সহকারী গ্রন্থাগারিক নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে এবং সাধোলাল ন্যাসের বৃত্তিভোগী গবেষকদের নিবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবে। তাঁহারা সকলেই আমাদের ব্যবস্থাপনায় ও নিরীক্ষণে গ্রন্থাগারে কাজ করিতেছেন।'

উল্লিখিত উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রেখে একটি প্রস্তাব ৯ই নভেম্বর, ১৯১৮ সালে সরকার সমীপে উপস্থিত করা হয়, যার ফলে সংযুক্ত প্রদেশের শিক্ষা নির্দেশক ডিরেকটর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন, ইউ-পি মাননীয় সার হারকোর্ট বাটলার নিজ প্রযত্নে উক্ত প্রস্তাব স্বীকৃত করান।

তারপর ২০শে মার্চ, ১৯২২ সালে সরস্বতী ভবনের প্রথম জার্নাল প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এর পূর্বেই প্রিন্সেস অফ ওয়েলস সরস্বতী ভবন টেক্সট-এর প্রথম গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত সিরিজের প্রথম গ্রন্থ কিরণাবলী ভাস্কর। গ্রন্থের সম্পাদক গোপীনাথ কবিরাজ। গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রিফেটরি নোট লিখেছেন তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গঙ্গানাথ ঝা।

তিনি গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে লিখছেন, অধ্যক্ষ আর· টি· এইচ· গ্রিফিথ-এর কালে ই· জে· লাজারাস অ্যান্ড কোং 'পণ্ডিত' নামে অমূল্য জার্নাল প্রকাশিত করেন। ঐ জার্নালটি আনুমানিক চল্লিশ বর্ষকাল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশন ও অনুবাদ কার্য করে। ঐ কার্যে সহায়ক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের বিদ্বন্মণ্ডলী। পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উক্ত প্রকাশন সংস্থার মাধ্যমে এবং অধ্যক্ষ ভেনিসের তত্ত্বাবধানে ভিজিয়ানাগ্রাম স্যান্‌স্‌ক্রিট সিরিজ, নাম দিয়ে কতিপয় অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে ডঃ জি· থিবো-র অধ্যক্ষতা কালে (১৮৪০—১৮৯০) ব্রজভূষণ দাস নামক প্রকাশন সংস্থা স্থাপিত হয় এবং কতিপয় গ্রন্থ উক্ত সংস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

এই প্রথম সংস্কৃত কলেজ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে প্রকাশন কার্যে অবতীর্ণ হল। এর প্রকাশন ও মুদ্রণ সরকারের নিজস্ব মুদ্রণ যন্ত্রে হবে এবং গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব থাকবে অধ্যক্ষের হাতে অথবা এর গ্রন্থাগারিকের হাতে অথবা কলেজের যোগ্য পণ্ডিতগণের উপর।

তিনি আরও বলেছেন যে বর্তমান গ্রন্থটি (কিরণাবলী ভাস্কর) আচার্য ভেনিসের জীবনকালেই প্রকাশনযোগ্য গ্রন্থরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। তিনি নিজেও ইউনিভার্সিটি প্রফেসর অফ পোস্ট-বৈদিক কালচার রূপে এ বিষয়ে কিছু কাজও করেছিলেন।

আচার্য গোপীনাথ তাঁর দীর্ঘ ভূমিকায় (পৃঃ ১-১০) গ্রন্থের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্ত পাদ ভাষ্যের উদয়নকৃত কিরণাবলী ব্যাপকভাবে পঠিত গ্রন্থের অন্যতম; এর কয়েকটি টীকার অস্তিত্বই একথা প্রমাণ করে।...... কিরণাবলী গ্রন্থের টীকা সমূহের মধ্যে একটি টীকাই এ পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। উহা বর্ধমানকৃত কিরণাবলী প্রকাশ। কিরণাবলী একটি ক্লিষ্ট গ্রন্থ, তার ক্লিষ্টতা ততটা ভাষার নয়, কেননা ভাষা স্বচ্ছ এবং অস্পষ্টতা বর্জিত কিন্তু ইহার সূক্ষ্মতা এমনই যে ভাল কোন টীকা ভিন্ন তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

পদ্মনাভ মিশ্র রচিত কিরণাবলী ভাস্কর এখন প্রকাশিত হইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হইল।'

পদ্মনাভ নিজ গ্রন্থ ভাস্করের প্রশংসা করে বলেছেন, এই টীকা বর্ধমানকৃত প্রকাশের অনালোচিত বিষয়ের পূরক। আচার্য গোপীনাথ বলছেন—'এই গ্রন্থটি সাবধানে অধ্যয়ন করিলে গ্রন্থকারের উক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হয়।'

আচার্য গোপীনাথ যে দ্বিতীয় গ্রন্থটি সরস্বতী ভবন টেক্সটের অন্তর্গতরূপে সম্পাদনা করেন তার নাম 'কুসুমাঞ্জলি বোধনী।' এর টীকাকারের নাম বরদরাজ মিশ্র। এর প্রকাশনকাল ১৯২২। এই টীকা গ্রন্থটি উদয়নাচার্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ন্যায়কুসুমাঞ্জলি নামক ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঁচটি স্তবকে বিভক্ত। উক্ত স্তবকসমূহে উদয়নাচার্য কতিপয় কারিকায় সংক্ষেপে বিষয় নিরূপণ করে গদ্যাত্মক প্রকরণে তার ব্যাখ্যা রচনা করেন। গ্রন্থটি স্বভাবতঃই অত্যন্ত দুরূহ এবং সূক্ষ্ম যুক্তিজালে আকীর্ণ। আচার্য গোপীনাথ লিখেছেন যে, 'উক্ত গ্রন্থের বর্ধমানকৃত 'প্রকাশ' এবং গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ রচিত বিবেক নামক টীকা পণ্ডিতগণ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ পাঠ কালে সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকেন। এই গ্রন্থের বাস্তবিক আশয় অধিগত করতে হলে উক্ত টীকাদ্বয় একমাত্র অবলম্বন। প্রকাশকার তাঁর টীকায় যতটা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন তাতে মনে হয় সেটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ, মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় জানার পক্ষে তা তত সহায়ক নয়।

কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের অন্য যে সব টীকা বর্তমান তাদের মধ্যে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের টীকা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু উক্ত টীকা শুধু কারিকাংশের ব্যাখ্যা মাত্র। শঙ্কর মিশ্র, রামভদ্র ভট্টাচার্য, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন এবং নারায়ণ তীর্থ প্রভৃতির টীকা ও কারিকা মাত্রই ব্যাখ্যা করেছেন, প্রকরণ অংশ পরিহার করেছেন।

বরদরাজ মিশ্র সম্ভবতঃ মিথিলাদেশবাসী ছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম ছিল রামদেব মিশ্র।'

আচার্য গোপীনাথ বরদরাজের বোধনীর প্রসঙ্গে বলেছেন—'বোধনীর বিষয়বস্তুর বিবরণ প্রস্তুত করা এখানে সম্ভব নয়, কেননা তাহা হইলে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের বিশদ বিবরণ ও তার সুবিন্যস্ত অনুশীলন আবশ্যক হইয়া পড়িবে। এ জাতীয় বিস্তৃত অধ্যয়ন এইরূপ একটি ভূমিকার সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে কুসুমাঞ্জলির স্থান নির্দেশ এবং ঐ জাতীয় গ্রন্থের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করার জন্য গুটিকয়েক কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ এরূপ একটি বিশ্বাস উদয়নাচার্য সম্বন্ধে প্রচলিত যে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্য কুমারিল ভট্ট এবং শংকরাচার্যের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার রচিত 'আত্মতত্ত্ববিবেক' নির্দয় তর্ককুঠারে দার্শনিক বৌদ্ধ-বিচারধারার উপর যাহা দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান

ছিল প্রবল আঘাত প্রদান করে এবং যাহার ফলে ঐ বাদপরম্পরা আর কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহাকে অর্ধ-সত্য বলা উচিত। উদয়নের কালে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় দেখা দিয়াছিল, যদিও কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পরও কোন কোন অঞ্চলে ঐ ধর্মের প্রভাব লক্ষিত হইত, কিন্তু তাহার যৌবনোচিত বলিষ্ঠতা ও সজীবতা যাহা আমরা ধর্মকীর্তি, দিঙ্নাগ, প্রজ্ঞাকর ও সুভূতির মধ্যে পাই তাহা সর্বথা অস্তমিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা বলা কঠিন উদয়নের প্রয়াস ইহার অবক্ষয় ও পতনে কতটা দায়ী। যাহা হউক এরূপ একটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের ঐ অন্ধকারময় যুগের সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানের স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। তবে একথা সত্য যে বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান সর্বাংশে সার্থক এবং এ কথাও সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে ভারতীয় বিচারধারায় খুব কমই গ্রন্থ বর্তমান যাহাতে তাঁহার মত অন্তর্দৃষ্টি এবং বিদগ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'আত্মতত্ত্ববিবেকে' আত্মস্বরূপ নিরূপণে যাহা করিয়াছেন কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থেও ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহাই করিয়াছেন। নৈয়ায়িকের দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া তিনি ঈশ্বরবাদ খ্যাপন ও প্রতিষ্ঠাপন এক আশ্চর্য পারদর্শিতায় সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি তীক্ষ্ণ তর্কজালে একদিকে যেমন সনাতনপন্থী সাংখ্য ও মীমাংসকগণের মতবাদ পর্যুদস্ত করিয়াছেন, অন্যদিকে চার্বাক ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন।'

তিনি নিজ দশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় আরও বলেছেন যে, ন্যায়মতে ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে কুসুমাঞ্জলি একটি মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পরবর্তী সময়ে সরস্বতী ভবন জার্নালে আচার্য গোপীনাথ ঐ গ্রন্থের অনুবাদে প্রয়াসী হন এবং জার্নালের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫৯-১৯১ পৃষ্ঠায় তাহা প্রকাশিত হয়। তাঁর ঐ ইংরেজী অনুবাদ অসম্পূর্ণ কিন্তু তাতেও আমরা তাঁর অসামান্য প্রতিভার সন্ধান পাই। তিনি কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি মনে করেন সম্ভবতঃ এটিই এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রথম। অভিনব গুপ্ত রচিত ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী যদিও খুব উঁচুস্তরের এ জাতীয় গ্রন্থ কিন্তু এটি কাশ্মীর শৈব দর্শনের অনুগামী। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও তাঁর তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে ঈশ্বরানুমান প্রকরণে উদয়নেরই বক্তব্যের সার সংগ্রহ করেছেন। এই সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ যাঁরা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পরবর্তী, তাঁরা বিশেষ করে তর্কপদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা নিজেদের বিচারপদ্ধতিতে অধিকতর গম্ভীর ও মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় যেমন, ঈশ্বর, আত্মা ও তার কর্ম সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এই যুগে তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্র সীমিত হয়েছে। পূর্বে যেখানে দার্শনিক গ্রন্থে তত্ত্ববিচারেরই প্রাধমিকতা ছিল সেখানে স্থান নিয়েছে রহস্যবাদ ও ভক্তি। তর্ক ও ভক্তির মধ্যে যে বাস্তব সম্বন্ধ ছিল তা আজ বিসর্জিত অথবা অস্পষ্টতার অস্বচ্ছতায় মলিন হয়েছে এবং কোন কোন অংশে সিদ্ধান্ত ও

আচরণে পার্থক্য দেখা দিয়েছে, ফলতঃ আন্বীক্ষিকীর যে মৌলিক অর্থ এক-দিন জনমানসে স্পষ্ট ছিল তা মলিন হয়েছে এবং তা হয়েছে যুক্তিবাদের আতিশয্যে। তার ফলে আমরা গঙ্গেশোত্তর যুগের সাহিত্যে সেই সাবলীল আন্তরিকতা ও নৈতিক উদ্যম লক্ষ্য করি না যা আমরা উদয়নের রচিত গ্রন্থের প্রতি পংক্তিতে পাই।

আচার্য গোপীনাথ বলেন বরদরাজ তাঁর টীকায় অনেক অন্ধকার স্থানে আলোকপাত করেছেন। তিনি এমন বহু স্থান নিজ ব্যাখ্যায় ভাস্বর করেছেন যা জানলে উদয়নের কোনো কোনো পংক্তির বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়ে। আচার্য গোপীনাথ এরূপ দুএকটি স্থানের উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তিনি কুসুমাঞ্জলি বোধিনী গ্রন্থ কিভাবে পান তার একটি বিবরণ দিয়েছেন নিজ ভূমিকায়।

'১৯১৬-১৭ সালের শীতে আমার প্রিয় অধ্যাপক ডঃ ভেনিসের নির্দেশে আমি কাশীরই কতিপয় ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপির খোঁজ ও পরীক্ষণের কার্যে নিযুক্ত হই। আমার উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থপঞ্জীয়নের উপযোগী মালমশলা সংগ্রহ যাহা দ্বারা আমি ভবিষ্যতে ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনা করিতে সমর্থ হইতে পারি। এই অন্বেষণ কালে আমি কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পাই যার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটি অর্থাৎ কুসুমাঞ্জলি বোধনী অন্যতম। এটি পণ্ডিত মুকুন্দ শাস্ত্রী পুনতাম্বেকরের অধিকারে ছিল। তিনি এই গ্রন্থটি আমার হাতে তুলিয়া দেন এবং এটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল, কেননা গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ আচার্য কর্তৃক রচিত বলিয়া সেসব গ্রন্থ অতি সাবধানে অধ্যয়ন আবশ্যক। এবং পরিশেষে এরূপ মনে হইয়াছিল যে ইহাদের রক্ষণের একমাত্র উপায় উহাদের বিষয়বস্তু প্রকাশ করা।

কিন্তু শীঘ্রই এরূপ ধারণা হইল যে সূচনায় কার্যটি যতটা সহজ মনে হইয়াছিল সে তুলনায় কার্যভার অত্যন্ত গুরুতর। গ্রন্থটি দুর্লভ বলিয়া পাঠভেদ ও তুলনাত্মক বিচারের জন্য অন্য আর একটি গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না, ফলতঃ একটি মাত্র পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হইয়াছিল। ইহার ফলে আমি প্রায় নিরুদ্যম হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশনের কার্যে আমার উপর যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আসিয়াছে যদি হৃদয়ে সে বোধের অভাব থাকিত, যদি আচার্যপ্রবর ভেনিস আমাকে নিরন্তর প্রেরণা ও উৎসাহ না দিতেন তাহা হইলে আমি এ কার্য হইতে বিরত হইতাম।'

এই যুগেই অথবা এর অল্প কিছুকাল পর 'বিম্বৎচরিত পঞ্চকম্' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক সরস্বতী ভবন। গ্রন্থের সম্পাদনা

করেন আচার্য গোপীনাথ। গ্রন্থের রচয়িতা সরস্বতী ভবনের সহকারী গ্রন্থাগারিক পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে মহাশয়।

তাঁর মনে হয়েছিল কাশীর বিশিষ্ট পাঁচজন বিদ্বানের চরিত রচনা করবেন কিন্তু মনে ভরসা ছিল না। ভেবেছিলেন তাঁর মতো লোকের পক্ষে বিশিষ্ট বিদ্বানদের জীবনী রচনা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে? মনে প্রবল উৎকণ্ঠা তো ছিলই আবার আলস্য এসেছিল এই ভেবে তিনি তো তত যোগ্য নন। মনে যখন এই ভাবনা তখন একদিন তাঁর মনে হল আচার্য গোপীনাথকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়।

তখন আচার্যদেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিদিনই কলেজে দেখা হয় কিন্তু সংকোচ এসে বাধা দেয় তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁকে বলতে। একদিন নারায়ণ শাস্ত্রীজী উপস্থিত হলেন আচার্যদেবের গৃহে এবং অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তাঁকে বললেন।

আচার্যদেব তাঁর পরিকল্পনার কথা শুনে শুধু তাঁকে অভিনন্দনই জানালেন না, তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বললেন—'তুমি যে কাজ করবে বলে ঠিক করেছ তা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। লেখার কাজ শেষ হলে এই বই সরকারী ব্যয়ে সরস্বতী ভবন থেকে প্রকাশিত করা হবে। আমি নিজে এর সম্পাদনা করব। তুমি প্রতিদিন কতটা লিখছ আমাকে এসে শোনাবে।'

এই ব্যবস্থার কথা শুনে পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রীজী আশ্বস্ত হলেন এবং পূর্বের কথা মতো প্রতিদিন লিখিত অংশ আচার্যদেবকে শুনিয়ে আসতেন। ধীরে ধীরে পুস্তক রচনা শেষ হল। এই পুস্তকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগঙ্গাধর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীদামোদর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবকুমার শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী (তাত্যা শাস্ত্রী)—এই ভারত বিখ্যাত বিদ্বৎপঞ্চক উনবিংশ শতাব্দীতে কাশীতে বর্তমান ছিলেন।

আচার্য গোপীনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকায় কাশীর গৌরবোজ্জ্বল পাণ্ডিত্যের নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সে যুগে কাশীতে সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ের যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া ছিল তাহা কাশীস্থিত বিদ্বানগণের বিভিন্ন শাস্ত্র রচনাই সে বিষয়ে প্রমাণ। মধ্যযুগে জ্যোতিষে রঙ্গনাথ, ধর্মশাস্ত্রে নন্দপণ্ডিত, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্রে নারায়ণ ভট্টবংশীয় খণ্ডদেব, ন্যায়শাস্ত্রে মহাদেব পুণতাম্বেকর ও কৃষ্ণভট্ট, সাংখ্য ও বেদান্তে বিজ্ঞানভিক্ষু, বেদান্তী মহাদেব, ব্যাকরণে ভট্টোজী দীক্ষিত, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি, তন্ত্রে নীলকণ্ঠ, ভাস্কর রায় ও প্রেমনিধিপন্ত, বেদে মহীধর, বেদান্তে মধুসূদন সরস্বতী, নৃসিংহাশ্রম এবং অন্য বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত কাশীতে বাস করিতেন। সাহিত্য সম্রাট পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রঅপ্পয্যদীক্ষিত, নৈয়ায়িকপ্রবর

রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কিছুকাল কাশীবাস করেন। এই যুগেই নৈয়ায়িকপ্রবর শঙ্করমিশ্রও কাশীবাস করিতেন।

প্রাচীনকালে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যের ন্যায় এই যুগে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, বল্লভাচার্য কাশীতে ধর্মপ্রচারে আসেন, আর আসেন কবীর, রামানন্দ প্রভৃতি।

ধর্ম, দর্শন অথবা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কোন না কোন বিষয় অবলম্বন পূর্বক বিপক্ষদলন করিয়া বিজয়গরিমা প্রকাশ ও পাণ্ডিত্য খ্যাপনের জন্য কাশী আগমন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত—ইহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয়।

পরে দুঃখ করে বলছেন, 'কোথায় সেই বিদ্বত্তা, সেই তপস্যা, শৌচ, অপরিগ্রহ, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠা ও বিদ্যানুরাগ ? সবই কালগর্ভে নিমজ্জিত এবং বিলীনপ্রায়। যে ব্রাহ্মণগণ বিষের ন্যায় সম্মান প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হইয়া অখিল ঐশ্বর্য তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তপস্যা, বিদ্যাচর্চা ও ধর্মানুশীলনে দত্তচিত্ত থাকিতেন, তাঁহাদের বংশে জাতপুরুষগণ কল্পিত সম্মানকে অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ মনে করিয়া তাহার প্রাপ্তির জন্য বহু আয়াস স্বীকার করে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তপস্যা, বিদ্যা ও শীল বিসর্জনেও পরাঙ্মুখ হয় না। তাহারা ভুলিয়া যায় যে বিদ্বানগণ সম্মান অন্বেষণ করে না উহা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে ভূষিত করে।'

আমরা আচার্যদেবের জীবনে উল্লিখিত আদর্শের প্রতি পরম শ্রদ্ধা দেখতে পাই, নিজ জীবনকেও তিনি ঐ আদর্শেই গঠন করেছিলেন। তিনি সম্মান ও যশের আকাঙ্ক্ষা করতেন না। অথচ যশ ও সম্মান তাঁর কাছে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিল।

কাশীর মহত্ত্বের কথা তাঁর বারবার মনে হয়েছে। সরস্বতী ভবনে গবেষকরূপে যখন নানা পুঁথি দেখতেন তখন কাশীর বিদ্বৎসমাজের একটা পরিচয়জ্ঞাপক গ্রন্থ নির্মাণ করলে কেমন হয় এ ভাবনা মনে উঠেছিল। গ্রন্থ কবে হবে সে ভাবনা বড়ো নয়, তথ্য সংগ্রহে কিন্তু তাতে ভাটা পড়ল না। যদি তাঁর সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কোনো গ্রন্থ রচিত হয় তাহলে কাশীর একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে এবং ভাব-দৃষ্টিতে কাশীর একটা স্বরূপও নিরূপিত হবে। এর ফলে কাশীর সঙ্গে হিন্দুর ধর্মাদর্শের যোগ কোথায় তাও জানা যাবে। একথা তাঁর মনে এসে-ছিল।

তাঁর গবেষণায় কাশী সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। অনেক-দিন ধরে তিনি সংস্কৃত বাঙ্ময়ের সব বিষয়ে তথ্য সন্ধানে রত ছিলেন। অর্থাৎ এই তথ্যানুসন্ধান শুধু ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রেই সীমিত ছিল না, অন্য সব শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের গ্রন্থাদি বিষয়েও তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। 'পরে বুঝিতে পারিলাম যে আমার কাছে চারশো বছরের সামগ্রী সংগৃহীত

হইয়াছে। তখন আমি ঐ সংগৃহীত তথ্যগুলি কালানুসারে বিভক্ত করিয়া শ্রেণীবন্ধ করি। এই সংগৃহীত তথ্য যে কোনদিন পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হইবে তাহা কখনও ভাবি না। তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মসন্তোষ।'

আচার্যদেবের মনে একটা ক্ষোভ ছিল যা পরিণত-বয়সে কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ পেত। বলতেন, 'আমি তো ১৩শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত কাশীর সংস্কৃত সাহিত্য সাধকদের বিবরণ উপস্থিত করেছি। এটি একটি দিগ্‌দর্শন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যে কালে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তারই উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আলোচনা যাতে বিস্তৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত। আজ ৬০/৭০ বছর পর আরও কত নূতন তথ্য জানার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু উৎসাহী গবেষক এদিকে অগ্রসর হলে কত অজ্ঞাত বিষয় আরো জানা যেত।

কাশী তো কেবল পরাবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রই নয়, অপরাবিদ্যারও কেন্দ্রস্থল দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছিল। অনেক সময় নবীন গবেষককে নির্দেশ দিয়েছি তাঁরা কাশীকে তাঁদের গবেষণার বিষয় রূপে গ্রহণ করুন। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য, জৈন সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, শিলালেখ প্রভৃতি উপকরণ অবলম্বনে এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাশীর একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করুন। কিন্তু তা এ পর্যন্ত কেউ তো এগিয়ে এলেন না।'

তাঁর সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনে পরবর্তীকালে আচার্যদেব যে স্বল্পকায় গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'কাশী কী সারস্বত সাধনা।' এই গ্রন্থের প্রকাশক ঃ বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্, পাটনা।

এই গ্রন্থে ১৫২ জন সাহিত্য-সাধকের জীবন ও কৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যা পড়লে আমরা কাশীর এবং প্রকারান্তরে সারা ভারতের চতুর্থ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই।

অবশ্য আচার্যদেব কাশীর আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডলের প্রশংসা করতেন। এক সময়ে কাশী-মৃত্যু ও মুক্তির প্রসঙ্গেও বহু কথা বলেছেন। সে কথার সারাংশ এই যে, 'কাশীর এরূপ মাহাত্ম্য অথবা বৈশিষ্ট্য আছে কি নেই তার নিরূপণ অনুভব দ্বারাই সম্ভব, যুক্তি দিয়ে নয়। ঋষিগণের অনুভবের বলে শাস্ত্রকার কাশীর মহিমা বর্ণনা করেছেন। এখনও শক্তিশালী যোগী নিজের জীবনকালেই এই প্রকার অনুভব লাভ করতে পারেন। মৃত্যুকালে তারক-জ্ঞান লাভ সাক্ষাৎ ভাবে কৃপার ফল বলে কর্মের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই। একথা বলা অনাবশ্যক যে জ্ঞানস্বরূপ শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। কর্মক্ষয় হলে জ্ঞানের উদয় হয়—এটি প্রকৃত সিদ্ধান্ত নয়। বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষাৎ অথবা অপরোক্ষজ্ঞানের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় এবং সব সংশয় কেটে গিয়ে কর্মক্ষয় হয়ে যায়।

যে কৃপার ফলে কাশী-মৃত্যু ঘটে তার সঙ্গে কর্মের কোনো বিরোধ না থাকায় কাশী-মৃত্যু দ্বারা তারকজ্ঞানের উদয় হতেই অধঃ আকর্ষণ এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কৃতকর্মের ফল সুখ কিংবা দুঃখ যা-ই হোক্ না কেন—ঊর্ধ্বলোকে ভোগ করতে হয়। জ্ঞানের উদয় হওয়ার ফলে আর নতুন কর্ম জন্মে না এবং পুরনো কৃতকর্ম ক্রমশঃ সুখ ও দুঃখ রূপ ফল ভোগ জন্মিয়ে ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে এবং জীব পরমা মুক্তির অধিকারী হয়।'

আচার্যদেব যেমন লৌকিক কাশীক্ষেত্রের মাহিমার কথা বলেছেন তেমনি অন্য এক নিবন্ধে 'আধ্যাত্মিক কাশীর' প্রসঙ্গও করেছেন। তাতে বলেছেন ঐ আধ্যাত্মিক কাশীই শঙ্করাচার্য প্রশংসিত 'নিজবোধরূপা' এবং তা হল আত্মস্বরূপ থেকে অভিন্ন। এই আত্মবোধে কিভাবে যোগী উপনীত হন তার বর্ণনা সে নিবন্ধে দিয়েছেন। এই কাশীধাম জ্ঞানী এবং যোগীর প্রাপ্য, অজ্ঞানী সে জ্ঞানপীঠে উপনীত হতে পারে না।

১৯২৪ সালে আচার্য গোপীনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ডঃ গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে এই অধ্যক্ষপদ রিক্ত হয়। এই সম্মানজনক পদের অনেকে প্রত্যাশী ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে প্রবীণ ভারত ও বিদেশে প্রখ্যাত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ও এই পদের প্রার্থী ছিলেন। যে নির্বাচন সমিতি অধ্যক্ষ পদের নির্বাচনের জন্য সংগঠিত হয়েছিল তার সদস্য ছিলেন ডঃ এ· বি· ধ্রুব ও ডঃ গঙ্গানাথ ঝা স্বয়ং। তাঁরা আচার্য গোপীনাথের বিদগ্ধতা, সর্বতোমুখী প্রতিভা, এবং সংস্কৃত কলেজে তাঁর দীর্ঘকালের শ্রম ও সেবার কথা বিবেচনা করে তাঁকেই অধ্যক্ষতা পদে নির্বাচিত করেন। তিনি তাঁর অধ্যক্ষতাকালে রেজিস্ট্রার এবং সংস্কৃত পরীক্ষার সংযোজকও ছিলেন।

শ্রীগুরু সমীপে

আচার্যদেবের জীবনের অধ্যাত্মপথের পথিকজীবনের সাধন-রহস্য জানার জন্য যে পিপাসা জন্মেছিল তা অনেকটা প্রশমিত হয় আচার্য যোগত্রয়ানন্দজীর সান্নিধ্যে এসে। এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি কি আশা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কি পেয়েছিলেন আমরা পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু যাত্রা সেদিন শেষ হয়নি, পিপাসাও শান্ত হয়নি। তাঁর দীর্ঘজীবনে তিনি বহু সাধক, যোগী ও ভক্তের সম্পর্কে এসেছেন। কারো সঙ্গে হয়ত একবার আবার কারো সঙ্গে বহুবার বহু প্রসঙ্গ হয়েছে। আমরা যখন বই পড়ে কোনো বিশেষ তত্ত্বের কথা জানি এবং তাতে সাধনজীবনের যে ছবি পাই তা তো জীবনের সব কথা নয়। সাধক যে বিশিষ্ট ধারা ধরে চলেন তা পুঁথিতে লিপিবন্ধ কোনো বিশেষ ধারা না হতেও পারে এ বিশ্বাস আচার্যদেবের ছিল বলেই তিনি সন্তগণের ধর্মগত, ধারাগত, সাধনপ্রণালীগত ও সামাজিক স্থিতিগত বাইরের ভেদ উপেক্ষা করেই তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন। 'চরিত কথায় পরোক্ষজ্ঞানই জন্মে কিন্তু, ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ করা যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এইরূপ মহাজনদের চরিত কথা শুনিতে ও পড়িতে ভাল লাগিত, আর এই প্রকার মহাজনের সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্য পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।'

তিনি মনে করতেন যাঁরা অধ্যাত্মপথের পথিক তাঁরা আমাদের নমস্য। তাঁদের চরিত ও উপদেশ আমাদের অধিকার অনুসারে কল্যাণ সাধন করে। যাঁরা বাস্তবিক সাধক তাঁর দৃষ্টিতে মনে হত তাঁরা সকলেই শ্রীগুরুরই মূর্তি বিশেষ। তাই তিনি যে সব সাধক ও যোগীকে দর্শন করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল উদার। তিনি বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজ জীবনে বহুভাবে নিজেকে তাঁহাদের নিকট ঋণী মনে করি ও সর্বদা তাঁহাদের ও তাঁহাদের মাধ্যমে শ্রীমাতার জ্ঞানাশীর্বাদ কামনা করি।'

সাধুদের সম্বন্ধে তাঁর যে এই সরল উক্তি এ ক্ষেত্রেই আমরা তাঁর কাছে সাধুদর্শনের কি যে মূল্য ও মহত্ত্ব ছিল তার একটা ধারণা করতে পারি। সাধু সম্বন্ধে তাঁর মনে বড়ো বা ছোটো এরূপ কোনো ভেদ ছিল না। তিনি অকপট নিষ্ঠায় সাধুর নিকট উপস্থিত হয়েছেন ও ধৈর্য ধরে তাঁদের অনুভবের কথা লিপিবন্ধ করেছেন। তাঁর অনুলেখন দীর্ঘকালের 'অস্পষ্ট স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া হয় নাই। যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা হইত সেই দিনই রাত্রিবেলা তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া রাখিতাম। তবে ইহা

সত্য যে আমি তাঁহাদের কোন উপদেশ প্রচলিত সিদ্ধান্তানুগত করিয়া সাজাইতে চেষ্টা করি নাই এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত পরিভাষাও যথাসম্ভব যথা-শ্রুত রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছি।'

আচার্যদেবের সাধুদর্শন আরম্ভ হয়েছিল ১৯১০ সাল থেকে এবং জীবনের শেষভাগেও এই দর্শন অব্যাহত ছিল। তবে যুবাবস্থা ও প্রৌঢ় অবস্থায় সাধু দর্শনের জন্য যে শ্রম ও উৎসাহ সম্ভব ছিল বৃদ্ধ বয়সে তা সম্ভব ছিল না বলে কোনো সাধু মহাপুরুষের কথা উঠলেই তাঁদের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হলেও সব সময় শক্তির অভাবে দর্শনের সৌভাগ্য ঘটত না।

তিনি বহুকাল ধরে যে সমস্ত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসেন তাঁদের বিবরণ নিজের নোট বইয়ে সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। পরে যখন ১৯৫১-৫২ সালে যোগিরাজ কালীপদ গুহরায়ের সংগে পরিচয় ঘটে তখন তাঁরই অনুরোধে তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত 'হিমাদ্রি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিভিন্ন যোগী ও সাধকের সাধন সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখতে থাকেন। ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'একটি অদ্ভুত বালকের কথা'। ক্রমশঃ অন্য সাধুদেরও প্রসংগ চলতে থাকে।

তাঁর 'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসংগ' নামক দুটি খণ্ডে মোট বারজন সাধুর প্রসংগ বর্তমান। এঁদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া সকলেই সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত। একটি হিন্দী গ্রন্থে আচার্যদেব আরো ৩৯ জন সাধুর প্রসংগ করেছেন। এঁদের নাম ক্রমশঃ ১· লোকনাথ ব্রহ্মচারী ২· ভোলাগিরি ৩· দেবনাথপুরের ভৈরবী ৪· সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫· অন্ধ মাস্টার ৬· নবীনানন্দ ৭· রাসবিহারী সাধু ৮· মায়ানন্দ চৈতন্য ৯· দয়াল ব্রহ্মচারী ১০· স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১১· বসন্ত সাধু ১২· কালিকানন্দ অবধূত ১৩· হরিহরবাবা ১৪· নিশ্চলানন্দ ১৫· তরণীকান্ত সরস্বতী ১৬· সন্তদাস বাবাজী ১৭· মহানন্দ গিরি ১৮· হরিপ্রসাদজী ১৯· কেশবানন্দ ২০· জগদীশ মুখোপাধ্যায় ২১· বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী ২২· তারকেশ্বর মা ২৩· পালধি মহাশয় ২৪· কালীনাথ স্বামী ২৫· বালানন্দ ব্রহ্মচারী ২৬· নৌকামা ২৭· টুঁড়ি পাড় কা বাবা ২৮· সাচ্চা বাবা ২৯· স্বামী প্রেমানন্দ ৩০· পুলিন ব্রহ্মচারী ৩১· সীতারাম দাস ৩২· নির্বিকল্পানন্দ তীর্থস্বামী ৩৩· কালীপদ গুহরায় ৩৪· মেহের বাবা ৩৫· উপবাসী বাবা ৩৬· সত্য সাঈ বাবা ৩৭· কমরু বাবা ৩৮· কোঠারী বাবা ৩৯· মাধব পাগলা।

তাঁর নিজ গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের কথা তাঁর সম্পাদিত শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস গ্রন্থে, মা আনন্দময়ীর প্রসংগ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নামক গ্রন্থের ভূমিকায়, 'মাদার এজ সীন বাই দি ডিভোটীজ' নামক গ্রন্থে, রামদয়াল মজুমদারের কথা দয়াল প্রসংগ নামক গ্রন্থে, মুক্তানন্দগিরির কথা আনন্দবার্তা পত্রিকায়, শোভা মা, সিদ্ধিমাতা, মাধবপাগলা প্রভৃতির কথা বিভিন্ন

পুস্তকে আলোচনা করেছেন। একটি বুদ্ধের কথা 'বুদ্ধের উপদেশ' এই নামে উত্তরায় এবং কল্যাণে প্রকাশিত হয়।

এই সব সাধুজীবনের তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে সব তথ্য তাঁর অধ্যাত্মজীবন ও ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেছে। কিন্তু এখনও কারো নিকট তিনি দীক্ষা প্রার্থনা করেন নি। কারো কাছে দীক্ষা নেবেন এরকম ভাবনাও ছিল না। একবার মনে হয়েছিল যোগত্রয়ানন্দের কাছেই হয়ত দীক্ষা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছা অন্য প্রকার ছিল তাই তিনি পূর্ব নির্ধারিত কোন্ অনির্দেশ্য কারণে গুরুর কাছে স্বয়ং উপস্থিত হন। কিভাবে এই যোগাযোগ ঘটে তার এক বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন। এক ব্রহ্মচারী যুবকের কাছে নাম শুনেছিলেন মহাপুরুষটির। তিনি যোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস।

'১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি বাবাজীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করি। সে আজ অনেক দিনের পুরাতন কথা। কিন্তু এখনও সে-দিনটি আমার স্মৃতি-ফলকে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে, বেলা বোধ হয় চারিটা হইবে। একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী যুবকের সহিত কাশীর হনুমান ঘাটের সমীপস্থ আশ্রমে (দিলীপগঞ্জ, বিশুদ্ধানন্দ কুটীর) দ্বিতল গৃহে আমি মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারের জন্য গমন করি। যাইয়া দেখি, সমস্ত গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ, এক প্রান্তে একখানা তক্তাপোষের উপর ব্যাঘ্রচর্মের আসনে মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন। সুন্দর সদানন্দ মূর্তি, প্রসন্ন বদন, উজ্জ্বল চক্ষু, দীর্ঘ-বিলম্বিত শ্মশ্রু, প্রশস্ত ললাট, পরিধানে গৈরিক কৌষেয় বসন,—দেখিলেই মনে হয়, যেন প্রজ্ঞা ও করুণা মূর্তি-পরিগ্রহ পূর্বক ত্রিতাপ-তাপিত মর্ত্য-ধামের উদ্ধার সাধনের জন্য অবতীর্ণ। তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, কাহাকেও বিজ্ঞান-তত্ত্বের দুই একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইতেছিলেন। দেখিয়া ও শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ ঐ প্রকার জোরের সহিত আমি কাহাকেও তত্ত্বোপদেশ দিতে দেখি নাই। ঐ প্রথম দর্শনেই আমার মন তাঁহার শ্রীচরণে নত হইয়া পড়িল। বুঝিলাম, আমি যাহা এতদিন অন্বেষণ করিতেছিলাম এখানে তাহা পাইব। কবি বলিয়াছেন—'মনো হি জন্মান্তরসংগতিজ্ঞম্'। জন্মান্তরের সম্বন্ধমূলক সংস্কারসকল চিত্তক্ষেত্রে সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। পরে বিশিষ্ট উদ্দীপক কারণের যোগাযোগ হইলে ঐ সকল সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। তখন পূর্বজন্মের অনুভূত সম্বন্ধ প্রভৃতি চিত্তের আপেক্ষিক বিশুদ্ধি অনুসারে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠে। বাবাজীকে দর্শন করিবামাত্রই আমার যেন বোধ হইতে লাগিল—ইঁনি আমার চিরদিনের পরিচিত, যেন কতদিনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আজ অর্ধ-স্বচ্ছ আবরণের ব্যবধান ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনিও আমাকে প্রথম

দর্শনের মুহূর্ত হইতেই অতিপরিচিতের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।'

প্রথম দর্শনের পর থেকে তিনি প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে মহাপুরুষের সান্নিধ্যে উপস্থিত হতেন, এটি প্রায় নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'বেলা পড়িয়া আসিলেই মন উচাটন হইয়া পড়িত, কোন লৌকিক কার্য ভাল লাগিত না। আশ্রমে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম।'

বিকেল হলে বাবাজী বেড়াতে বের হতেন, তিনিও সঙ্গে যেতেন। কখনো গঙ্গার ধারে ধারে হনুমান ঘাট থেকে অসি ঘাটের দিকে, আবার কখনো নৌকোয় অসি থেকে পঞ্চগঙ্গা ঘাট ও আদিকেশব পর্যন্ত। কখনো পায়ে হেঁটে কুরুক্ষেত্র কুণ্ডের পাশ দিয়ে দুর্গাবাড়ী ও সংকটমোচনের দিকে। সঙ্গে আরও লোক থাকত। ঠিক সূর্যাস্তের সময় আশ্রমে ফিরে আসতেন। সূর্যাস্তের পর বাবাজী কখনো বাইরে থাকতেন না।

বাবাজীর সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠল। তিনি আচার্যদেবকে কথা প্রসঙ্গে সৃষ্টি-রহস্য বোঝাতে গিয়ে শুধু কথাতেই তত্ত্বের দিক্ নির্দেশ করতেন না, প্রত্যক্ষভাবে নানা বস্তুর মাধ্যমে তাদের পরিবর্তন কিংবা কোনো নবীন সৃষ্টি চোখের সামনে করে দেখাতেন।

একদিনের কথা, 'তখনও আমার দীক্ষা হয় নাই। সন্ধ্যাবেলা আহ্নিক করিতে উঠিবার কিছু পূর্বে আমি বাবার তক্তাপোষের পার্শ্বদেশে বসিয়া আছি। শাস্ত্রালাপ হইতেছিল। হঠাৎ বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি হার্টের অসুখ হইয়াছিল? এখনও তোমার হার্ট দুর্বল দেখিতেছি।' আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'হাঁ বাবা, ছয় বৎসর পূর্বে আমার অসুখ হইয়াছিল। তাহার জন্য এক বৎসর কাল আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম। তবে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি।' বাবা বলিলেন, 'দীক্ষা হইলে, সব সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তার কারণ নাই।'—বলিয়া আমার খাদ্যক্রম সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম বলিয়া দিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত করুণার নিদর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।'

আচার্যদেবের মনে এ কথায় আশ্বাস জন্মাল এই ভেবে যে এবার হয়ত সময় এসেছে। তাঁর নিজের মনে একটু উন্মুখতা এলেই তিনি নিশ্চয়ই তাঁকে কৃপা করবেন।

আচার্যদেব আবার বলছেন, 'এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কত উপদেশ শুনিতাম, কত অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতাম, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।'

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের সময় আচার্যদেবের মনে একটা প্রশ্ন উঠল, তিনি বাবাজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, যোগীর পরিচয় কি? যোগসাধনা করে কিভাবে বুঝতে পারা যায় যে যোগ ঠিক ঠিক সিদ্ধ হয়েছে? বাইরের লোকই বা যোগীকে কিভাবে চিনতে পারবে?'

এ-প্রশ্ন শুনে বাবাজী একটু হেসে বললেন, 'বাবা, সেসব অনেক কথা, পরে সব বুঝতে পারবে। তবে সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখ, প্রকৃত যোগী সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হন। যিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন, তিনিই যোগী। যোগীর নিকট কিছুই অসম্ভব থাকতে পারে না।'

এ কথায় আচার্যদেব বললেন, 'এ তো ঈশ্বরের কথা আপনি বলছেন। সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা ঈশ্বরের ধর্ম—মানুষের ধর্ম নয়। অসম্ভবকে সম্ভব করা মায়ার ব্যাপার, মায়া ঈশ্বরের অধীন শক্তিবিশেষ।'

বাবা বললেন, 'যোগীও তো তাই। ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্যের বিকাশ না হলে মানুষ কখনও যোগীপদবাচ্য হতে পারে না। ঈশ্বরই যোগী, যোগীই ঈশ্বর।'

আচার্যদেবের মনে হলো কথা সর্বাংশে সত্য। তিনি বাবাজীর সঙ্গে বহু বিষয়ের আলোচনা করতেন। যোগশাস্ত্রের বহু রহস্য তিনি তাঁর ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছেন। কখনও জাত্যন্তর পরিণাম কিভাবে হয় একটি ফুলের সাহায্যে তা প্রত্যক্ষ দেখাতেন, আবার প্রতিলোম পরিণামে অর্থাৎ ফুল থেকে তাকে কোরকে পরিণত করে দেখাতেন। তিনি বলতেন, কারণে যেমন কার্য অব্যক্তভাবে আছে, সেই প্রকার কার্যেও কারণ অব্যক্তভাবে থাকে।

১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময়ের একটা বর্ণনা তাঁর লেখায় দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন, 'দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের যে চেহারা দেখিয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। উহা বিশ্বগুরুর মূর্তি—পূর্ণ প্রজ্ঞা ও মহাকরুণার একত্র সংমিশ্রণ, অসীম ঐশ্বর্য্য ও অফুরন্ত বাৎসল্যরসের অদৃষ্টপূর্ব মিলন। আমার দীক্ষার সময়েও জ্যেঠা গুরুদেব শ্রীভৃগুরাম স্বামী শ্রীগুরুদেবের কায়াতে দীক্ষা-দানকালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।'

দীক্ষার পরে বাড়ী ফিরে কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করেন। তারপর থেকে কি ঘটে তার বর্ণনা দিয়েছেন: 'তখন হইতেই দেহের মধ্যে একটি নব-ভাবের সঞ্চার ও স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম। বিশুদ্ধ বৈন্দবদেহ কাহাকে বলে তাহা তখন অবশ্য জানিতাম না—ইহা যে সদ্গুরু প্রদত্ত দীক্ষার প্রভাবে মায়িক দেহের সঙ্গে অস্পর্শ যোগে যুক্ত হইয়া অভিন্নবৎ কার্য্য করিতে থাকে তাহার রহস্য তখন জানিতাম না। না জানিলেও তাহার একটা আভাস অনু-ভব করিতে লাগিলাম।'

যখন ক্রিয়ার জন্য পূজার ঘরে যেতেন তখন তিনি কখনো সে ঘরে জাগ-তিকভাব নিয়ে যেতেন না, তাঁর মা ভিন্ন অন্য কারো সে ঘরে প্রবেশ অধিকার ছিল না। এর ফলে কি হয়েছিল সে কথায় বলেছেন: 'ঘরটিতে একটি অদ্ভুত তেজোময়ী শক্তির অধিষ্ঠান হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে অনেক অনেক অদ্ভুত অনুভব ও প্রত্যক্ষ দর্শন নিরন্তর ঘটিতেছিল।'

এ তো গেল দীক্ষার দিনের কথা, কিন্তু তারপর কি হয় সে কথায় বলছেন যে তারপর থেকে বাবাজীর লোকোত্তর শক্তি অন্তর্জগতেও অনুভব

করতে আরম্ভ করি। কিন্তু সে সব কথা সাধন-রাজ্যের গুপ্ত ও গোপনীয় বিষয়—তাহা লোক-সমক্ষে প্রচারিত করা সর্বথা অনুচিত বলিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। তবে ইহা বলিতে পারা যায় যে বাবাজীর উপস্থিতি ও প্রভাব বহুদূরে থাকিয়াও সদা সর্বদাই অনুভব করিতাম। কখন কোথায় যাইতাম, কোথায় বসিতাম, কি কথা বলিতাম, কিভাবে সময় যাপন করিতাম, বাবা সে সকল বিষয়ে প্রতি-নিয়তই সন্ধান লন, তাহা দু-চার দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। শুধু পদ্মগন্ধ বা অন্যপ্রকার দিব্যগন্ধ দ্বারা নহে, আরও বহু উপায়ে তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারিতাম। তিনি প্রায়ই সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, অনেক সময়ে অন্যান্য মহাপুরুষগণও আসিতেন। কখন কখন কেহ কেহ দেখাও দিতেন। যখন কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত, যোগ অথবা ধর্মের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হইত, তখন প্রায়ই বাবা উপস্থিত হইতেন। স্বর্গীয় গন্ধে সকলকে মোহিত করিয়া ও নিজের সত্তা জ্ঞাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তর্হিত হইতেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে, স্মরণ করিতে করিতে, প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহার কথা আলোচনা করিতে করিতে, তাঁহার উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছি।'

কতবার বাড়ীতে ঘোর বিপদে তিনি উপস্থিত হয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

একবার ষট্‌চক্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বাবাজী বলেছিলেন, 'কুণ্ডলিনী জাগিলেই নাভিপদ্ম ফোটে। এই পদ্ম সকলের দেহেই আছে, কিন্তু মুদ্রিত হইয়া আছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর অন্তঃসূর্যের উদয় একই কথা। ইহাই জ্ঞান-সূর্য—ইহার উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে।' এই বলিয়া তিনি বলিলেন, 'আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।' ইহা বলিতে বলিতে তিনি নিজের নাভির চারিদিকে কয়েকবার হাত দিয়া টিপিলেন। দেখা গেল, নাভির গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে—মধ্য হইতে অতি মনোহর কান্তিযুক্ত একটি লাল কমল বাহির হইতেছে। ক্রমশঃ উহা অধিক-তর প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমরা শুঁকিয়া দেখিলাম, অতি মনোহর কমলের সৌরভ, আঘ্রাণ করিলাম। ব্রহ্মণালের উপর কমলটি ফুটিয়া ছিল, নীচে মৃণাল। বাবা বলিলেন, 'বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি—এসব পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই কমল ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থি বন্ধন আছে। ইহার উন্মোচন ভিন্ন সিদ্ধিলাভের আশা দুরাশা মাত্র।'

আচার্যদেব তাঁর গুরুর প্রসঙ্গে যত মুখর হতেন এমনটি আর কিছুতে নয়। গুরুর নানা বিভূতির বর্ণনা করতেন, আবার বলতেন তাঁর মন থাকত বিভূতির দিকে যত নয় তার থেকে বেশী কি করে সেই বিশেষ বিভূতি সম্ভব হয় তার কারণ জানতে। সেই সময়ের কাছাকাছি একবার একজন শক্তিশালী

সাধুপুরুষের দেখা পান। তাঁর নাম ছিল তরণীকান্ত সরস্বতী। তিনি নানা প্রকার চমৎকার দেখাতেন। আচার্যদেব চমৎকার বা বিভূতির খেলা দেখে তাঁকে বলেন কিভাবে তিনি থট্ রিডিং বা থট্ ট্রান্সফারেন্স-এর কৌশল দেখান তাকি তাঁকে বলবেন?

তিনি তাঁর এই প্রশ্ন এড়িয়ে যান এবং বলেন যে অন্য কোনো সময়ে দেখাবেন। একদিন তিনি বিশ্বনাথ গলি দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, সরস্বতী ঠাকুর সেখানে একটি বাড়ীতে থাকতেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, আসুন কবিরাজ মহাশয়, আমি এখন একলাই আছি। চলুন আপনাকে কিছু খেলা দেখাই।

ভেতরে যেতেই বললেন, আপনি আলাদা আলাদা চারটি কাগজে কিছু লিখুন, তারপর ঐ কাগজের টুকরো আলাদা আলাদা করে গুলি করুন। তারপর আসুন আমার কাছে। আমি বলছি আপনি কোন্ কাগজে কি লিখেছেন। তিনি তাই করলেন, সরস্বতী ঠাকুরও নির্ভুল ভাবে কোন্ কাগজে কি লিখেছেন বলে দিলেন।

যখন এই খেলা শেষ হল তখন ঘরের বাইরে থেকে কোনো লোকের আসায় দরজায় আওয়াজ হল। দরজা না খুলেই সরস্বতী ঠাকুর আচার্যদেবকে বললেন—'যে লোকটি এখন এখানে আসবে সে এসে আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে তা আমি দেখুন আগেই লিখে রাখছি।' এই বলে তিনি কাগজে কিছু লিখলেন। পরে দেখা গেল আগন্তুক এসে যে প্রশ্ন করলেন সরস্বতীর লেখা তার থেকে অভিন্ন।

তিনি বিস্মিত হলেন সরস্বতীজীর এই শক্তি দেখে। মনে প্রশ্ন জাগল কি করে এমনটা সম্ভব হয়। তখন প্রতিদিন নিজ গুরুদেবের কাছে যেতেনই। তাঁকে সব কথা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন, জানতে চাইলেন এর রহস্য কি? কিন্তু গুরুদেব তাঁকে বললেন—এর বিশেষ কোনো মূল্য নেই। তাঁর এই উত্তর শুনে মনটা খিন্ন হল কেননা এ তো তাঁর নিজে দেখা অলৌকিক বিভূতি বলে মনে হয়েছে। মনে হল—এ তুচ্ছ কিসে?

তাঁর এই ভাবান্তর দেখে গুরুদেব বললেন—আচ্ছা, এক কাজ কর। তোমার নোট বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে তোমার মনোমত প্রশ্ন লেখ। তারপর ঐ লেখা কাগজটি নিয়ে আমার পূজার ঘরে গিয়ে ওটি পুড়িয়ে ফেল। ছাই সব ধুনুচিতে রেখে গুঁড়িয়ে দাও, তারপর ফিরে এসো এখানে।

তিনি গুরুদেবের নির্দেশে তাই করলেন। এবার যখন গুরুদেবের বসার ঘরে ফিরে এলেন তখন তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কাগজটা পুড়িয়ে ভস্ম করেছ তো?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, ভস্ম করেছি।

তখন গুরুদেব তাঁর তাকিয়ার নীচ থেকে একখানি কাগজ বের করলেন এবং তাঁর হাতে এগিয়ে দিলেন। বললেন, দ্যাখ তো, এটা তোমার সেই কাগজটাই তো? চেন কিনা?

তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ওটি তাঁরই নোট বইয়ের সেই কাগজ যেটি কিছুক্ষণ আগে তিনি পুড়িয়ে এসেছেন। তাতে তাঁরই লেখা কয়টি প্রশ্ন, আরও আশ্চর্য যে পাতাটির উল্টো দিকে মেয়েলি হাতে লাল কালিতে লেখা সংক্ষিপ্ত উত্তর। দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনে প্রশ্ন জাগল কি করে ছাই হয়ে পুড়ে যাওয়া কাগজ আবার আসে আগের রূপে?

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, যে কাগজ একটু আগেই পুড়িয়ে এসেছি তা আবার কি করে ফিরে এল?

বাবাজী তখন তাঁকে বললেন, 'তুমি তো শাস্ত্রে পড়েছ যে, বস্তুর নাশ হয় না, তার আবির্ভাব হয় আর হয় তিরোভাব। তুমি যে কাগজটি কিছুক্ষণ আগে পুড়িয়ে এলে তা তোমার দৃষ্টিতে নষ্ট হল সত্যি কিন্তু সে নষ্ট হলেও তার অস্তিত্ব কিন্তু হারাল না, সে রইল তার কারণে, যাকে তোমরা প্রকৃতি বল তাতে। যদি কোন যোগী প্রকৃতিকে নিজের বশে রাখতে পারে সে ঐ প্রকৃতির স্তর থেকেই তাকে ফিরিয়ে আনতেও পারে। যদি তার অস্তিত্ব প্রকৃতিতেও না থাকে তো তারও মূলে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা যায়। তবে এ শক্তি যাঁর আছে তিনিই তা করতে পারেন।'

এইভাবে গুরু-শিষ্যে তত্ত্ব-কথা চলত। সে সময় আচার্যদেবের মনে হয়েছিল যোগীর বিভূতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধানও তিনি করেছিলেন নিজ মননে ও শাস্ত্রের অনুসরণে। কিভাবে করেছিলেন তার একটি অনুলেখ এখানে উপস্থিত করছি।

অনেকে মনে করেন, বিভূতি দেখানো উচিত নয়, তাতে সাধকের ক্ষতি হয়। আবার অনেকে বলেন, বিভূতি তুচ্ছ জিনিস, তার প্রতি শ্রদ্ধা করার কোনো কারণ নেই। বিভূতি তো অনিত্য ধর্ম, নিত্য বস্তুই সাধ্য, অনিত্য ধর্মের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ উচিত নয়। তারপর অনেকে এ কথাও বলেন, জ্ঞানী বা যোগী মায়ার অতীত ভূমিতে আরূঢ় হবার পর বিভূতিকে অতিক্রম করেন, তিনি বিভূতি দেখাবেন কিভাবে?

তিনি যোগবিভূতি ও অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শনকে ঠিক এক মনে করেন না। 'পরম পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে জীবভাব অভিভূত হইয়া তাহাতে যে ঐশ্বর্যভাবের উদয় হয় তাহাই যোগবিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিরূপে ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া উহা জগতে আত্মপ্রকাশ করে। সমবাহু ত্রিকোণের তিন বিন্দুই উন্মেষপ্রাপ্ত শক্তিত্রয়ের প্রকটিত রূপ। বিভাগের পূর্বে ইচ্ছাদি শক্তিত্রয় মধ্যবিন্দুতে একাত্মভাবে পরাশক্তিরূপে বিলীন থাকে। এই মধ্যবিন্দুতে অবস্থিতিই যোগ—এখান হইতে যে স্ফুরণ হয় তাহাই যোগবিভূতি। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে এই স্ফুরণ প্রকাশিত হয় বলিয়া ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে যোগবিভূতি বলা যাইতে পারে।......যোগ হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। সুতরাং যোগবিভূতি ব্রহ্মজ্ঞানেরই নিদর্শন। বস্তুতঃ চিন্ময়ী পরাশক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে যোগীর অসাধ্য কি থাকিতে

পারে ? তখন মহামায়ার কৃপায় অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া বশীভূত হয়— ইহাই ঐশ্বর্য। কারণ, মায়াকে অধীন করার নামই ঈশ্বরত্ব। ইহা অখণ্ড-ঐশ্বর্য। যাবতীয় খণ্ডৈশ্বর্য ইহারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। যোগী এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর তাহার চ্যুত হইবার ভয় থাকে না।'

তিনি আরও বলেছেন, উপাদান ও নিমিত্তের অভিন্নতা না হওয়া পর্যন্ত এবং অদ্বৈতভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যোগীপদবাচ্য হওয়া যায় না। তিনি যোগ ও বিজ্ঞানেও ভেদ নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন 'জ্ঞানোৎকর্ষ বশতঃ উপাদানকে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা অভীষ্ট কার্য সংসাধন করা চলে। ইহাই বিজ্ঞান।' সূর্যবিজ্ঞানও এরূপ এক বিজ্ঞান। তিনি বলেছেন যে 'সাধারণতঃ লোকে যাকে বিভূতি বলে তাহা বিজ্ঞানেরই ব্যাপার—তাহা যোগবিভূতি নহে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে যে সকল বিভূতির বর্ণনা আছে তাহার অধিকাংশ বিজ্ঞানেরও অন্তর্গত। বিজ্ঞান মতে কার্যের উৎপত্তি তৎ-তৎ কারণ সাপেক্ষ, কিন্তু যোগী নিখিল কার্য স্বাত্মভাব হইতেই প্রাদুর্ভূত করিতে পারেন। এখানে পৃথক কার্যকারণ ভাবের স্বীকার আবশ্যক হয় না।'

আচার্যদেব বিভূতি সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন, এ সম্বন্ধে নানা নিবন্ধে আলোচনাও করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে 'বিভূতি স্বভাবতঃ খারাপ জিনিস নয়। যোগাভ্যাস ও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানতত্ত্বের অভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে বিভূতি আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়। তাহাকে পৃথক-ভাবে আবাহন করিবার প্রয়োজন হয় না, সাধনপথে প্রবিষ্ট হইয়া অধিকারী হইলে সিদ্ধিকে আকর্ষণ করিতে হয় না। সিদ্ধি আপনিই আসে।......তবে শাস্ত্রে যে কোনো কোনো স্থানে বিভূতিকে উপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে, তাহা প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করিয়া। অবশ্য, ইহা মার্গস্থ সাধকের জন্যই বুঝিতে হইবে। মার্গের অবসানে পরা সিদ্ধি যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রের শাসন বাক্য তাহার জন্য নহে।'

আচার্যদেব গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের সান্নিধ্যে প্রায় ২০ বছর কাটিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণও করেছেন। স্বামীজীর জন্মস্থান বণ্ডুল ছাড়াও পুরী, কলিকাতা ও কাশী প্রভৃতি স্থানে সঙ্গ করে-ছেন। তাঁর মনে যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করেছেন, উত্তরও পেয়েছেন। আচার্যদেবের আবাল্যবন্ধু এ সম্বন্ধে লিখেছেন—'গোপী-নাথ তাঁহাকে যেরূপ সহজে তত্ত্বকথায় প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেন, সেরূপ আর প্রায় কোন শিষ্যই পারিতেন না।'

আচার্যদেব দীক্ষার প্রায় আট-নয় বৎসর পর শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবন-চরিত রচনা করে প্রকাশিত করেন। এই চরিতকথার একটি অংশ তত্ত্বকথা। আমরা ঐ তত্ত্বকথা অংশে নানা তত্ত্বের গভীর তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে দেখতে পাই।

আচার্য গোপীনাথের জীবনের নানা প্রসঙ্গ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় তাঁর অমূল্য গ্রন্থ যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিকতার অনুরোধে আমরা তাঁর গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে আচার্যদেবের জীবনের চিত্র উপস্থিত করছি।

দত্তগুপ্ত মহাশয় তাঁর আবাল্যসুহৃৎ আচার্য গোপীনাথ সম্বন্ধে বলছেনঃ

সমস্ত ভারতীয় দর্শনে ও সমস্ত ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে গোপীনাথের অধিকার অসামান্য এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এরূপ যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানের আপাততঃ ভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীগুলির মধ্যেও তিনি মৌলিক ঐক্য বা সামঞ্জস্য অতি সহজেই ধরিয়া ফেলেন। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করে না। কিন্তু মহাপুরুষগণেরও যে দর্শনশাস্ত্রগুলির বহির্ভূত স্ব স্ব সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র পরিভাষা আছে, তাহাও তিনি জানেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনার সময় তাহা মনে রাখিয়া সতর্কভাবে তাঁহাদের কথা শুনিয়া যান। শ্রীশ্রীবাবাজীর (বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস) সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পরিভাষা আছে; তাহা ছাড়া মতেরও আপাত-প্রতীয়মান বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য আছে। বাবার তত্ত্বব্যাখ্যা যতক্ষণ গোপীনাথের শাস্ত্রজ্ঞান ও ধারণার সহিত বেশ সমঞ্জসভাবে চলিতে থাকে ততক্ষণ তিনি শুনিয়া যান। যখন কোনও বিষয়ে বুঝিতে পারেন না, তখন জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতেও যদি ভাব স্পষ্টীকৃত না হয়, তাহা হইলে সুযোগ মত পুনরায় তাহা উত্থাপন করেন এবং এইরূপে একবারে হউক বা দশবারে হউক বিষয়টি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।*

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের। ১৯১৮ সালে গোপীনাথ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন সেকথা অক্ষয়বাবু তাঁর কোনো বন্ধুর কাছে জানতে পান; তার কিছুকাল পরে কাশীতে এসে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে সত্য সত্যই কয়েক মাস পূর্বে তিনি বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী হতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। সে সময় স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে তিনি একজন অত্যুন্নত যোগী এবং বাঙ্গালী। তখন তিনি সূর্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'গোপীনাথ ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং কালজ্ঞ ও পাত্রজ্ঞও বটেন। সেইজন্যই বোধ করি তিনি সেদিন স্বীয় গুরুর যোগৈশ্বর্য সম্বন্ধে আমার কাছে অধিক কিছু ব্যক্ত করেন নাই। বিশেষতঃ ঐ বিষয় জানিবার জন্য আমার আগ্রহও বিশেষ প্রবল ছিল না।'

দত্ত মহাশয় স্বামীজীকে দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আচার্য গোপী-

* যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫।

নাথ বললেন, 'বেশ তো, একদিন বিকালবেলায় তিনটা চারটার সময় যাওয়া যাবে।'

তারপর বিকেলবেলা তাঁরা কয়জন কাশীর হনুমানঘাটের একটি ছোট বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তিনি গুরুদর্শনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকেই এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ 'উপরে দ্বিতলে একটি লম্বা রকমের প্রকোষ্ঠ। উহার এক সীমায় অনুচ্চ একটি তক্তাপোষের উপর যোগিয়া রঙের ক্ষৌম-বস্ত্র পরিহিত একটি মহাপুরুষ বসিয়া ছিলেন। তাঁহার গায়েও একটি ঐ কাপড়ের জামা। বর্ণ ফরসা নয়, সুকৃষ্ণও নয়, কিন্তু বেশ শান্তপ্রসন্ন ছবি। আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, প্রতিভামণ্ডিত মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি ও গোঁফ। বয়স হিসাব মত এই সময়ে ৬২-৬৩ হওয়া উচিত, কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল ৫২-৫৩ হইবে।'

গোপীনাথ তাঁর গুরুর নিকট অক্ষয়বাবুর পরিচয় দিলেন। তখন স্বামীজী অক্ষয়বাবুকে কাশীতে কবে এসেছেন, কতদিন থাকবেন জিজ্ঞেস করলেন। অক্ষয়বাবু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যুক্ত-করে স্বামীজীর কাছে নিবেদন করলেন যে তিনি গোপীনাথের কাছে তাঁর সূর্যবিজ্ঞানের কিছু কিছু কথা শুনেছেন, যদি তিনি দয়া করে কিছু দেখান তাহলে কৃতার্থ হন এরূপ বললেন।

স্বামীজী ঈষৎ হেসে বললেন, 'কি হবে ওসব দেখে?' তারপর কি মনে হল, স্বামীজী পাশের একটা ঘরে গেলেন, সেখান থেকে এক টুকরো তুলো এনে অক্ষয়বাবুকে দেখালেন। তুলো তাঁর বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে ধরে ডান হাতের একটা লেন্স নিয়ে তাতে সূর্যের আলো ফোকাস করলেন। দু-এক মিনিটে তাতে কোনো পরিবর্তন এল না। তিনি অক্ষয়বাবু ও গোপীনাথের নাকের কাছে তুলাটুকু এনে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা কোনো গন্ধ পাচ্ছেন কিনা? দুয়েকবার গন্ধ পাওয়া গেল না। তৃতীয়বারে যখন দেখানো হল তখন গোপীনাথ বললেন, 'একটু মৃদু গন্ধ যেন পাচ্ছি, কিন্তু কিসের গন্ধ তা বুঝা যাচ্ছে না।'

তারপর আবারও লেন্সের ফোকাস চলল, এবার যখন দেখা হল তখন গোপীনাথ সে কথা তাঁকে বললেন—'কর্পূরের মতো গন্ধ একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে।'

চতুর্থবারের চেষ্টায় এবার শুধু গন্ধই হল না, স্বামীজী সেটি ভেঙে সকলের হাতে দিলেন, সে ছিল কর্পূর।

স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার এবং সূর্যবিজ্ঞানে কর্পূর তৈরী হতে দেখে অক্ষয়বাবুর মনে যে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মেছিল তা নয়, তাঁর সোদরপম গোপীনাথের কাছে সূর্যবিজ্ঞানের রহস্য কথা শুনে তাঁর মনে সূর্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। তিনি গোপীনাথের কাছে শুনেছিলেন, 'সূর্যের সাতটি রশ্মির কথা সকলেই জানেন। কিন্তু

সূর্যবিজ্ঞান মতে সূর্যরশ্মি ভাগ করলে তাতে তিনশ ষাটটি রশ্মি পাওয়া যায়। তাতে জগতের সকল বস্তুর উপাদানই আছে; তবে তাতে একটি মূল প্রভা আছে এটিকে শুক্লবর্ণ বলা হয়, একে আবার বিশুদ্ধসত্ত্বও বলা হইয়া থাকে। এই শ্বেত বর্ণের উপর অনন্ত বৈচিত্র্যময় যে রঙের খেলা অবিরত চলিতেছে—তাহাই বিশ্বলীলা এবং তাহাই সংসার। প্রথমে গুরুর উপদেশক্রমে এই শ্বেতপ্রকাশকে স্ফুরিত করিয়া তাহার উপর অন্য বর্ণের ক্রমিক বিন্যাসে বস্তুটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। প্রথমতঃ শুক্লবর্ণকে কিছু-কাল স্তম্ভিত করিয়া রাখিতে হয় এবং নানা বিচিত্রবর্ণের স্বরূপও চিনিয়া ক্রমে ক্রমে বিন্যস্ত করিতে পারিলে লৌকিক স্তরে বস্তুটি প্রকাশ পায়। সূর্যবিজ্ঞানে যে বস্তুর সৃষ্টি হয় তাহা কোন যোগবিভূতি নয়। যাহাকে যোগবিভূতি বলে তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। তাহা যোগীর ইচ্ছাশক্তির খেলা। ইচ্ছাশক্তিতে কোনও উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন নাই—যোগীর ইচ্ছাতেই সব হয়। যোগ আর বিজ্ঞান এক নয়। যদিও গুরুদেব বলেন, যোগ ছাড়া বিজ্ঞান নাই, বিজ্ঞান ছাড়াও যোগ নাই।'

অক্ষয়বাবু গোপীনাথের বিষয়ে নানা কথা বলেছেন। আমরা তাঁর বর্ণনা থেকে আচার্যদেবের যে পরিচয় পাই তাতে যা কিছু প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে তাতে তাঁর জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যায়। আমরা সে সব আহরণ করে এখানে উপস্থিত করছি।

অক্ষয়বাবু কাশীতে এলে আচার্যদেবের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করতেন। ১৯২৯ সালে তিনি কাশীতে আবার আসেন এবং গোপীনাথের গৃহে যান। তখন গোপীনাথ গৃহে ছিলেন না, কলেজে ছিলেন। অক্ষয়বাবু স্নান, আহার ও বিশ্রাম শেষে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে বেড়াতে যান। যখন সেখান থেকে ফিরে এলেন তখন, 'দেখিলাম গোপীনাথ কয়েকজন শ্রোতার নিকট পাতঞ্জল দর্শন ব্যাখ্যা করিতেছেন।• শুনিলাম প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে ঐ কয়টি শ্রোতার আগ্রহে ঐভাবে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা হয়। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন এগার বৎসর পূর্বে দেখা সেই সদানন্দ বিজয়দাদা। আর ছিলেন গোপী-নাথের এক গুরুভ্রাতা কাশীবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে, একটি সন্ন্যাসী—নাম স্বামী শংকরানন্দ, একটি কি দুইটি ছাত্র এবং আরও দুই একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গোপীনাথের মুখেই শুনিয়াছি ঐ ব্যাখ্যাকালে একটা অলৌকিক ব্যাপারে মধ্যে মধ্যেই সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন। সেটি এই—দ্বিতলে তাঁহাদের বসিবার প্রকোষ্ঠটি অকস্মাৎ কোনও দৃষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অপূর্ব পদ্মগন্ধে ভরিয়া যাইত। গোপীনাথ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃদ্বয় অসংশয়ে মানিতেন যে, উহা তাঁহাদের 'গন্ধবাবারই উপস্থিতির নিদর্শন। গন্ধবাবার শিষ্য না হইলেও শ্রোতৃগণের অন্যতম নেপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (চক্রবর্তী) নামক একটি অতিশয় সৎস্বভাব যুবক নাকি একদিন মুহূর্তের জন্য গন্ধবাবাকে জানালার কাছে গোপীনাথের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিতেও দেখিয়াছিলেন। এটা অলৌকিক দর্শন; যে জানালার বাহিরে মূর্তি দেখা গিয়াছিল, তথায় স্থূল দেহে কাহারও দাঁড়াইবার স্থান নাই।*

অক্ষয়বাবু দীক্ষা নেবেন কিন্তু কুলগুরুর বংশধারা না থাকায় কার কাছে মন্ত্র গ্রহণ করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না, মনে উঠেছিল নানা সংশয়। তাই একদিন গোপীনাথকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'গোপীনাথ, তুমি ত নানা শাস্ত্র যথেষ্ট চর্চা করিয়াছ। কুলগুরুর নিকটই মন্ত্র গ্রহণের অবশ্য কর্তব্যতা সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে, তাহার যৌক্তিকতা বিষয়ে মনে নানা সন্দেহ হয়। রামদয়াল মজুমদার মহাশয় বলেন, কুলগুরু যেরূপ ব্যক্তিই হউন, তাঁহার নিকটেই মন্ত্র নেওয়া উচিত।'

একথার উত্তরে আচার্যদেব বললেন, হাঁ, শাস্ত্রে ঐরূপ কথা আছে। তখন অক্ষয়বাবু তাঁকে বললেন যে কুলগুরুই কুলদেবতা সম্বন্ধে খবর রাখেন। পূর্বপুরুষগণ যে দেবতার সাধনা করেছেন, সেই ধারা ধরে চলাই বংশধর-গণের পক্ষে উচিত। আবার এমনও হতে পারে পূর্ব জন্মের আধ্যাত্মিক প্রযত্নের সঙ্গে সংগতি রেখেই জীব একটি বিশেষ বংশে জন্মগ্রহণ করে।

একথার উত্তরে গোপীনাথ বললেন, হতে পারে। তবে কুলমন্ত্র যে সকলের পক্ষেই মঙ্গলকর হবে তা-ই বা বলি কিভাবে। সেদিন আমার আত্মীয় মাখনবাবু গুরুদেব থেকে দীক্ষা নিলেন। তাঁর তো কুলগুরুর কাছে দীক্ষা পূর্বেই হয়েছিল। বাবার নিকট যখন তিনি দীক্ষা নেন, তখন বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি মন্ত্র পেয়েছ?' ভদ্রলোক সংকোচবশতঃ উত্তর দিতে দ্বিধা করলে বাবা বলেন, 'এই মন্ত্র তো?' বাবা ঠিক মন্ত্রটিই বলেন, তারপর বলেন, 'এটি তোমার অরিমন্ত্র, তুমি বেশী জপ করনি, তাই রক্ষা, নচেৎ ঘোরতর অকল্যাণ হত।'

আচার্য গোপীনাথ অক্ষয়বাবুকে তখন মন্ত্রের রহস্য সম্বন্ধে আরো বললেন, সদ্‌গুরু নিজ সাধনবলে দীক্ষাপ্রার্থীর পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে এ জন্মের উপযোগী মন্ত্রদান করেন। দেবতার ধ্যানটা বেশী কিছু নয়, উপযুক্ত মন্ত্র উপযুক্তভাবে সাধন করলে দেবতা স্বতঃ দর্শন দেন। মন্ত্রটি একটা বাইরের আবরণ মাত্র, ঐ আবরণের অন্তরালে থাকে শক্তি। সদ্‌গুরু ঐ শক্তির চৈতন্য সম্পাদন করে উপযুক্ত আবরণে আবৃত করে শিষ্যকে দান করেন। ঐরূপ শক্তি সমন্বিত মন্ত্রই সাধককে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর করে।

অক্ষয়বাবুর মনে তখনও মন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে নি, তাই তিনি ভাবলেন কুলমন্ত্র ছাড়াও কি অন্য মন্ত্রও পারে?

গোপীনাথ বললেন, 'মন্ত্রের কথা কি? সদ্‌গুরু প্রদত্ত যে কোন শব্দই পারে। বর্ণগুলো তো কিছুই নয়, ভেতরে যে চৈতন্যময় বস্তু থাকে তা-ই

* যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, পৃঃ ৩৭-৩৮।

হল মন্ত্র।' মন্ত্রের অনুকূল প্রতিকূলতার প্রসঙ্গে বললেন—'ভগবানকে মিত্র-ভাবে শত্রুভাবে দুভাবেই ভজন করা যায়, এবং দুভাবেই তাঁকে পাওয়াও যায়। সাধারণ লোক তো কেবল ভগবানকেই চায় না, ঐহিক কল্যাণও চায়, ভুক্তি ও মুক্তি দুই-ই চায়। অরিমন্ত্র ঐহিক কল্যাণের অনুকূল নয়, বিরোধী। যে সংসার বিরক্ত সন্ন্যাসী, তার পক্ষে মিত্রমন্ত্র আর অরিমন্ত্র নেই, সব সমান। অরিমন্ত্র আশু সিদ্ধিদায়কও হতে পারে। গৃহীর পক্ষে অরি-মন্ত্র ঐহিক কল্যাণের অনুকূল নয়। শক্তিশালী গুরুকে তো সবই বিচার করতে হয়।'

আচার্য গোপীনাথ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কতবার কতভাবে বিপদমুক্ত হয়েছেন তার নানা প্রসঙ্গ শ্রীদত্তগুপ্ত মহাশয় নিজ গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে বাবাজীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। একবার পূজার ছুটিতে তিনি সস্ত্রীক কাশী যান এবং একদিন তিনি আচার্য-দেবের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাসায় যান। কথায় কথায় যোগ ও যোগ-বিভূতির প্রসঙ্গ উঠলে ডঃ দাশগুপ্ত বলেন—বিভূতির ব্যাপার সব বুঝা যায় না।

একথা শুনে আচার্যদেব বিভূতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের যে বিশ্বাস ও বিচার ডঃ দাশগুপ্তকে বোঝাতে লাগলেন। সব শুনে ডঃ দাশগুপ্ত বলেন—আপনি বিষয়টি যে নতুন দৃষ্টিতে দেখছেন তাতে সংশয় কাটে বৈ কি, কিন্তু এরূপ বিভূতিসম্পন্ন যোগী কোথাও আছে কি?

তখন আচার্য গোপীনাথ বললেন, আছে বৈ কি। এই কাশীতেই আমার গুরুদেব আছেন। দেখতে চান, চলুন একদিন আমার সঙ্গে।

তারপর দিন স্থির হল, তাঁরা উপস্থিতও হলেন আশ্রমে স্বামীজীর সমক্ষে। আচার্যদেব তাঁর সঙ্গী দাশগুপ্তের বিশ্বত্তার প্রশংসা করে বললেন —ইনি যোগশাস্ত্রের বইও লিখেছেন।

কিন্তু সেদিন কোন বিভূতি দর্শন তাঁর ভাগ্যে ঘটল না। দু-একদিন পর ডঃ দাশগুপ্তের শিশুকন্যাকে একটি খালি মশলার কৌটোয় সন্দেশ তৈরী করে দিয়েছিলেন।

আচার্যদেব ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত গুরু সান্নিধ্যে নানা-ভাবে থেকেছেন। কাশীর হনুমান ঘাট আশ্রম থেকে কাশীর মলদাহিয়া পল্লীতে স্থিত বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনা, শ্রীশ্রীগুরুদেবের মর্মর মূর্তি স্থাপনা, নবমুণ্ডী মহাসন স্থাপনা প্রভৃতি কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে আশ্রমের পরিচালনা কার্যও তাঁর অধ্যক্ষতায় সম্পন্ন হত। গুরুদেবের নানা বিভূতি প্রদর্শনও তাঁর সমক্ষে কতবার কতভাবে সম্পন্ন হতে দেখেছেন, প্রশ্ন করেছেন ও রহস্য কোথায় তার মূল অন্বেষণ করেছেন। তাঁর যে কি অসীম শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি

ছিল তার উদাহরণ রূপে আমরা তাঁর রচিত একটি অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

এ কোনো লৌকিক ব্যবহারের শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, এ হল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

'এই ক্ষুদ্র আধারটিকে, কি জানি কেন, তিনি নিজ বলে নিজের নিকট টানিয়া নিয়াছিলেন এবং পরে আশ্রিত নিজজনরূপেই তাঁহার চরণে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার কি আন্তরিক সম্বন্ধ, তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি নিজেই একদিন আভাসরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন—'মধু ও মিষ্টতা যেরূপ জড়িত সেইরূপ তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ নাই। কার্য করিলে সব বুঝিতে পারিবে।' (১৩২৯ সালের ১৪ বৈশাখ লিখিত পত্রের অংশ) তাই একমাত্র ভরসা—আমি ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারই আশ্রিত এবং তাঁহারই স্বাংশ। তিনি আমাকে নিজের সহিত অভিন্ন করিয়া নিলেও আমি তাঁহারই আশ্রিত ইহাও সত্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'বালক প্রথমেও বালক, পরেও বালক, সমান। মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব।' (ঐ পত্রাংশ ১৩৩৯ সাল)

মহাজনের প্রদর্শিত প্রণালীতে আমারও আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যখন তাঁহার মহাকৃপায় তাঁহাতে আমাতে সর্বপ্রকার ভেদ কাটিয়া যাইবে তখন যেন আমি বলিতে পারি—'আমি তুমি হইয়াও নিতাই তোমার।'

তিনি দৈহিক লীলার সময়েও বস্তুতঃ আমার নিকট কি ছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি একাধারে আমার মাতা পিতা বন্ধু ছিলেন, গুরুদেব বন্ধু ও সখা ছিলেন, এক কথায় আমার সর্বস্ব ছিলেন; কারণ তিনিই আমার আত্মা। আমি সর্বভাবেই তাঁহার সহিত জড়িত, আবার ভাবরাজ্যের উর্ধ্বে পূর্ণ অহংরূপে আমি তিনি এক—তিনিই আমি, আমিই তিনি। তিনি ত আমাকে পৃথক্ ফেলিয়া রাখিবার জন্য আকর্ষণ করেন নাই।'*

গুরুর মহিমময় স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যে সব নিবন্ধ রচনা করেছেন তাতে বলেছেন যে গুরু স্বয়ং পরমেশ্বরের করুণাঘন মূর্তি। এই গুরুই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এবং তিনি বিশ্বের বাহিরে শব্দব্রহ্মরূপে এবং শব্দব্রহ্মকে অতিক্রম করে পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে নিত্য বিরাজমান।

এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল, শুধু তত্ত্বদৃষ্টিতে নয়, বাস্তবিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হৃদয়ে ধারণ করে তিনি শ্রীগুরুর সঙ্গ করেছেন সুদীর্ঘকাল। তারপর তাঁর বিগ্রহ তিরোহিত হলে হৃদয়ে তাঁকে ধারণ করে তাঁতে ন্যস্ত কর্মভার অবিচল নিষ্ঠায় প্রতিপালন করেছেন। মনে সংশয় ওঠেনি, শ্রদ্ধায় শিথিলতা আসেনি। গুরুচরণে এরূপ শ্রদ্ধা খুব কমই দেখা যায়।

* বিশুদ্ধবাক্যামৃত ভূমিকা।

সাহিত্য চিন্তা

আচার্যদেবের বিভিন্ন রচনার কথা আমরা পূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, কিন্তু সে সব থেকে কোনো কোনো অংশে পৃথক বিভিন্ন রচনার কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তাঁর সমগ্র রচনার সূচী প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই, কিন্তু তাঁর রচনায় যেগুলো অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন তার প্রকাশকাল এবং কিভাবে সে সব প্রকাশিত হয় আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে তাই নিয়ে।

আচার্যদেবের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'সুন্দর' নামে একটি কবিতা—এর প্রকাশকাল ১৯০৬। এটি প্রথম রচনা, বালক বয়সে রচিত। ঐ সময় আরো একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, তার নাম 'সেখানে'। এটিরও প্রকাশকাল ১৯০৬। তাঁর অন্য অন্য কবিতা লেখার প্রসঙ্গ আমরা আগে করেছি। সে সব কবিতা কোথাও প্রকাশিত হয় নি। ১৯১০ সালে কবি ব্রাউনিংগ সম্বন্ধে আলোচনাত্মক প্রবন্ধ লেখেন প্রবাসীর দুটি সংখ্যায়।

কাশীতে অবস্থান কাল আরম্ভ হয় ১৯১০ সাল থেকে, তারপর রুচির পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ক্রমশঃ জীবনে জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে ও দৃষ্টিতে ব্যাপকতা আসে। তাঁর ব্যাপক দৃষ্টির সম্মুখে এক বিস্তৃত জানার জগৎ উম্মুক্ত হয়, ফলে তাঁর রচনা কাব্য আলোচনার সীমিত ভূমি থেকে জ্ঞানের ও মননের ব্যাপকতর ভূমিতে আরূঢ় হয়।

আচার্যদেব ১৯২২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সময়ে সরস্বতী ভবন জার্নালে তাঁর বহু মূল্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধসমূহ রচনা করেন। তাঁর রচিত নিবন্ধসমূহের গ্রন্থসূচী, যা অল্প কিছুদিন হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে, পড়লে জানা যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে অন্যের রচিত গ্রন্থের ভূমিকা রূপে অথবা প্রাক্ কথন রূপে বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন, আবার সরস্বতী ভবন স্টাডিজ নামে প্রকাশিত গ্রন্থের পুরোভাগে নিজ অমূল্য ভূমিকাও সংযোজিত করেছেন। আমরা প্রসঙ্গতঃ তাঁর রচিত দু-একটি ভূমিকার বক্তব্য এই গ্রন্থে অন্যত্র দিয়েছি এবং আরও দু-একটির কথা এখানে উপস্থিত করছি। আমরা তাঁর গ্রন্থাগারিক জীবনের বিস্তীর্ণ কার্য-ক্ষেত্রের একটু পরিচয় পূর্বে দিয়েছি। এই কালে অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত আচার্য গোপীনাথ সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিক রূপে যে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে নিরন্তর নিরলস কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন তার প্রধান ফসল সরস্বতী ভবনের জার্নালে পরবর্তীকালে স্থান পেয়েছে। তিনি ঐ

কালেই প্রিন্সেস অব ওয়েলস্‌ টেক্সট্‌স-এর প্রকাশনায় ব্যস্ত থাকেন এবং ঐ সব গ্রন্থে বিদগ্ধতাপূর্ণ ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করে নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। আমরা পূর্বে দুটি ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। আরো দুটি গ্রন্থের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ দুটি গ্রন্থের একটি যোগিনীহৃদয় এবং অন্যটি ত্রিপুরা রহস্য (জ্ঞান খণ্ড)। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই দুটি ভূমিকার স্থান অতুলনীয় এবং ভারতীয় সাধন জগতের গোপন রহস্য এই অনবদ্য রচনায় উজ্জ্বল আলোকে প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহ নেই।

ঐ দুটি ভূমিকা ভারতীয় শাক্তসাধনার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে 'শাক্ত দার্শনিক সাহিত্যে ত্রিপুরা রহস্য জ্ঞান খণ্ডের মহত্ত্ব নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। যদিও গ্রন্থটি শাক্তক্রমের একটি বিশেষ ধারা অর্থাৎ ত্রিপুরাসুন্দরী বা ললিতার সাধনার দিকই নির্দেশ করে, তাহলেও এর দর্শন বিশেষ কোনো সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী নয়—একথা তাত্ত্বিক বিচারে এবং সাধনক্রমের উপস্থাপনে উভয়ত্রই সত্য।

মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শন সংগ্রহে শাক্তদর্শনের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি এ যেমন সত্য তেমনি বর্তমান যুগেও শাক্তদৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নি। এর কারণ আর কিছু নয়, আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে পরম্পরাগত ধারণার অভাব ততটা নয় যতটা নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই শাস্ত্রের গ্রন্থাদির অবস্থান, যার ফলে এই শাস্ত্রের বিধিবৎ অধ্যয়ন সম্ভব হতে পারে নি।'

তিনি বলেছেন, এই দর্শন অনুসারে পরমতত্ত্ব একদিকে বিশ্বাতীত অন্য-দিকে বিশ্বময়, ইহা স্পন্দ ও অস্পন্দের অতীত হয়েও উভয়কেই সমভাবে স্বীকার করে এক অদ্বিতীয় স্বরূপে অবস্থিত। এই যে পরমতত্ত্ব তাকে যদি এক বলা হয় তবে তা যেন যথার্থ বলা হল না। এখানে ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়তা এ দুটি বিরোধী তত্ত্বের পূর্ণ সমাধান বর্তমান। তাই শৈবগণ এই স্বরূপে যে নিষ্ক্রিয়ত্ব বর্তমান তাকে লক্ষ্য করে শিব রূপে অঙ্গীকার করেও তার ক্রিয়াময়তার গৌণরূপ স্বীকার করে। কিন্তু শাক্তগণ নিষ্ক্রিয় পটভূমিতে শক্তির ক্রিয়াশীলতার দিক্‌টিকেই অধিক মহত্ত্ব দেয়। উভয়েই পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিতা স্বীকার করেন।

ত্রিপুরা রহস্য শাক্তদৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে বলে যে শক্তি পরমপ্রকাশ-রূপ পরাশিবকে নিজ স্বরূপ থেকে অভিন্ন মনে করেন, অন্য দিকে শৈবগণ শিবকে মহাপ্রকাশ রূপে গ্রহণ করে এবং পরাশক্তিকে তার অঙ্গরূপ বলে মনে করে। সোমানন্দ তাঁর পরাত্রিংশিকা বিবৃতিতে শাক্তমত এবং শিবদৃষ্টিতে শৈবমত বিধৃত করেছেন।

ত্রিপুরা রহস্য (জ্ঞান খণ্ড) আচার্য গোপীনাথের সরস্বতী ভবন গ্রন্থা-গারিক রূপে অবস্থানকালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর এর দ্বিতীয়বার প্রকাশনকাল ১৯৬৪ সাল। প্রথম প্রকাশকালে একটি প্রাক্‌কথন (২ পৃষ্ঠা)

এবং একটি দীর্ঘ ভূমিকা গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে। ভূমিকার ভাষা ইংরেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০। এতে ত্রিপুরা দর্শনের বিশেষত্ব আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার প্রকাশন কালেও একটি ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে দেখতে পাই।

ত্রিপুরা রহস্যে শাক্তদৃষ্টিতে ত্রিপুরা সাধনার রহস্য কথা আলোচিত হয়েছে। এই ত্রিপুরা আবার সুন্দরী, ললিতা, ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা, কামেশ্বরী প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে উল্লিখিত হয়ে থাকেন। আচার্যদেব বলেন যে, দেবী ত্রিপুরসুন্দরী চৈতন্যময়ী ও পরম স্বাতন্ত্র্যময়ী। তিনি স্বরূপে দুই ভাবে ক্রিয়াশীলা—একটি সৃষ্টিকালে বিশ্বরূপে প্রকাশমান, আবার লয়াবস্থায় সমগ্র বিশ্ব তাঁতেই সুপ্ত। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় স্থিতি নিজের মধ্যে নিজে ক্রিয়াশীল। এটি তাঁর স্বপ্রকাশ স্থিতি।

তিনি পরম স্বাতন্ত্র্যময়ী পরাশক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে শাক্ত সিদ্ধান্তের কোথায় পার্থক্য তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশ্বের আবির্ভাব প্রসঙ্গে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। এই স্তরগুলো শুদ্ধ-চৈতন্যে অবিদ্যার ক্রিয়াশীলতায় আবির্ভূত হয়। কিভাবে শৈব-আগমে স্বীকৃত তত্ত্বসমূহের প্রসার ঘটে তারও আলোচনা শেষে ভূমিকা সমাপ্ত করেছেন।

আচার্যদেব ১৯২৩ সালে যোগিনী হৃদয় দীপিকা নামক গ্রন্থ সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালার সপ্তম গ্রন্থরূপে সরস্বতী ভবন থেকে প্রকাশিত করেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের পর আরও কয়েকবার গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। প্রথমবারে যোগিনী হৃদয়ের দীপিকা নামক টীকা (অমৃতানন্দ নাথ রচিত) যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয়বার গ্রন্থের প্রকাশকালে ভাস্কর রায় রচিত সেতুবন্ধ টীকাটিও সংযোজিত হয়। আচার্যদেব দুটি টীকা সম্বন্ধে নিজ বক্তব্যে বলেছেন যে ভাস্কর কোন কোন স্থানে দীপিকা-কারের সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছেন এবং যেখানে সহমত হতে পারেন নি সেখানে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে অশ্রদ্ধা করেছেন। তা সত্ত্বেও আচার্যদেবের মনে হয় যে রহস্য সাধনার যে ক্রম দীপিকাকার নিজ টীকায় সাদরে গ্রহণ করেছেন তা পরম্পরাগত ক্রম এবং সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ উপায় রূপে গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

আচার্যদেব তাঁর দীর্ঘ ভূমিকায় (প্রায় ১৪ পৃষ্ঠা) বলেছেন যে এই দুটি টীকায় দেবী ত্রিপুরসুন্দরীর যে দুটি উপাসনাক্রম ও সম্প্রদায় বর্তমান তাদের মধ্যে একটি 'কাদি' সম্প্রদায়ের ক্রম এবং অন্যটি 'হাদি' সম্প্রদায়ের। অমৃতানন্দ হাদি সম্প্রদায়ের ও ভাস্কর রায় কাদি সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী। এ দুটি সম্প্রদায়েও আবার দুটি পৃথক্ বিভাগ আছেঃ একটি শাক্ত ক্রম এবং অন্যটি শাম্ভব ক্রম।

আমরা সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে বলে এ বিষয়ে বিস্তারপূর্বক আলোচনা থেকে বিরত হচ্ছি। এই গ্রন্থে যে উপাসনা ক্রম প্রদর্শিত হয়েছে

তাতে তিনটি অংশ বর্তমান। একটি চক্র সংকেত, দ্বিতীয়টি মন্ত্র সংকেত ও তৃতীয়টি পূজা সংকেত নামে পরিচিত। চক্র সংকেতে শ্রীযন্ত্রের রহস্য এবং সৃষ্টি ও সংহারের সঙ্গে তার সম্পর্ক, মন্ত্র সংকেতে মন্ত্রের ভাবার্থ, সম্প্রদায়ার্থ, নিগর্ভার্থ, কৌলিকার্থ, সর্বরহস্যার্থ ও মহাতত্ত্বার্থ বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে পূজা সংকেতে দেবীর পরা পূজা, পরা পরা পূজা ও অপরা পূজার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তান্ত্রিক সাধনার গভীর রহস্যে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ এই গ্রন্থটি পরম উপাদেয়। আমার মনে হয় আচার্যদেব তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে যা কিছু রচনা করেছেন তার মূলস্রোত এই যোগিনীহৃদয়, এবং কামকলাবিলাস, নিত্যাষোড়শিকার্ণব, ললিতাসহস্রনাম (ভাস্কর ভাষ্য) প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ।

আচার্যদেব তাঁর গুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহাশয়ের একখানি জীবন চরিত রচনায় প্রয়াসী হন। কতদিন তাঁর এই প্রয়াস চলছিল তা বলা সম্ভব না হলেও বহুদিন ধরে গ্রন্থের উপাদান ও নানা তথ্য সংগ্রহ চলতে থাকে একথা আমরা কল্পনা করতে পারি। পরে ১৯২৭ সালে 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' এই নামে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এতে দশপৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় তিনি গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য সবিস্তারে বর্ণনা করেন। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে স্বামীজীর চরিত কথা (১—১৫৫ পৃঃ) এবং দ্বিতীয় ভাগে তত্ত্বকথা (পৃঃ ১—২৩২) বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির দুটি ভাগে দুটি অনুপম স্তোত্র বর্তমান। প্রথমটি 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্তোত্রম্' এবং দ্বিতীয়টি 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ নবরত্নমালা' নামে পরিচিত। এ দুটিই আচার্যদেবের রচিত।

আমরা তাঁর দীর্ঘ ভূমিকার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করছি। শ্রীগুরু সম্বন্ধে তাঁর যে অসামান্য শ্রদ্ধা ও প্রপত্তি ছিল এই ভূমিকা পাঠে তা জানা যায়। আর জীবন চরিত রচনা করা যে কত কঠিন সে বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য কি ছিল তারও উল্লেখ করছি। এই উল্লেখের প্রয়োজনও আছে, কেননা বর্তমান লেখকও এক লোকোত্তর মহাপুরুষের চরিত কথা রচনায় ব্যাপৃত, তার পক্ষেও তার শ্রীগুরুর জীবনচরিত রচনা কতটা যুক্তিযুক্ত তারও একটা উত্তর এতেই মেলে। যাঁরা ভবিষ্যতে জীবন চরিত রচনা করবেন তাঁদের কাছে আচার্যদেবের সংযত ও সুসম ভূমিকা একটি অমূল্য উপদেশ—এরূপ আমার ধারণা।

'জীবন চরিত রচনা বড় কঠিন জিনিস; কঠিন কেন, বোধ হয় এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক জনের জীবন আর এক জনে ঠিক ঠিক বুঝিয়া লিখিতে পারে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। নিজের জীবন নিজেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না, অন্যে তাহার কতটুকু বুঝিবে! যে যতই জ্ঞানী হয় ততই তাহার নিজের জীবনও তাহার নিকট রহস্যময় মনে হইতে থাকে। যে বিরাট শক্তি জগতের অন্তরে বাহিরে, অণু ও মহতে খেলা করিতেছে। যাহার খেলা আমরা শুধু অহঙ্কার প্রযুক্ত মোহের

আবরণ বশতঃ দেখিতে পাই না, তাহা যে প্রতি জীবনে খেলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। অহঙ্কার-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট শক্তির ক্রীড়া যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনাতেও সে মহিমার আভাস দেখিতে পায়, মহাশক্তির খেলা দেখিয়া সে ধন্য হইয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

তখন তাহার দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি জীবন একটি দুর্ভেদ্য রহস্যে আচ্ছন্ন মনে হয়। তাহার কারণানুসন্ধিৎসা একটি অনন্তশক্তির স্বাভাবিক স্ফূর্তির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবনের চরমতত্ত্ব যেখানে রহস্যময়, সেখানে জীবন-চরিত রচনার ব্যর্থ প্রয়াস উপহাসাস্পদ। আর যদি সর্বব্যাপী মহাশক্তির খেলা দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে ত জীবনের প্রতি ভাব ও প্রতি ঘটনার মূলে নিজের অহঙ্কারকেই স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু তাহা যে একেবারেই ভুল, সে কথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। প্রতি মুহূর্তে আমাদের পরিচ্ছিন্ন শক্তির অন্তরালে থাকিয়া একটি অদৃষ্ট মহতী শক্তি কার্য করিতেছে। কখনও তাহার বলে ক্ষুদ্রশক্তি পুষ্ট হইয়া মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছে, কখনও বা তাহার প্রতিবন্ধকতায় ক্ষুদ্রশক্তি আপনার অনুরূপ ক্ষুদ্র-কার্য সাধনেও সমর্থ হইতেছে না। সে শক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব চিন্তাশীল মনুষ্যমাত্রই চিরকাল অনুভব করিয়া আসিতেছে।

সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধেই যখন প্রকৃত জীবনী নির্মাণ এত কঠিন, তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে ত তাহা অসম্ভবই বলিতে হইবে।

যতদিন পর্যন্ত অহঙ্কার দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে ততদিন পর্যন্ত জীবন-চরিত রচনার চেষ্টা হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু তাহার পরে আর হয় না। তাই মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত নাই। যাহা আছে, তাহা কতকগুলি প্রাণহীন স্থূল ঘটনার সন্নিবেশ মাত্র। তাহা বৃত্তান্ত হইতে পারে, কিন্তু জীবন নহে।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

ভবভূতির এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। লোকোত্তর পুরুষের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল। উহাতে একই সময়ে বিরুদ্ধ-

গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান যেমন যাবতীয় বিরোধের একাধার, অথচ তিনি গুণাতীত ও নির্লিপ্ত, তাঁহার ভক্তগণও সেই প্রকার। কে তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনায় সাহসী হইবে?'

তাঁর অক্লান্ত লেখনী বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃতে সমভাবে চলত। তাঁর সংস্কৃত রচনার সংখ্যাও কম নয়। এগুলো সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে একখানি শত পৃষ্ঠার বই হতে পারে।

কিন্তু আমার মনে হয় যে আচার্যদেব গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করে খ্যাতি লাভ করবেন এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর কোনো কালেই ছিল না। তিনি বিস্তৃত জ্ঞান সাগর মন্থন করে যে অমৃত আহরণ করেছিলেন তার অতি অল্প অংশই নানা নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অন্তর্জগতের মননভূমিতে বিচরণ করতেই বেশী ভালবাসতেন। কোনোভাবে তাঁকে লেখায় প্রবৃত্ত করাতে পারলে তা হত অসাধারণ রচনা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলায় নিবন্ধ রচনা করে কোনো প্রকাশকের দ্বারস্থ হতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি, বালক বয়সের দু-একটি রচনা ছাড়া। কাশী হতে প্রকাশিত অলকা, প্রবাসজ্যোতি, বঙ্গসাহিত্য ও পরিশেষে অথচ সর্বাগ্রণী উত্তরা প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক যদি আচার্যদেবের নিবন্ধ প্রকাশে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে না আসতেন তাহলে হয়ত আমরা তাঁর রচিত বাংলা নিবন্ধ পেতাম না ও তার সুমিষ্ট স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হতাম। কাশীর উত্তরা পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর কাছে নিয়মিত গিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহ করে আনতেন। প্রায় তিরিশ বছর (১৯২৫-১৯৫৫) ধরে 'উত্তরার' বিভিন্ন সংখ্যায় আচার্যদেব প্রায় তিরিশটি নিবন্ধ লেখেন। এরপর নাম করতে হয় আনন্দ-বার্তা নামক আনন্দময়ী আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্রিকার কথা। বহুদিন ধরে এই পত্রিকায় তিনি অনেক নিবন্ধ লেখেন এবং তাও লিখতে আরম্ভ করেন ব্রহ্ম-চারী বিরজানন্দজীর প্রেরণায়। এতে লেখা আরম্ভ হয় ১৯৫৩ থেকে এবং শেষ লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ।

আর একজন মহাপুরুষের অনুরোধে তিনি লিখতে থাকেন 'হিমাদ্রি' সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় তাঁর সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ এবং অন্য নানা রচনা। এ সম্ভব হয় যোগিরাজ কালীপদ গুহরায়ের প্রেরণায়।

এ ছাড়া নানা ধার্মিক সংস্থার পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা দেখা যায়। দেখা যায় যে বাংলা নিবন্ধের অধিকাংশই মৌলিক, অনুবাদ নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর সম্পাদিত বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম থেকে প্রকাশিত বিশুদ্ধবাণীর নাম করতে হয়। এই অমূল্য সাময়িক পত্রিকায় তিনি প্রায় কুড়িটি দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করেন। এগুলো রচিত হয় স্বতঃপ্রেরণায়, অন্যের অনুরোধে নয়।

এই সব নিবন্ধের নাম পাঠ করলেই বোঝা যায় যে তিনি সাহিত্যিক বিষয়ের আলোচনা পরিহার করে ধীরে আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর 'রস ও সৌন্দর্য' যেমন নন্দন তত্ত্বের বিবেচনায় সমৃদ্ধ একটি

আদর্শ নিবন্ধ আবার তারই পাশাপাশি নিবন্ধ 'কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব' পাঠককে কোন্ রহস্যলোকে নিয়ে যায়। প্রথমটির উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'এক সৌন্দর্যই যখন নানা সৌন্দর্য এবং সেই মৌলিক সৌন্দর্যই যখন জগতের ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্যরূপে প্রকাশমান, তখন জগৎ যে সৌন্দর্যময় তাহা বুঝা যায়। সকল বস্তুই সুন্দর, সবই রসময়, কিন্তু চিত্তে মল ও চাঞ্চল্য আছে বলিয়া দেখিবার সময় তাহা অনুভূত হয় না। রস তখন সুখ-দুঃখরূপে এবং সৌন্দর্য সুন্দর-কুৎসিতরূপে বিভক্ত হইয়া যায়।...পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রেমের সহিত স্বাভাবিক মিলনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিতই স্বাভাবিক মিলন ফুটিয়া উঠে, যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কেহই পর থাকে না। কিছুই কুৎসিত থাকে না। মানুষের জীবনে সৌন্দর্যসাধনার ইহাই যথার্থ পরিণাম।'

আবার দ্বিতীয়টির বর্ণনায় কুণ্ডলিনীর প্রবোধন কিভাবে সম্পন্ন হয় তার বর্ণনার শেষে তিনি বলেছেন কিভাবে খণ্ডসত্ত্ব অখণ্ডসত্ত্বের ধারায় প্রবেশ করে 'আদিসূর্যের একটি রশ্মিতে সংযোগ লাভ করে এবং ক্রমশঃ সেই রশ্মি অবলম্বনে কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতে থাকে। খণ্ডসত্ত্বে ভাবের বিকাশ হইতেই সহস্রদল কমলের নিত্য বিভূতি প্রত্যক্ষ অনুভবে আসে। ভাব ধীরে ধীরে গাঢ়তর হইয়া বিধিকোটি অতিক্রম করে এবং রাগরূপে পরিণত হয়। রাগেরও ক্রমবিকাশ আছে। দাস্যভাব পর্যন্ত ঐশ্বর্যাবস্থার অনুভব হয়, পরে দাস্যভাবের অতীত হইলেই মাধুর্যাবস্থার বিকাশ হইয়া থাকে। মাধুর্যাবস্থা সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তরূপে স্থূলতঃ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কান্তভাবেই মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা। ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণতি লাভ করে।'

উদ্ধৃত নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এটি হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আচার্যদেব আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু আর বলা হয়ে ওঠেনি।

সরস্বতী ভবনে গ্রন্থাগারিক রূপে এবং অধ্যক্ষরূপে তাঁর কার্যকালে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকাও লিখেছেন। তাতে বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল রচিত যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গীতার ব্যাখ্যা অবলম্বনে তাঁর নিজকৃত ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন আচার্যদেব। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। আরও পরে তিনি বাংলায় বহু ভূমিকা লিখেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ রচিত জপসূত্রের (ভাগ ৩) ভূমিকা, শ্রীশ্রীমাআনন্দময়ী (১ম ভাগ), গুরুপ্রিয়া দেবী রচিত গ্রন্থের ভূমিকা, উক্ত লেখিকার অখণ্ড মহাযজ্ঞের ভূমিকা, সীতারাম দাস ওঁকারনাথ রচিত নাদলীলামৃতের ভূমিকা, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ রচিত বেদান্ত দর্শনের ভূমিকা, রাজবালা দেবী রচিত শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা গ্রন্থের ভূমিকা, সুরেন্দ্রনাথ সেন রচিত শ্রীগুরুতত্ত্ব গ্রন্থের ভূমিকা।

এ ছাড়া বাংলায় রচিত আরও ভূমিকা বর্তমান। কিন্তু এই ভূমিকা-সমূহে যেভাবে বিষয়বস্তুর বিবেচনা করা হয়েছে তা পড়লে মনে হয় সমগ্র গ্রন্থই এক বিস্ময়কর দিব্য উদ্ভাসে উদ্ভাসিত। এদের মধ্যে কিছু কিছু অন্যত্র তাঁর রচিত গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু বহু ভূমিকা আজও মূল-গ্রন্থেই বর্তমান।

হিন্দী নিবন্ধের সূত্রপাত হয় গোরখপুর কল্যাণ পত্রিকার সম্পাদক হনুমানদাসজী পোদ্দারের প্রেরণায়। উক্ত পত্রিকার বিশেষাঙ্কে যেরূপ শক্তি-অঙ্ক, শিব-অঙ্ক, যোগ-অঙ্ক, ভক্তি-অঙ্ক, সাধনা-অঙ্ক প্রভৃতিতে আচার্যদেব বহু নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধগুলি কিছু মৌলিক ও কিছু বাংলা থেকে ভাষান্তরিত। এতে যে সব মৌলিক রচনা স্থান পেয়েছে তা এ পর্যন্ত বাংলায় প্রকাশিত হয়নি বলে হিন্দী ভাষায় অজ্ঞ পাঠক এর স্বাদ থেকে এখনও বঞ্চিত।

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের ভূমিকা যেমন তিনি লিখেছেন তেমনি হিন্দীতে রচিত তাঁর ভূমিকার সংখ্যাও কম নয়। এরূপ ভূমিকার সংখ্যা প্রায় ২৮টি। এর মধ্যে মাত্র দুটি (১) ভোলে বাবা রচিত বেদান্ত দর্শনের সুদীর্ঘ ভূমিকা (২) আচার্য নরেন্দ্রদেব রচিত বৌদ্ধধর্মদর্শন গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা আচার্যদেব রচিত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আমরা বাংলায় এই দুই রচনা দেখতে পাই ভারতীয় সাধনার ধারা গ্রন্থে এবং অন্যটি পাই তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থের ২য় ভাগে। দুটোই অমূল্য রচনা।

বাংলায় তাঁর রচিত আনন্দবার্তায় প্রথম পর্যায়ে ১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটি, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় এগারটি এবং শ্রীশ্রীমাআনন্দ-ময়ীর বাণীর ব্যাখ্যা পর্যায়ে (১ম) ১৪০টি বিশেষ বিষয়ের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ ব্যাখ্যা ২০টি প্রকাশিত হয়। সৌভাগ্যবশতঃ প্রথম পর্যায়ের ব্যাখ্যাগুলো অমরবাণী গ্রন্থে বাংলা ও হিন্দীতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাখ্যা ও বাণী এখনও পত্রিকাতেই উপলব্ধ। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা নিবন্ধ অল্প দু-একটি ছাড়া আজও পত্রিকাতেই দৃষ্টিগোচর হয়।

তাঁর রচিত ইংরেজী নিবন্ধ এস, বি, জার্নাল-এ নিয়মিতভাবে এবং অন্যত্র নানা স্থানে অর্থাৎ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সরস্বতী ভবন জার্নালের হিস্ট্রি এণ্ড বিবলোগ্রাফি অব ন্যায়-বৈশেষিক লিটারেচার নামের নিবন্ধগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, এবং ঐ জার্নালেই প্রকাশিত রচনার কয়েকটি এবং অন্য স্থানে প্রকাশিত দুয়েকটি রচনা নিয়ে আসপেক্ট্স অব ইণ্ডিয়ান থট এই নামে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকাগুলো আজও বিভিন্ন গ্রন্থেই উপলব্ধ হয়।

আমরা আচার্যদেব রচিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করলাম কিন্তু তাঁর মৌলিক গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু না বললে

বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকে এজন্য তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থের কথা আগে বলছি। তিনি ১৯২৭ সালে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ নামে স্বীয় গুরুর জীবনকথা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে চরিত কথা অংশ তাঁর নিজের রচিত এবং এতে তাঁর একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা ও দুটি সংস্কৃতে রচিত স্তোত্র বর্তমান। ঐ গ্রন্থের তত্ত্বকথা ভাগে জিজ্ঞাসু ও বক্তার প্রশ্নোত্তররূপে তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে। এতে আবার স্তোত্ররূপে সংস্কৃতে রচিত নবরত্নমালা নামক স্তোত্র উপনিবন্ধ। লীলাকথার প্রারম্ভে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে যাতে যোগবিভূতির যথার্থতা নবীন আলোকে প্রদর্শিত হয়েছে। এই ভূমিকা পাঠে পাতঞ্জলসম্মত যোগবিভূতি এবং যোগের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আচার্যদেব কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ অখণ্ড মহাযোগ। প্রকাশকাল ১৩৫৫, গ্রন্থের আয়তন ১৭৭ পৃষ্ঠা। এতে অখণ্ড মহাযোগের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে।

এ দুটি গ্রন্থ প্রকাশের পর বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাঁর বিভিন্ন রচনা সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে প্রথম এগিয়ে আসেন বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ ১৯৬৩ সালে। তারপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ১৯৬৯ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হয়ে শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, (১৯৬৬) তারপর পশ্চান্তী প্রকাশনের পক্ষ থেকে শ্রীজগদীশ্বর পাল মহাশয়। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলায় ২১ খানি, ইংরেজীতে দুখানি, হিন্দীতে দশখানি গ্রন্থের প্রকাশন হয়। শ্রীকৃষ্ণসংঘ নামক সংস্থা প্রকাশিত করেন পূজা ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ নামক গ্রন্থ।

আচার্যদেব ভারতীয় সাধনার ধারা নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন, 'আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে প্রাচীন সাধকদিগের অধ্যাত্মচিন্তার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ইহাতে একদিকে যেমন পরম্পরাগত অর্থাৎ সম্প্রদায়গত চিন্তার প্রশ্ন আছে, তেমনি অপরদিকে ব্যক্তিগত চিন্তার বৈশিষ্ট্যও আছে। প্রথমে সম্প্রদায়গত ভাবধারার আলোচনাই যুক্তিসংগত মনে হইয়াছিল। এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিছু কিছু করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলাম।

অবশ্য সাধকদিগের ব্যক্তিগত অধ্যাত্মজীবনের ধারাও আমি আলোচনা করিতাম। ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী অথবা কর্মীর ভেদ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত সাধনপথে কে কি প্রকারে অগ্রসর হইত তাহার বিশেষ আলোচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ পরমতত্ত্বের দিকে যে ব্যক্তি যাত্রা করিয়াছে—সেই আমার লক্ষ্য, তা সে যে মার্গেই চলুক সে দিকে আমি ততটা দৃষ্টি দিতাম না।'

উল্লিখিত উদ্ধরণে আমরা তাঁর সাধুদর্শনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে

একটি স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারি। সে যা হোক কিভাবে তিনি কাশীর উত্তরা পত্রিকার সংগে যুক্ত হলেন আমরা সে প্রসংগে আসি। ১৩৩২ সালে কাশীতে উত্তরা পত্রিকার অভ্যুদয় ঘটে। সংগে সংগে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সনির্বন্ধ অনুরোধ আসিল যে প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ানুগত বৈষ্ণব সাধনা সম্বন্ধে প্রথমে তাঁহাকে কিছু লেখা দিতে হইবে, এবং উহা তিনি পত্রিকাতে প্রকাশিত করিবেন। তাঁহার এবং আমার উভয়েরই ইচ্ছা ছিল আপততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। আমি সম্মত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের মর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্যক প্রকারে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে প্রসিদ্ধ চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সহিত সাধারণ পরিচয় থাকা আবশ্যক। ইহা মনে করিয়া এই চারিটি সম্প্রদায়ের মত ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। সংগে সংগে উহা 'উত্তরা'তে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৩৩২ সালের আশ্বিন হইতে পর পর দশ সংখ্যায় এই লেখাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। এইগুলি বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ভূমিকা নামেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ভূমিকা এক প্রকার পূর্ণই হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা সংক্রান্ত মূলগ্রন্থ বিষয়ে পরে কিছু লিখিবার অবকাশ আর হইয়া উঠে নাই।'

এ তো গেল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার প্রকাশনের কথা। 'সহজযান ও সিদ্ধমার্গ' নামক নিবন্ধও ঐ উত্তরাতেই প্রকাশিত হয় (১৩৩৪-১৩৩৫ সালে)। 'শাঙ্কর বেদান্ত ও অদ্বৈত প্রস্থান' নামক নিবন্ধ প্রকাশনের বিষয়ে আচার্যদেব লিখেছেন, স্বর্গীয় স্বনামধন্য শেঠ গৌরীশংকরজী গোয়েংকার অনুরোধে ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্যের টীকা রত্নপ্রভার অনুবাদ প্রকাশকালে উহার ভূমিকারূপে ১৯৩৬ সালে কাশী অচ্যুত গ্রন্থমালাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ভারতীয় সাধনার ধারা' নামক বাংলা গ্রন্থের প্রকাশনের এই হল ইতিবৃত্ত। গ্রন্থের প্রকাশন কাল ১৯৬৫, এবং এর অবয়ব ২০০ পৃষ্ঠা।

একটি মৌলিকগ্রন্থ সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি কোথাও পূর্বে কোনো পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ডঃ শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগে যে গ্রন্থরত্নটি বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে প্রকাশিত হয় তার নাম 'তন্ত্র ও আগম সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন'। এটি একটি স্বল্পকায় গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি তন্ত্র ও আগম বিষয়ক বিশাল সাহিত্যের দিকে গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রচিত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আচার্যদেব লিখেছেন, 'তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শনরূপে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তত্ত্ব, সম্প্রদায় ও সাহিত্যের দিক হইতে দুই চারিটি কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে তত্ত্বাংশে শুধু শৈবাগমের দ্বৈত-দৃষ্টি মূলে সংক্ষেপে কিছু আলোচিত হইয়াছে। তত্ত্বালোচনার অন্তিমভাগে প্রসংগতঃ শাক্তাগম সম্বন্ধে দুই চারিটি

কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা বাদ দিলে ইহাতে শাক্তাগমের এবং অদ্বৈত-দৃষ্টির কোনো কথাই আলোচিত হয় নাই।

আর একটি দুটি গ্রন্থের প্রকাশন কিভাবে হয় প্রসঙ্গক্রমে আমরা তা এখানে উল্লেখ করছি। গ্রন্থ দুটির একটি 'পূজা' এবং অন্যটি 'শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ'। পূজা গ্রন্থটিতে আচার্যদেব রচিত একটি প্রাক্‌কথন এবং প্রকাশকের নিবেদন বর্তমান। মূল গ্রন্থের রচয়িতা স্বামী প্রেমানন্দজী এবং আচার্যদেব স্বয়ং। দুজনের লেখা মিলেমিশে আছে। এ সকল বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আচার্যদেবের ঐকামত্যের জনাই এরূপভাবে জিনিসগুলি দেওয়া আছে। আচার্যদেবের লেখাকে পৃথক করার জন্য (" ") উৎকলন চিহ্ন দেওয়া আছে।

'শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ' নামক আচার্যদেবের অনুপম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ আচার্যদেবের গৃহের নিকট লক্ষ্মীকুণ্ড নামক পল্লীতে একটি ভক্তগৃহে কিছু-কাল ছিলেন। সে সময় অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে তাঁর সঙ্গে আচার্যদেবের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি কখনো কখনো তাঁর নিকট যেতেন এবং স্বামীজীও তাঁর নিকট আসতেন। প্রসঙ্গতঃ একদিন কিছু সময়ের জন্য তাঁর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়। এর ফলে তাঁর মনে গভীর ও ব্যাপক জিজ্ঞাসার উদয় হয়, যার নিবৃত্তি একদিনের আলোচনাতে সম্ভবপর ছিল না। 'তিনি প্রস্তাব করেন যে আমার অসুবিধা না হইলে যথাসম্ভব প্রতিদিন তাঁহার নিত্য মননের জন্য কিছু কিছু শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ আমি যেন লিখাইয়া দিই। আমি সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করিবার পর তাঁহার নির্দেশ অনুসারে তাঁহার প্রিয় সেবক ও ভক্ত শ্রীমান্ সদানন্দ ব্রহ্মচারী আমার নিকট প্রত্যহ আমি মহানিশা ক্রিয়ায় উপবিষ্ট হইবার পূর্বে রাত্রি নয়টা বা দশটার সময় উপস্থিত হইত। আমি তাহাকে কিছু কিছু প্রসঙ্গ লিখাইয়া দিতাম।'

এই প্রসঙ্গ লেখা হয় ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৪৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত—যদিও এইগুলি প্রকাশনের জন্য লেখা হয়নি। স্বামীজী লিখিত প্রসঙ্গসমূহ তাঁর সাধনার নিত্যসাথীরূপে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। তাঁর তিরোধানের অনেক পর সদানন্দজী শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রকাশিত করার উদ্যোগী হন।

'পত্রাবলী' আচার্যদেব রচিত বিভিন্ন পত্রের সংগ্রহ। এতে বিভিন্ন সাধকের ও ভক্তের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৮২টি পত্র আছে। পত্র পাঠে আচার্যদেবের মননশীলতা, সাধনা ও যোগের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং তাঁর অনুভবের গাম্ভীর্য দৃষ্টিগোচর হয়। পত্রগুলো সাধন-পথের পথিকের পক্ষে একান্ত উপযোগী বিবেচনায় আচার্যদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীজগদীশ্বর পাল মহাশয় উদ্যোগী হয়ে তাঁর কয়জন বিশিষ্ট বন্ধুর সহযোগে পশ্যন্তী প্রকাশনী নামক সংস্থা থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকাশকাল ১৩৭৫।

আর একটি প্রকাশনসংস্থা আচার্যদেবের রচিত সাহিত্য বিষয়ক রচনার সংগ্রহ প্রকাশিত করে। বইটির নাম 'সাহিত্য চিন্তা', প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিসিং হাউস, কলিকাতা। প্রকাশকাল ১৯৬৬, আয়তন ১—১২৯, এতে 'রস ও সৌন্দর্য' এবং আরও কয়টি প্রবন্ধ বর্তমান।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, (১) তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত ১ম ভাগ, (২) ঐ দ্বিতীয় ভাগ এবং (৩) এসপেক্টস্ অব ইণ্ডিয়ান থট্। প্রথম দুটি বাংলা গ্রন্থে মোট ১৯টি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলোর অধিকাংশ মূল বাংলায় রচিত এবং বাংলায় লিখিত নিবন্ধের সংগ্রহ। এদের মধ্যে কিছু আমরা হিন্দী গ্রন্থেও দেখতে পাই। এসপেক্টস্ অব ইণ্ডিয়ান থট্-এ ১২টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, প্রকাশকাল ১৯৬৬। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

পশ্যন্তী প্রকাশনী পত্রাবলী ভিন্ন, স্বসংবেদন ২ ভাগে, মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ, বিজিজ্ঞাসা, অখণ্ডমহাযোগের পথে, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীঃ উপদেশ ও প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত করেন। মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়ে কল্যাণের পরলোক বিশেষাঙ্কে স্থান পেয়েছে।

পরবর্তী সময়ে আচার্যদেবের মুখে গৃহীত প্রবচন থেকে শ্রীজগদীশ্বর পাল মহাশয় যে দুর্লভ রত্ন বাঙ্গালী পাঠককে পশ্যন্তী প্রকাশনীর পক্ষ থেকে উপহার দিয়েছেন সে সব হল 'পরমার্থ প্রসঙ্গে'। তিন ভাগে প্রকাশিত এই গ্রন্থরত্ন আমাদের পরম আদরের সামগ্রী। এ থেকে আশা হয় আচার্য-দেবের প্রবচন ধারার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে।

এবার আমরা আচার্যদেব রচিত হিন্দী গ্রন্থের বিষয়ে কিছু বলব। ১৯৬৩ সালে বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সঞ্চালক ডঃ ভুবনেশ্বরনাথ মিশ্র মাধবজী আচার্যদেবের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত এবং বিভিন্ন পুস্তকে ভূমিকারূপে লিখিত রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশিত করতে উদ্যোগী হন। তাঁরই মুখ্য উদ্যোগে 'ভারতীয় সংস্কৃতি ঔর সাধনা' নামে দুই খণ্ডে পুস্তক প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থই বৃহৎ কলেবরের। প্রথমটির আয়তন ৬৪৯ পৃষ্ঠা, প্রবন্ধের সংখ্যা ৪০, দ্বিতীয়টির আয়তন ৩৫১ পৃষ্ঠা, প্রবন্ধ সংখ্যা ২১, এর প্রকাশকাল ১৯৬৪।

আচার্যদেব প্রথমটিতে একটি ছোট ভূমিকা লিখেছেন তা দেখে আমরা তাঁর সমন্বয়ী দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারি ভেবে এখানে তার অংশবিশেষ উল্লেখ করছি।

'সাধনার দুইটি দিক্ আছে, একটি ক্রিয়ার দিক্ এবং অন্যটি ভাবের। এদের মধ্যে ভাব অন্তরঙ্গ এবং ক্রিয়া বহিরঙ্গ। অন্তর্নিহিত ভাবকে হৃদয়-ঙ্গম না করিতে পারিলে ক্রিয়া ব্যর্থ মনে হয়। ঠিক সেই প্রকার ক্রিয়া ত্যাগ করিলে ভাবে প্রবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। দুই-ই সত্য এবং দুই-ই আবশ্যক। সেইজন্য প্রত্যেক সাধনার পৃষ্ঠভূমিতে তাহার সম্যক্ উপপাদনের জন্য তাহার

তত্ত্বদর্শন আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই দর্শন খণ্ড দৃষ্টিতে সম্যক্ দর্শন রূপে অভিহিত হইতে পারে না, কেননা অখণ্ড দৃষ্টির অভাবে খণ্ড অথবা অংশের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় না। মতের খণ্ডন-মণ্ডন কেবল বুদ্ধির নির্মলত্ব সম্পাদনের জন্য এবং প্রস্থানগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি সমন্বয়ী-দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহা হইলে সব মতই সত্য, দৃষ্টি ও অধিকারের ভেদে সবই গ্রহণযোগ্য। এই জন্য সর্বত্র সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা আবশক। এরূপটি না হইলে রহস্যের উদ্ঘাটন হইতে পারে না। যে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যের নিকট উপস্থিত না হয় তাহার নিকট সত্য নিজের স্বরূপে প্রকট করে না। ইহাই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব।'

উক্ত পরিষদ থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তান্ত্রিক বাঙ্ময় মে' শাক্ত দৃষ্টি।' এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, এটিও বিভিন্ন প্রবন্ধসমূহের সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার আয়তন ৩৪১ পৃষ্ঠা, প্রবন্ধের সংখ্যা ২৮টি। এতেও প্রকাশিত-অপ্রকাশিত নিবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে, কিছু আনন্দবার্তা থেকে এবং কিছু বিশুদ্ধবাণী থেকে। আলোচ্য গ্রন্থে ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী আচার্যদেব রচিত একটি ভূমিকা বর্তমান। তিনি তাতে শাক্তদৃষ্টির বিশেষত্ব কি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

'কাশী কী সারস্বত সাধনা' পরিষদ থেকে প্রকাশিত—তৃতীয় গ্রন্থ। এতে কাশীর সংস্কৃত সাহিত্যসাধকগণের (১৪০০ খৃঃ থেকে ১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত) কৃত্য ও পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে, এর প্রকাশকাল ১৯৬৫, আয়তন ৭৯ পৃষ্ঠা। এটি হিন্দীতে রচিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। প্রকাশক বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্। এই গ্রন্থখানি আবার ১৯৬০ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েসন থেকে কন্ট্রিবিউশন অব্ কাশী টু স্যানসক্রিট লিটারেচার ফ্রম এ· ডি· ১৫০০ টু ১৮০০ এই নামে প্রকাশিত হয়। হিন্দীতে রচিত গ্রন্থটি এর পরের রচনা।

১৯৬৮ সালে মণীষী কী লোকযাত্রা নামে আচার্যদেবের জীবনী রচনা করেন ডঃ ভগবতীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়। এই গ্রন্থে আচার্যদেব রচিত সৎসঙ্গ কথা, পত্র, তত্ত্বপ্রসঙ্গ, স্বাত্মসংবেদন, পরলোকবার্তা, পারিভাষিক শব্দ বিবরণ বর্তমান। শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় গ্রন্থের প্রথম অংশে তাঁর রচিত জীবন কথা সন্নিবিষ্ট করেছেন। উক্ত জীবন কথা প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী, বাকী সব বিষয় আচার্যদেবের নিকট শ্রুতলেখে প্রাপ্ত।

হিন্দীতে অন্য যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা বাংলায় রচিত গ্রন্থের অনুরূপ, সুতরাং সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি দোষ ভেবে তার বিবরণ উপস্থিত করা থেকে বিরত হলাম।

আচার্যদেব লিখিত আর একটি অসাধারণ গ্রন্থের বিবরণ এখানে উপস্থিত করছি। গ্রন্থটি প্রকাশ করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হিন্দী সমিতি বিভাগ।

গ্রন্থটির নাম 'তান্ত্রিক সাহিত্য'। গ্রন্থটি তান্ত্রিক সাহিত্যের বিবরণাত্মক গ্রন্থসূচী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪০, প্রকাশকাল ১৯৭২।

এতে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা (পৃঃ ১৩—৫৪) বর্তমান। এই ভূমিকায় আচার্যদেব তান্ত্রিক সাহিত্যের বিশালতা, উপাসাভেদে তন্ত্রের বিভিন্নতা—দশমহাবিদ্যা পরিচয়, এবং তৎসম্বন্ধী সাহিত্য, তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

১৯৬০ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের অধীন হিন্দী সমিতি আচার্যদেবকে তন্ত্র-সাহিত্যের একটি বিবরণাত্মক সূচী নির্মাণ করতে অনুরোধ করে। তিনি কার্যভার গ্রহণ করার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও দীর্ঘকালে ও শ্রমে কাজ শেষ হয়। পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে হিন্দী সমিতির হাতে তা অর্পণ করা হয়। তারপর দীর্ঘকাল পর এর প্রকাশন সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থের প্রকাশন উপলক্ষে কাশী শ্রীশ্রীমাআনন্দময়ী আশ্রমে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল আচার্যদেবকে দশ হাজার টাকা বিশিষ্ট পুরস্কার প্রদান করেন।

আচার্যদেবের সাহিত্য রচনা ও অধ্যাপনার কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন ১৯২৪ সালে এবং কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালে। আমরা তাঁর সাহিত্য রচনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। অবসর গ্রহণের পরও অবসর মতো তিনি বহু বিষয়ে লিখেছেন। তবে আগে লিখতেন গবেষণামূলক প্রবন্ধ, অবসর গ্রহণের পর আধ্যাত্মিক রচনাই প্রধান। ভূমিকা ও প্রাক্-কথনও লিখতে হত।

অবসর গ্রহণে অবকাশ কতটা বেড়েছিল বলা যায় না। তিনি সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসু শ্রোতার কাছে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। এই উত্তর একটি দুটি কথায় সীমিত থাকত না, তা হত দুঘন্টা-ব্যাপী দীর্ঘ প্রবচন। আবার ঐ সময়ে কারোকে হয়ত পাঠও দিতেন। আসত নানা গবেষক বিদ্যার্থী। তাদের সাহায্য করতে, উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।

কর্মজীবন হতে অবসর নিয়েও তিনি আচার্যজীবনের প্রাচীন আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও ঐ বিদ্যালয়টি একটি উচ্চ গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠুক এ ভাবনা তাঁর ছিল।

যেদিন সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপ ধারণ করে তার পূর্বে তাঁর কাছে প্রস্তাব আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি পদ তিনি গ্রহণ করুন, কিন্তু আচার্যদেব এই প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয় তাঁকে ঐ বিভাগের অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তবে স্থির হয় তাঁর সিগরার বাসভবনই হবে বিভাগের পরিচালনার স্থান, তাঁকে কোথাও

যেতে হবে না। গবেষক বিদ্বানগণ তাঁর গৃহে আসবেন, তাঁর নিকট পাঠ গ্রহণ করবেন এবং গবেষণার কার্য সম্পাদন করবেন।

এই যোগতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয় আচার্যদেবেরই পরামর্শক্রমে। এ বিষয়ে সহযোগীরূপে এগিয়ে আসেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তর-প্রদেশ সরকার। এই নবীন বিভাগ স্থাপনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লুপ্তপ্রায় যোগ ও তন্ত্র বাঙ্‌ময়ের পুনরুদ্ধার।

উক্ত বিভাগের স্থাপনার সময় আচার্যদেব বলেছিলেন, 'যদিও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগশাস্ত্রের পঠনপাঠন আজও অব্যাহত এবং তা পাতঞ্জল যোগেই সীমিত বলে অন্য সব যোগধারার সঙ্গে অধ্যয়নেচ্ছু পাঠকের কোন যোগ নেই, ফলে সে সব ধারা আজ অবলুপ্তপ্রায়। আজ বিভিন্ন যোগ সম্প্র-দায়ের স্মৃতিও মানুষের মনে ধূসর। দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। নাথ সম্প্রদায়ে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের ধারা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন শৈব ও তান্ত্রিক সাধনায় যোগের বিশেষ মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। অথচ এসব ধারা পাতঞ্জল ধারার সঙ্গে কোন কোন অংশে সমান হলেও সর্বাংশে সমান নয়। এমন কি পাতঞ্জল যোগে যোগ শব্দটি যে সীমিত অর্থে প্রযুক্ত হয় তন্ত্রযোগ তা থেকে ভিন্ন। আবার আগমে যা শিবযোগ তন্ত্রে তা শক্তিযোগ নামে পরিচিত। এরূপ ভাবে যোগের নানা বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, মন্ত্রযোগ, জপযোগ, অস্পর্শযোগ, শব্দযোগ, বাগ্‌যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি। আবার বৈদিক পরম্পরা এবং উপনিষদের ধারাতেও বিভিন্ন প্রকার যোগের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ঐ সম্পর্কে গ্রন্থও দুর্লভ নয়। প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে অর্থাৎ পালি ত্রিপিটকে এবং মহাযান গ্রন্থে আমরা যোগের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মহা-যানের অন্তর্গত পারমিতানয় ও মন্ত্রনয় এক একটি যোগপ্রস্থান। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত জৈন সম্প্রদায়েও যোগতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মুষ্টিমেয় অনুসন্ধিৎসু ভিন্ন অন্য সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছে এসব বিষয় অজ্ঞাত ও অবহেলিত। সহজমার্গ, অবধূতমার্গ, বাউল, বৈষ্ণব ও সন্ত সম্প্রদায়ের গম্ভীর অথচ রহস্য সাধনার খোঁজ শিক্ষিত মানুষ রাখেন?'

আচার্যদেব দীর্ঘকাল ধরে এ সব সাধনার গূঢ় রহস্য আলোচনা করেছেন, মনন করেছেন, সাধুসন্তের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করেছেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'আমার সময়ে আর্থার অ্যাভালনের সম্পাদিত ও আলোচিত তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। তারও আগে ঢাকা মানিকগঞ্জ হতে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তন্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারের এ অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পরে অবশ্য পণ্ডিচেরী থেকে ফরাসী বিদ্বানগণের চেষ্টায় কিছু আগম সাহিত্যের প্রকাশন হয়েছে, আর হয়েছে বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা থেকে। ভারতের বাইরে অক্সফোর্ড থেকে বৌদ্ধ তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ

হয়েছে। ইটালীতে টুচী, ফ্রান্সে সিলভা লেভী ও ইংল্যাণ্ডে বার্নেট তন্ত্র বিষয়ে কাজে লিপ্ত আছেন। বাংলাদেশে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রায় এক শত বছর পূর্বে ব্যাপকভাবে তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশনার কাজে যেভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন, এককভাবে এরূপ উদ্যম আর দেখা যায় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত তন্ত্রগ্রন্থ বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হয়েছে, আজ আবার সে সব পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।'

যোগতন্ত্র বিভাগ স্থাপনার এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ হল। বিভাগ স্থাপনার পর যে কার্যসূচী গ্রহণ করা হল তা নিম্নপ্রকার:

(ক) তন্ত্রযোগ সম্বন্ধে গবেষণা, নিবন্ধ ও লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশন।

(খ) লুপ্তাগম সংগ্রহ। যে সমস্ত গ্রন্থ আজ লুপ্ত অথচ বিভিন্ন আগমে ও তন্ত্রে বিভিন্ন আগম ও তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত রূপে বর্তমান তা সংগ্রহ করা ও প্রকাশন।

(গ) তন্ত্র শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের বিবরণাত্মক কোষ নির্মাণ।

লুপ্তাগম সংগ্রহের একটা ইতিহাস আছে, যা পাঠ করলে আচার্যদেবের অধ্যয়নশৈলীর একটা পরিচয় হবে বিবেচনায় এখানে তার উল্লেখ করছি। একদিন আচার্যদেব কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'বহুদিন আগে যখন আমি তন্ত্র ও আগমের আকর গ্রন্থসমূহ পাঠ করতে থাকি তখন বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাচীন আগম ও তন্ত্রের বহু উদ্ধরণ পাই। সে সব দেখে এবং তাতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমি কতকটা কৌতূহলবশতঃ সেগুলো অকারাদি ক্রমে সাজিয়ে একটা খাতায় লিখতে থাকি। বহুদিনের চেষ্টায় সেগুলো একটা বিরাট আকার ধারণ করে। এসব উদ্ধরণ পাঠে আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের দেশে অধ্যাত্ম-সাধনার বহু ধারা ছিল। মানুষ তার অধিকাংশ ভুলেছে অথবা প্রায় ভুলতে বসেছে। এই সব প্রাচীন উদ্ধরণগুলোর সাহায্যে প্রায় অবলুপ্ত অধ্যাত্ম-সাধনার কোন ইঙ্গিত অবশ্য লাভ হতে পারে এবং যে ধারা আজ অস্পষ্ট তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, এই বিবেচনায় এগুলো প্রকাশিত হলে ভাল হয়।'

লুপ্তাগম সংগ্রহ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এতে উদ্ধরণ আছে মোট ২২১টি এবং ১৬টি গ্রন্থ থেকে এগুলো সংগৃহীত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করছি। আচার্যদেব যে সময়ে যোগতন্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষ তখন একটি তন্ত্র সম্মেলনের প্রস্তাব হয়। প্রস্তাব কার্যকরী হলে তিনদিনব্যাপী তন্ত্র সম্মেলন হয় বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে। উক্ত সম্মেলনে অধ্যক্ষরূপে আমন্ত্রিত হন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও অধ্যাত্ম-সাধক স্বামী শ্রীপ্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহোদয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু তন্ত্রবিদের আগমন হয়। ৮-৩-৬৫-তে আচার্যদেব তাঁর অমূল্য ভাষণে তন্ত্রের উদ্ভব, তার প্রাচীনত্ব, তন্ত্রের বিভিন্ন ধারা ও সম্প্রদায়ের

পরিচয় প্রদান করেন। এই অভিভাষণই তান্ত্রিক সংস্কৃতি নামে প্রথমে হিন্দীতে একটি ছোট পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। এরই ভাষান্তরিত রূপ তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্তের প্রথম ভাগে আমরা দেখতে পাই, তারও নাম 'তান্ত্রিক সংস্কৃতি।'

যোগতন্ত্র বিভাগের মুখপত্র যোগতন্ত্র বিমর্শিনী নামক গ্রন্থে আচার্যদেব চারটি মৌলিক নিবন্ধ হিন্দীতে লেখেন। জীবনের সায়াহ্নে এই চারটিই হিন্দীতে শেষ রচনা। এরও বাংলা রূপান্তরণ আনন্দবার্তার কটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আচার্যদেব লৌকিক জ্ঞানের ধারাকে সতত গতিশীল রাখতে কোনদিনই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এইজন্য যার মধ্যে জিজ্ঞাসা বর্তমান, যে সত্যকার অনুসন্ধানী তাকে পথপ্রদর্শন করতে তাঁর কোথাও অনীহা ছিল না, নানা-ভাবে উৎসাহ দিয়ে সত্য বস্তুর গবেষণায় তাকে চালিত করতে পারলে তিনি নিজের অমূল্য সময় অকাতরে দিতে কোনো কার্পণ্য করতেন না।

তিনি নিজে ছিলেন চিরকাল অনুসন্ধানী এইজন্য অনুসন্ধানীর জিজ্ঞাসা জাগ্রত করতে তিনি ছিলেন সহৃদয় আচার্য। তাঁর অধীনে কত বিদ্যার্থী গবেষণার জন্য আসতেন তার সংখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে আমার যতটুকু জানা তাতে দেখি ডঃ গোরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ ভগবতীপ্রসাদ সিংহ, ডঃ দেবব্রত সেনগুপ্ত, ডঃ শান্তিপ্রসাদ চন্দোলা, ডঃ কৌশল্যাবল্লী, ডঃ কল্যাণী মল্লিক, ডঃ বন্দ্যো-পাধ্যায়, পরিতোষ দাস, ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, ডঃ লক্ষ্মীনিধি শর্মা, ডঃ ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিংহ 'মাধব', পণ্ডিত ব্রজবল্লভ দ্বিবেদী, ডঃ চন্দ্র-শেখর স্বামী, পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা এবং আরো অনেকে তাঁর পদপ্রান্তে বসে গবেষণায় নানা উপদেশ লাভ করেছেন।

আর যাঁরা প্রতিদিন তাঁর কাছে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ডঃ জয়দেব সিংহ, ডাঃ রাম অধিকারী, গোপাল শাস্ত্রী দর্শনকেশরী, ডঃ রামকুমার চৌবে, ডঃ বলদেব উপাধ্যায় প্রভৃতি।

আচার্যদেবের কার্যকালে 'তন্ত্রসংগ্রহ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগে (১) বিরূপাক্ষ পঞ্চাশিকা, (২) সাম্ব পঞ্চাশিকা, (৩) ত্রিপুরাম-হিম্নস্তোত্র (দুর্বাসাকৃত ও সটীক), (৪) স্পন্দপ্রদীপিকা, (৫) অনুভবসূত্র (৬) বাতুলশুদ্ধাখ্যতন্ত্র বর্তমান। তন্ত্র-সংগ্রহের দ্বিতীয় ভাগে (১) নির্বাণ-তন্ত্র, (২) তোড়লতন্ত্র, (৩) কামধেনুতন্ত্র, (৪) ফেৎকারিণীতন্ত্র, (৫) জ্ঞান-সংকলিনীতন্ত্র এবং (৬) সটীক দেবী কালোত্তরাগম নিবিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়।

আচার্যদেবের কার্যকালে আর একটি অমূল্য গ্রন্থ যোগতন্ত্র বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। এটির নাম 'নিত্যাষোড়শিকার্ণব'। এতে শিবানন্দ ও বিদ্যা-নন্দের টীকা বর্তমান। শ্রীবিদ্যার উপাসনা সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পিপাসা এই দুর্লভ গ্রন্থের প্রকাশে মিটবে।

জীবন-কথা

আচার্য গোপীনাথের জীবন-কথা আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রত্যেকের জীবন নানা কর্মধারার সংগে যুক্ত বলে তাকে কর্মের থেকে আলাদা করে দেখা কঠিন, তাই আমরা এই গ্রন্থের মাঝে মাঝে তাঁর জীবন-কথা প্রাসঙ্গিকভাবে দিয়েছি। জীবনের যে ব্যক্তিগত রূপ, যে রূপ নিজ পরিবার পরিজনের মধ্যে প্রকাশ পায় তার বাইরের দিকটাই সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষগোচর, তার অন্তরঙ্গরূপ সর্বদাই গোপন।

ব্যক্তিগত জীবনের বহু বিষয় সাধারণ মানুষের অগোচর বলে তার সবিস্তার আলোচনা সম্ভব নয়, যে রূপটি নানা ঘটনার আবর্তে পড়ে স্থির ও অবিচল থাকে ও একটি বিন্দু হতে আর একটি বিন্দুর দিকে এগিয়ে যায়, তার স্ব-রূপটি হারায় না সেই তার আসল রূপ ও তার চরিত্র। জীবনে নানা ঘটনা, কত কাণ্ড ঘটে সে তো সকলেই অল্প বিস্তর জানে, কিন্তু এমন মানুষ কজন আছে ঐসব ঘটনায় তাতে কোথাও একটু দাগও লাগে না। আচার্যদেবের কথা বলতে গিয়ে একজন বলেছেন—গৃহে যখন শোকে হাহাকার ওঠে তখন তাঁর চোখে জল নেই, বিষাদের চিহ্নও নেই। আবার ঐ মানুষই শ্যামাসংগীত শুনে চোখের জল রুখতে পারেন না। গৃহে ব্যয়কুণ্ঠ আবার দানে অকৃপণ। প্রেম, ভালবাসা বড় উদার বলে শুধু পরিবার পরিজনই তার ভাগ নিঃশেষে পাবে এ কেন? এই বিস্তীর্ণ বিশ্বই তো তাঁর ভালবাসার পাত্র। তাই আজও দেখি তাঁর হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা যে পেয়েছে সেই মনে করে সে-ই বুঝি তাঁর সব ভালবাসার একমাত্র পাত্র। পিতার স্নেহ যিনি কোনো দিন পাননি তিনি কত মানুষের স্নেহময় পিতা হয়েছেন। তাঁর মমতা, স্নেহ ও সীমাহীন উদারতার যে স্বাদ যে জেনেছে সে কি তা কোনদিন ভুলতে পারবে?

তাঁর দৃষ্টিতে ৫-১০ বৎসরের বালিকা শক্তি-রূপিনী কুমারী, সধবা রমণী তো জননী আর সাধারণ মানুষ ভগবল্লীলার বিচিত্র প্রকাশ। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ বা উপেক্ষার কেউ নয়। তাই দেখি তাঁর ব্যবহার কিভাবে সব আপন করেছে। নিন্দার্হ কখনো তাঁর কাছে নিন্দিত নয়, সেও স্বাগত, কেননা সবই তো শিবময়।

অথচ তিনি ব্যবহারে অতি সংযত, আবেগে উদ্বেল নন। গৃহে কোনো অভ্যাগত এলে তার জন্য দ্বার সদাই উন্মুক্ত, কোথাও বাধা নেই। সৎপ্রসংগ চলছে, কোথাও বসে গেলেই হল। প্রথম পরিচয় হলে তাঁর নিজস্ব ডায়েরীতে

তার নাম উঠল, তারপর প্রতিদিনের যাতায়াতে সম্পর্ক যত নিবিড় হতে লাগল, সেই নবীন মানুষটির একটা পরিচয় তাঁর ডায়েরীর পৃষ্ঠায় ক্রমশঃ এসে জুটতে লাগল, একটা সমগ্র চিত্র তৈরী হয়ে উঠল, শুধু তাঁর মনেই নয়, ঐ ডায়েরীর পৃষ্ঠাতেও। হয়ত সম্ভব হলে তার একটা ফোটোগ্রাফ চেয়ে নিলেন।

এইভাবে কত মানুষ তাঁর আপন হয়েছে। অথচ সে ভালবাসার কোনো প্রতিদান তিনি চান নি, যে স্বেচ্ছায় তাঁর সেবায় এগিয়েছে তাকেও বাধা দেন নি। কিন্তু একটা কথা যার যতটা প্রাপ্য বা অধিকার তা থেকে তাকে কখনো বঞ্চিত করেন নি। যে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠি লেখে তার অনুপস্থিতিতে সে কাজ পড়ে থাকে তা-ও ভাল, অন্য কেউ সে কাজ যত সুন্দরভাবেই করুক না কেন তাকে দিয়ে সে কাজ করাতে চাইতেন না। চিঠি লেখা একটা উদাহরণ মাত্র, এমনি আরো নানা কাজ, প্রত্যেকের অধিকারের সীমা বাঁধা, সেবারও।

দুটি জিনিস খুব ভালবাসতেন—একটি হল কলম এবং আর একটি বই। এসব পেলে মনে হত খুব দুর্লভ কিছু পেয়েছেন।

কোনো সময়ে শ্রীগুরুর আশ্রমের টাকা পয়সা তাঁর কাছে আসত। নানা খুচরো টাকা যেমন আসত পাই পাই করে সে সব কুপনে মুড়ে বাক্সে রাখতেন। নিজের টাকা ভাঙাতে হলেও তাতে হাত দিতেন না। যেভাবে আছে তেমনি তুলে দিতেন আশ্রমে বিভিন্ন সেবার কাজে। আশ্রমের সব খরচের হিসেব স্বয়ং রাখতেন বেশ দীর্ঘ দিন, এ কাজ তাঁর কাছে ভার মনে হত না।

এক সময় সখ ছিল ফোটো তোলার, লাইকা ক্যামেরা ছিল। ঘরে বিলাসের কোনো উপকরণ ছিল না। কোনো মহাত্মা এলে অথবা কোনো মন্ত্রীপর্যায়ের লোক এলে চেয়ারের ব্যবস্থা হত। কিন্তু অন্য যে কেউ হোক, যত বড় পদ-মর্যাদা হোক না কেন তাকে বসতে হত নিজের খাটের সামনে বিছানো জাজিমে।

সপ্তাহে দুদিন মৌন থাকতেন বহুকাল সোম ও বৃহস্পতিবার। আর একটা নিয়ম পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা নিষেধ ছিল। অপারেশনের পূর্বেই ছিল এসব বিধিনিষেধ, পরে সব উঠে যায়। তখন প্রণাম করতে দিতেন, বরদহস্তে আশীর্বাদও করতেন।

একবার আমরা একটা সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে ১লা বৈশাখে তাঁকে প্রণাম করতে গেছি। সঙ্গে আছে সঙ্গীতের সহায়ক যন্ত্রপাতি, মালা ও চন্দন। উনি দেখেই বললেন—এসব কি?

দলের মুখপাত্র বললেন—আজ বছরের প্রথম দিন। আপনাকে প্রথমে প্রণাম করব, তারপর আমাদের সব কাজ আরম্ভ হবে আপনার আশীর্বাদ নিয়ে।

এ কথা শুনে বললেন—প্রণাম করবে তো এত আয়োজন কেন? আর আমার কাছে যদি ভাষণ শুনতে চাও তাহলে তোমাদের নিরাশ হতে হবে। আমি ভাষণ দিতে জানি না, ভাষণ দিইও না। তবে তোমাদের যদি কিছু

জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমি কিছু বলছি। দশজন বিশজনের সামনেই আমি তার উত্তর দেব।

তখন মুখপাত্রটি বললেন—আমরা আপনার কাছে কিছু শুনব বলেই এসেছি। আপনি একটু বসুন, এ ছোটো ঘরে জায়গা কম, আপনার হল ঘরটায় আসুন।

তখন আচার্যদেব এসে বসলেন হল ঘরে। মালা ও চন্দন পরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। তারপর জিজ্ঞেস করা হল প্রণামের মহত্ত্ব কি ?

তিনি বললেন প্রায় এক ঘণ্টা। আমরা অবাক বিস্ময়ে শুনলাম সে কথা।

তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হলে অথবা তার ব্যবস্থা করলে প্রসন্ন হতেন না। ডি· লিট পদবী গ্রহণ করতে তিনি নিজে কখনো সভায় উপস্থিত হন নি। তাঁর জন্মদিনের উৎসবও খুব নবীন। গৃহে থাকতে দুবার ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে ৫/৬ বার এই উৎসব তাঁর জীবনকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আর একটি জিনিস পছন্দ করতেন না, সে হল ফোটো ওঠানো এবং ঠিকুজী দেখানো। ছোটো বয়সে একটি দুটি ফোটো হয়েছে, আর যা হয়েছে শেষ বয়সে। শখ করে ফোটো ওঠাতে কোথাও যেতেন না। কেউ ফোটো তুলতে চাইলে সহজে সম্মত হতেন না।

যে সাধু মাহাত্মাকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন শিশুর সারল্যে। মা আনন্দময়ীকে তিনি যে অপরিসীম শ্রদ্ধায় দেখতেন তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা একথার প্রমাণ। তিনি নিজে তাঁর নানা প্রসংগ করেছেন, আমরা সে প্রসংগ সাধুদর্শনের কথার আলোচনায় উল্লেখ করেছি। তান্ত্রিক বাঙ্‌ময় মে' শাক্তদৃষ্টি গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে দেখতে পাই তিনি লিখছেন :

'যিনি স্বরূপতঃ বিশ্বোত্তীর্ণ এবং ভাবাতীত হয়েও মহাভাবরূপা ও সব ভাবেই ক্রীড়া-পরায়ণা, সেই নিখিল জগতের কল্যাণরূপিণী, জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় প্রদর্শিনী জগজ্জননী পরমারাধ্যা মাতা শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর পবিত্র চরণকমলে দীন সন্তানের সপ্রেম উৎসর্গ।'

আবার এই মানুষই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রের দুরূহ পংক্তির গ্রন্থি-মোচনে, তার মর্মকথা অনায়াস দক্ষতায় জিজ্ঞাসুজনের হৃদয়গত করছেন ভাবলে বিস্ময় মনে হয়।

একই আধারে শিশুর সরলতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, লোকোত্তর অনুভব, ভাব, ভক্তি, যোগ, প্রেমের এই পরম সামরস্যে স্থিত আধার আর কটি দেখা যায়। তাই মা আনন্দময়ী তাঁর তিরোধানের পরে শুধু দুটো কথাতে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন—'এমনটি আর হয়নি, হবেও না।'

আচার্য গোপীনাথ সরস্বতী ভবনে ১৯১৪ সালে ৪ঠা এপ্রিলে গ্রন্থা-গারিকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। এবার নিয়মিতভাবে চাকুরীক্ষেত্রে প্রবেশ

করে তাঁর প্রথম মনে হল আর এভাবে একলা থাকা সম্ভব নয়, এবার মা সুখদাসুন্দরী এবং নিজের পত্নী কুসুমকামিনীকে কাশী আনা প্রয়োজন। গরমের ছুটির কিছু আগেই একটা বাসা ঠিক করলেন। প্রথমে কাশীতে কোথায় বাসা নেন সে সম্বন্ধে কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি প্রথমে পিশাচমোচন মহল্লায় এক বাগানবাড়ীতে ছিলেন, তারপর ক্রমশঃ ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তর ফটকের বাইরে পরিমলবাগ নামে বাড়ীতে, মিশির-পোখরার দুই বাড়ীতে, তারপর ৪১ নং কালিয়াগলিতে, ৬৫ নং সর্বমঙ্গলা লেনে ও ৪নং ধ্রুবেশ্বরে। সবই ভাড়া বাড়ী। 'পরিমলবাগে ছিলাম প্রায় চার বৎসর, সর্বমঙ্গলা লেনে আট বৎসর ও ধ্রুবেশ্বরে প্রায় চার বৎসর। ধ্রুবেশ্বরে অবস্থানের কালেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রচেষ্টায় ২নং সিগরাতে নিজগৃহ নির্মাণ হয়। তখন আমি রাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি।' এই নতুন গৃহে আসেন ১৯৩৭, ৩১শে মার্চ। প্রায় ২৪ বৎসর তিনি কাশীতে ভাড়া বাড়ীতেই অবস্থান করতেন।

ধান্যা হতে মা সুখদাসুন্দরী, পত্নী কুসুমকামিনী, পুত্র জিতেন্দ্র ও কন্যা সুধা আসেন আর আসেন মাতার পালিকা মাতা বামাসুন্দরীর জামাতা কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী ও তাঁর পত্নী স্বর্ণময়ী। আচার্যদেব এঁদের মেসো ও মাসী বলে সম্বোধন করতেন, ভাবতেনও তাই। ১৯১২ সালে বামাসুন্দরী ধামরাইতে পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর পরম আত্মীয় কৈলাশ নিয়োগী গোপীনাথকে নিজজন মনে করতেন বলে তাঁদের কোনো সংকোচ ছিল না তাঁর আশ্রয়ে এসে থাকতে। তাঁরা প্রথমে আচার্য গোপীনাথের গৃহেই রইলেন, পরে গঙ্গার কাছে এক ভাড়া বাড়ীতে গোপীনাথের ব্যবস্থা মত থাকতে লাগলেন। সব খরচের ভার রইল গোপীনাথের হাতে। এখানে ১৯১৮ সালে কৈলাস নিয়োগী মহাশয় পরলোক গমন করেন। মাসী স্বর্ণময়ী তখন আলাদাই থাকতেন, বিধবা মানুষ গঙ্গার তীরে থাকবেন এই কথা ভেবে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে তিনি যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে নিয়ে আসা হল নিজের সিগরার বাড়ীতে। ৬ই অক্টোবর ১৯৪৫ সালে তাঁর কাশীপ্রাপ্তি ঘটে।

মার রক্ষণাবেক্ষণে পুত্র গোপীনাথের দিন কাটতে লাগল নানা প্রসঙ্গে। আগে ছিল মুক্তজীবন, তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা দেখার কেউ ছিল না, এবার সংসারে দেখবার লোক আছে, অব্যবস্থিত খাওয়া থাকার জীবন আর তখন নেই। একটু শৃঙ্খলা হয়ত এসেছে জীবনে সে সময়ে। আচার্যদেব স্বীয় জননীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। সে শ্রদ্ধা তাঁর মত আদর্শ পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু ভয়ও যে মিশ্রিত ছিল না তা নয়। জননী প্রাচীন ধারার পক্ষপাতী ছিলেন; তিনি কিন্তু আচার্যদেবের কুলগুরুর নিকট থেকে দীক্ষা না নিয়ে অন্য কারো কাছে নেওয়া খুব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু পুত্রের বেলায় তাঁর অসম্মতি তত প্রকট না

হলেও আচার্যদেবের পত্নীর দীক্ষার প্রসঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু ঘটনায় তাঁকে পুত্রের সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিতে হয়।

মাতা সুখদাসুন্দরী ১০ই এপ্রিল, ১৯২৫ সালে কাশীতে পরলোকগমন করেন। ঐ বছরই আচার্যদেবের একমাত্র কন্যা সুধারাণীর বিবাহ সম্পন্ন হয় ঢাকা মাণিকগঞ্জে এক সম্পন্ন পরিবারে। কুমুদবন্ধু চৌধুরীর পুত্র সুশীলনাথের সঙ্গে অত্যন্ত সমারোহে সুধারাণীর বিবাহ হয়। সুধারাণীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। দেশ বিভাগের ফলে ১৯৪৭ সালে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় শিশুপুত্র ও কন্যাগণকে নিয়ে তাঁরা সকলে ভারতে চলে আসেন। বিশাল সম্পত্তি ও নানা প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী দেশে ফেলে আসতে হয়। সুশীলনাথও দীর্ঘজীবন লাভ করেন নি। নানা দুঃখ সহ্য করে ১৯৬৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। সুধারাণী তা সত্ত্বেও আশায় ধৈর্যধারণ করে পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বিব্রত হলেও পিতার দ্বারস্থ হয়ে থাকতে চাননি। তিনি কখনো কাশীতে কখনো কলকাতা থেকে পুত্র-কন্যাদের মানুষ করে তুলতে থাকেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা দমদমে নিজ বাসগৃহ করতে পেরেছেন। মেয়েদেরও যথা সময়ে উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। তাঁর পুত্রগণও স্বাবলম্বী হয়েছেন।

আচার্যদেব দুঃখের ও সংগ্রামের ছবি দেখেছেন, আবার সুখের ও সম্পন্নতার উজ্জ্বল মুখও দেখেছেন। নিজের সংগ্রামী জীবনে কত স্বাদ হয়ত পেয়েছেন তাতে মন কিন্তু কোথাও বিরূপ হয়নি।

পুত্র জিতেন্দ্রনাথ আদর্শে পিতার শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেন নি। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সি পাশ করে পরে এল-এল-বি হন এবং অচিরেই ভারত ব্যাঙ্কে সহকারী ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের ঐ পদ তাঁর বেশী দিন থাকে না। এ পদ ছেড়ে তিনি ১৯৪৬ সালে উত্তর প্রদেশের র‍্যাশনিংগ বিভাগে সিনিয়ার মার্কেটিংগ ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন। এর পূর্বে ১৯৩৩ সালে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

১৯৩৩-৩৪ সালে কাশীতে ভয়ঙ্করভাবে বেরীবেরী দেখা দেয়। এই রোগ প্রধানতঃ বাঙ্গালীর মধ্যেই বেশী দেখা যেত। আচার্যদেবের গৃহেও অনেকেই এই রোগের আক্রমণ হতে মুক্ত ছিলেন না। আচার্যপত্নী কুসুমকামিনী দেবী বেরীবেরীর প্রকোপে হৃদরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কাশীতে নানা প্রকার চিকিৎসাতে কোনো ফল হচ্ছিল না। তার উপর গৃহেই একটি আশ্রিত বালকের ঐ রোগে মৃত্যু হলে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। ডাক্তার পরামর্শ দেন অন্য কোনো স্থানে না গেলে রোগীকে বাঁচানো কঠিন হবে। তখন প্রথমে কলকাতা যাওয়া স্থির হয়।

আচার্যদেব পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ (বীণা) এবং চন্দ্রদেব নামে আচার্যদেবের গৃহে সেবকরূপে স্থিত একটি পশ্চিমদেশীয় যুবককে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার দিকে রওয়ানা হন। ট্রেনে পত্নীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে

যায়, তখন গাড়ীতেই সেঁকের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু গাড়ীর ঝাঁকুনিতে হার্টের কষ্ট আরো বেড়ে যায়। নিঃশ্বাসও বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাঁরা সকলে নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে থাকেন এবং অগতির গতি গুরুদেবকে স্মরণ করতে থাকেন।

এমন সময় গাড়ী পদ্মগন্ধে ভরে উঠল; ক্ষণপরেই আচার্যদেবের পত্নী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাবা এসে বললেন, 'এই নাও, ওষুধ খাও।' 'মুখ এখনো মিষ্টি মিষ্টি লাগছে।'

সেবার বাবার কৃপায় মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। অবশ্য এই প্রথম নয়। তাঁর জীবনে অনেকবার সংকট এসেছে এবং তিনি অলৌকিক উপায়ে বাবার কৃপায় প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এ শুধু আচার্যদেব বলেছেন তা নয়, মাতা ঠাকুরাণী নিজমুখে লেখককে আরো কাহিনী শুনিয়েছেন।

কলকাতা থেকে আচার্যদেব সপরিবারে শিমুলতলা যান এবং কলকাতা হয়ে কাশী ফিরে আসেন। শিমুলতলাতেও মার শরীর আবার সঙ্গীন হয়। পুত্র জিতেন ও পুত্রবধূ বীণা অসহায়ভাবে কাঁদতে থাকেন। তাঁরাও গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দের শিষ্য শিষ্যা। অসহায়ভাবে তাঁদের কাঁদতে দেখে আবার বাবা প্রকাশ পান রোগিনীর গৃহে, তিনি তাঁকে ওষুধ দিয়ে আসেন। বাবা কিন্তু তখন কাশীতে সশরীরে বর্তমান, তিনি গোপীনাথকে এসব কথার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। পরে যখন সব জানা যায় এবং বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি শুধু বলেন, 'হ্যাঁ গো, বড় খারাপ হয়েছিল।'

এইভাবে গুরুরূপে যে আধারকে তিনি আশ্রয় দিয়ে আপন করে নিয়েছেন তাঁদের চরম সংকটে উদ্ধার করতে তিনিই পারেন।

১৩৪০ সালে বিহারে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। জানুয়ারী ১৪ই, ১৯৩৪ ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে বিহারে যে কত প্রাণ ও কত সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল তা অল্প কথায় বর্ণনা করা কঠিন। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী তখন কাশীতে। কাশীতেও বহু গৃহ ভূপাতিত না হলেও কিছু না কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ভূমিকম্পের সময় সকলে যখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ব্যস্ত তখন স্বামীজী নিজ পূজাকক্ষে প্রবেশ করেন।

এই ভূমিকম্পের পর আচার্য গোপীনাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাশী হতে কলকাতা আসেন, সপরিবারেই এসেছিলেন (১৩৩৪, ফাল্গুনে)। তখন তাঁর শরীরে একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল। বিবেকানন্দ রোডে একটি ভাড়া বাড়ীতে তখন উঠেছিলেন। দুজন বড় ডাক্তার, একজন সাধারণ চিকিৎসক এবং অন্য জন শল্যচিকিৎসক। তাঁরও তখন হৃদযন্ত্র দুর্বল ছিল সুতরাং ডাক্তারগণ কেহই এবিষয়ে সম্মতি দিচ্ছিলেন না। কিন্তু গুরুদেব মহারাজ অনুমতি দিয়েছিলেন। নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

১৯৩৭ সালে তাঁর জীবনে একটি প্রধান ঘটনা তাঁর পরম আপন শ্রীগুরুদেবের তিরোধান। তিনি তাঁর সঙ্গে পুরী যান এবং আশ্রমের নিকটে একটা

আলাদা বাড়ীতে সপরিবারে থাকেন। অসুস্থ গুরুদেবকে প্রতিদিন নিয়মিত দেখতে যেতেন। কিন্তু অল্প কদিন সেখানে থেকে শ্রীগুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন, কেননা শ্রীগুরুদেবের শরীর সেখানে ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। ফিরে আসেন ৯ই জ্যৈষ্ঠ। '২৭শে আষাঢ়, কলিকাতা ভবানীপুরে আশ্রমে ৫-৫৩ মিনিটে শ্রীগুরুদেবের প্রাণ নিঃশেষিত তৈল দীপের মত ধীরে ধীরে নির্বাপিত হইয়া গেল।......গোপীনাথ শ্মশানে জ্যোতিরূপে বাবার দর্শন পাইয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিলেন।'

প্রায় ২০ বছর দীর্ঘ সান্নিধ্যের লৌকিক অবসান সেদিন ঘটল।

আচার্যদেব ১৯৩৭ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বয়স তখন পঞ্চাশ পূর্ণ হয়েছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করে তিনি পঞ্চাশ পূর্ণ হতেই অবসর নেবেন স্থির করেছেন। শরীরও বেশ কিছুদিন হতে ভাল চলছিল না। বেরিবেরির আক্রমণের পর শরীর বেশ অপটু হয়েছে, কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই শুধু সাধনা ছাড়া, তাই অবসর। কিন্তু অবসর নিতে চাইলেই তো হয় না, তার নানা বিধি নিষেধ। একদিন শিক্ষা বিভাগে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

এই উপলক্ষ্যে সংযুক্ত প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এসেছেন, উঠেছেন সরকারী সার্কিট হাউস-এ। আচার্য গোপীনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি ?

তিনি উত্তর দিলেন, আমার পদত্যাগপত্র যাতে সরকার যথাশীঘ্র গ্রহণ করে, আপনি তার ব্যবস্থা করুন, এই আমার প্রার্থনা, আর কিছু নয়।

তিনি একথা শুনে বিস্মিত হলেন, ভাবলেন হয়ত, এমন কথা তো কেউ বলে না। এ এক আশ্চর্য মানুষ!

তাঁর মতো যোগ্য বিদ্বান দুর্লভ বলেই সরকার থেকে তাঁকে বলা হল, পদত্যাগ না করলেই ভাল হয়। তিনি ইচ্ছা করলে দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করতে পারেন, তাতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হবে না, পেনসনও বাড়বে।

কিন্তু আচার্য গোপীনাথ অটল রইলেন তাঁর সংকল্পে, বললেন, সিদ্ধান্ত যখন একবার নেওয়া হয়েছে তার আর ব্যতিক্রম হবে না।

এই ছিল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা। আজ এমনটা দেখতে পাব কি ?

অবসর গ্রহণের আগে সিগ্রাতে গৃহ নির্মিত হয়েছে। পেনসনের কিছু অংশ কম্যুট করলেন, যাতে গৃহনির্মাণে ঋণ না হয়। তাঁর পেনসন তাতে কমল। কিন্তু তবু কি তাঁর মনে চিন্তা দেখা দিয়েছিল ?

ঐ ১৯৩৭ সাল তাঁর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ বছর গুরুর তিরোধান, তাঁর অবসর গ্রহণ এবং নতুন গৃহে প্রবেশ। এই গৃহ নির্মিত ও স্থান নির্বাচিত করেছিলেন স্বয়ং গুরুদেব। আচার্যদেব বলতেন, 'বাবার আশ্রমে নবমুণ্ডী মহাসনের যে মহত্ত্ব, গুরু রহস্য ক্রিয়ার যা সেখানে প্রকট

করেছেন আমার পূজার ঘরেও তার একটু সম্পর্ক আছে।' তাই তাঁর দ্বিতীয় তলাটি এক হিসাবে সাধনস্থান, বাসস্থান নয়। 'চিরকাল ঐ তলার ঘরগুলো সেইভাবেই ব্যবহার করা হবে এই আমার ইচ্ছা।'

তাঁর একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনাথ কবিরাজ (জন্ম ১৩১৩, ১৪ই ফাল্গুন) পূর্ববঙ্গ দান্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। তার কয় বছর পর ঐ দান্যাতে জন্ম হয় কন্যা সুধারাণীর। জিতেন্দ্রনাথ বি· এস্‌সি·, এল· এল· বি· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কিছুকাল পর ভারত ব্যাঙ্কে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সদাশয়, নম্র স্বভাবের ছিলেন। তাঁর অনেক সঙ্গী আজও জীবিত, তাঁদের মুখে তাঁর সরল স্বভাব, নিরহঙ্কার ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর বিবাহ হয় ১৯৩৩ সালে। বিবাহের কিছুকাল পরেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুধারাণীও দীক্ষা নেন তাঁরই নিকট থেকে।

নতুন গৃহে এসে তাঁর সাধনা, সাধুদর্শন, তত্ত্ব কথার প্রবচন ও শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যাপনা অবিচ্ছেদে চলতে থাকে। বাস্তবিক বিশ্রাম কাকে বলে তা তাঁর কাছে ছিল অজ্ঞাত। আমরা দেখেছি সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত পূজো-কক্ষে সাধনা তাঁর চলত, রাত্রি ১১-৩০ থেকে ১২-৩০ পর্যন্ত মহানিশার ক্রিয়া। তারপর কতক্ষণ বিশ্রাম নিতেন তা ছিল অজ্ঞাত।

যাহোক্‌ জিতেন্দ্রনাথের ব্যাঙ্কের চাকুরী সমাপ্ত হয় যখন সেটি ফেল হয়। তখন তিনি উত্তরপ্রদেশ র‍্যাশনিংগ বিভাগে সিনিয়র মার্কেটিংগ অফিসার হিসাবে যোগ দেন (১৯৪৬—১৯৫০)। তাঁর শরীর ১৯৫০ সালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অফিস থেকে ফিরে আসবার পর রাত নটায় শরীরে কেমন অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। তখন কোন কবিরাজ বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। খবর শুনে তিনি জিতেন্দ্রনাথকে দেখে একটা ওষুধ দেন। সে ওষুধে কাজও হয়; রোগী আরামে ঘুমোতে থাকে। কিন্তু আবার রাত তিনটায় অস্বস্তি বেড়ে যায়। জিতেন্দ্রনাথ হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর যাত্রার সময় হয়েছে। মা তাঁর কাছেই ছিলেন, তাঁকে বললেন, মা তুমি শুধু বল, আমাকে ক্ষমা করেছ।

মা তাঁর মুখ থেকে একথা শুনে কেঁদে উঠলেন। কেঁদেই বললেন, কেন, একথা বলছিস, বাবা ?

পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে তিনি বললেন, ক্ষমা করলাম। তারপর জিতেন্দ্র-নাথ তাঁর বাবা আচার্যদেবকে ডাকালেন। তাঁকেও বললেন, ঐ কথা বলতে। একথা শুনে পুত্রকে তিনি বললেন, তুমি কেন এসব বলছ ? এমন কোন্‌ অপরাধ আছে পিতা পুত্রের সে অপরাধ ক্ষমা করে না ?

এ আশ্বাসে কিন্তু জিতেন্দ্র শান্ত হল না। পিতাকেও বলতে হল, তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।

এর ঠিক আধ ঘণ্টা পরে পিতা, মাতা, পত্নী, এক পুত্র ও দুই কন্যাকে

শোকমগ্ন করে জিতেন্দ্রনাথ সব মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন ভোর চারটায়। সেদিন ১লা জানুয়ারী, ১৯৫০।

শ্মশান যাত্রার আয়োজন হল। বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন সব আয়োজন করে শ্মশানে নিয়ে গেল মরদেহ। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুকাল। যে সব লোক তাঁর কাছে এলো তাঁকে সান্ত্বনা দিতে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে তাঁর চোখে নেই একবিন্দু অশ্রু অথবা শোকের কোনো অভিব্যক্তি। নির্বিকার হয়ে তত্ত্বকথার প্রসঙ্গে সময় কাটতে লাগল। তাঁর কোমল হৃদয়ে শ্যামা-সঙ্গীতে যে অশ্রু স্বভাবতঃ প্রবাহিত হয় আজ এই কঠিন আঘাতেও সেখানে কোন শোক নেই।

এর ঠিক দেড় মাস পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পুত্রবধূও পরলোকগমন করলেন। পর পর এ দুটি শোকাবহ ঘটনা তাঁর পরিবারে ঘটল। সংসারে অনেক কর্তব্য ও বহু দায়দায়িত্ব আছে, কে সব দেখে, কে বা সামলায়? গৃহে বড়ো কেউ নেই, পৌত্র শশিশেখর তো সেদিন বালক। পত্নী কুসুমকামিনী নিজ পতির নিস্পৃহ ও বৈরাগ্যময় জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেও সংসারের নানা প্রয়োজন ও দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু তাতেও বিধাতা বাদ সাধল। তিনি ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি নিজেই হলেন পরনির্ভর।

আচার্যদেব ধীরে ধীরে সব ব্যবস্থা করছিলেন। গৃহে সর্বদা কেউ না কেউ সেবক ও সহচর রূপে অবস্থান করত। এখানে সেবক ও সহচর সীতারাম পাণ্ডেয়জীর কথা বলতে হয়। তিনি বালক বয়সে আচার্যদেবের গৃহে আসেন। তাঁর মা বর্তমান ছিলেন। নিরাশ্রয় এই বালককে আচার্যদেব যে কি স্নেহের চক্ষে দেখতেন তা যে দেখেছে সেই তা বলতে পারে। তিনি এই বালককে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন। তাঁর বিধবা মাতার ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা নিজের আয় থেকে করেন। তিনি থাকতেন নিজ জামাতার সঙ্গে। পৌরোহিত্য করে তাঁর জীবিকা কোনোমতে চলত, কিন্তু কিছুকাল পরে সীতারামজীর ভগ্নীপতির মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্রকন্যাদের দায়িত্ব এসে পড়ে সীতারামজীর ওপর। বাধ্য হয়ে তাঁকে পড়াশুনা বন্ধ করতে হয়। আচার্যদেব তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য ৩০০০ টাকা মূলধন সাহায্য দিয়ে তাঁকে একটি ছোট লোহা-লক্কড়ের দোকান করে দেন। সীতারামজী তখন ঐ বৃহৎ পরিবারকে নিয়ে আসেন আচার্যদেবের গৃহে। এরা থাকত গৃহের নীচের তলার কক্ষে। সীতারামজী কিন্তু ছিলেন আচার্যদেবের আশ্রিত বহু কাল থেকে। এ যে আশ্রিত তা শুধু নয়, পরিবারেরই একজন।

তাঁর প্রতি আচার্যদেবের ছিল অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও নির্ভরতা।* সংসারের দায়দায়িত্ব, ব্যয় নির্বাহ আচার্যদেব তাঁর হাত দিয়েই করাতেন। পুত্র যেমন পিতার ডান হাত সীতারামজীও ছিলেন তাই। যদি কোথাও দূরে ভ্রমণে

যেতেন সীতারামজী হতেন সাথী ও সহচর। কুমিল্লায় শোভামাকে দর্শন করবার কালে সীতারামজী সঙ্গী ছিলেন। মেহের বাবা, রাম ঠাকুর, সীতারাম দাস ওঁকারনাথ, মা আনন্দময়ী এবং আরো অনেক সাধুসঙ্গের সাক্ষী এই সীতারামজী।

আচার্যদেবের সেবার ভারও তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অপারেশনের পর তাঁকে নিয়মিত ড্রেসিং করা প্রভৃতি কাজ নির্বিকারে ও সযত্নে তাঁকে করতে দেখা যেত। ১৯৫২ সালে 'বাবুজী' অর্থাৎ আচার্যদেব তাঁকে বিবাহ করান।

অখণ্ড মহাযোগের যে ধারা আচার্যদেব অনুসরণ করতেন সেই ধারা পুষ্ট করতে সীতারামজী আচার্যদেবের গৃহে অখণ্ড মহাযোগ সংঘ স্থাপন করেছেন। এরূপ শোনা যায় যে তিনি কোনো বিশিষ্ট পথও নিজের স্বরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সাধনা ও যোগের পথে অগ্রসর হয়েছেন। ব্যক্তিগত হিসাবে বলতে হয় যে তিনি আচার্যদেবের নিবিড় সান্নিধ্যে যা কিছু পরমার্থ নিজ উপলব্ধিতে পেয়েছেন তা তাঁর নিজের নয়, এসব আচার্যদেবেরই কৃপা এবং পরমগুরুদেবেরই প্রকাশ একথা তিনি নিজেই বলেন।

সীতারামজীর প্রথমা কন্যা বেবী ছিল আচার্যদেবের অত্যন্ত স্নেহভাজন। প্রতিদিন একটি ফল ও মিষ্টি তার হাতে তুলে দিয়ে আচার্যদেব খুবই প্রসন্ন হতেন। এই অপার স্নেহ যে না দেখেছে সে তা কল্পনায়ও আনতে পারবে না।

আবার দেখা যেত তিনি তাকে জ্যামিতি ও গণিত পড়াচ্ছেন, ইংরেজীর অর্থ বলে দিচ্ছেন। দেখে মনে হত যে অত বড়ো মানুষ, তিনি কি করে কত সহজে লৌকিক ব্যবহারে এত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।

তাঁকে দেখেছি অসুস্থ শরীরে ম্যাজিক স্কোয়ার নিয়ে খেলা করতে। তিনি তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ঘরের স্কোয়ারগুলো অনায়াসে ভরে তুলতেন, সব দিকের যোগ হত সমান। কয়টি নতুন পদ্ধতি লেখককে এক সময় দেখিয়েছিলেন, আর এগুলোর সঙ্গে লৌকিক লাভের কি সম্বন্ধ তাও বলেছিলেন।

এইভাবে দিন কাটছিল তাঁর। কিন্তু ১৯৬১ সালে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। যোগিরাজ কালীপদ গুহ রায় মহাশয় কিছু সন্দেহ করেন। মা আনন্দময়ী বুঝতে পারলেন কিছু। তিনি অবিলম্বে আচার্যদেবকে দিল্লীতে নিয়ে এসে ডাঃ সেনের নার্সিং হোম-এ চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করবার জন্য পাঠালেন। সেখানে ডাক্তারগণ সন্দেহ করলেন হয়ত ক্যানসার হয়েছে। তখন বম্বে টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এ তাঁকে পাঠানো হল। ডাঃ বার্জেস তখন তাঁর রেকটাল অপারেশান করলেন, সময় লাগল ৫ ঘন্টা।

অপারেশন সফলতার সংগে সম্পন্ন হল দেখে মা আনন্দময়ী সব হাসপাতাল কর্মীকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। বম্বে ও পুণায় মার আশ্রমে আচার্যদেবের কল্যাণ কামনায় অখণ্ড নামযজ্ঞ চলতে লাগল। মার অনন্য ভক্ত কমল ব্রহ্মচারী মহাশয় ২৪ ঘন্টা অনশন করলেন এই অপারেশন কালে। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশজী, যিনি আবার আচার্যদেবের পরম ভক্ত এবং কাশীর প্রতিবেশী, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। এই অপারেশন উপলক্ষ্যে গোয়ালিয়রের মহারাণী বিজয়রাজে সিন্ধিয়া অনেক সাহায্য করেছিলেন। আরো কত সাহায্য কিভাবে এসেছিল তা আজও অজ্ঞাত। সর্বোপরি মা আনন্দময়ীর করুণা দৃষ্টি তাঁর জীবন রক্ষায় সহায়ক ছিল আন্তরিক দৃষ্টিতে, লৌকিক দৃষ্টিতে সেই করুণার প্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্নভাবে।

অপারেশনের পর আচার্যদেব ২৩ দিন হাসপাতালে অবস্থান করেন। তারপর তাঁর বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা হয় রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশের প্রস্তাবে বম্বে রাজভবনে, কিন্তু অরবিন্দের অনুরাগী ও ভক্ত শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁকে নিয়ে যান নিজ আশ্রম পুণায়। সেখানে মা আনন্দময়ীর আশ্রম ও সান্নিধ্য তাঁকে তাড়াতাড়ি সুস্থ ও সবল করে তুলবে এই বিবেচনায় পুণায় যাওয়াই স্থির হয়।

প্রতিদিন সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশে তিনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এ সময়কার একটা বর্ণনা আমরা পাই ডঃ গোবর্ধননাথ শুক্লের বর্ণনায়। আচার্যদেব পুণায় আছেন, অপারেশনের ঠিক পরেই। আগন্তুকদের সংগে সাক্ষাৎকার বারণ সে সময়, যাঁদের সংগে পূর্বে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছে শুধু তাঁরাই সাক্ষাৎ করতে পারবেন নির্ধারিত সময়ে। তখন আছেন দিলীপ রায়ের আশ্রমের বিপরীত একটি বাংলোয়। 'আমার আন্তরিক আগ্রহ দেখা করব, আশীর্বাদ নেব। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে বুঝছি না। মা আনন্দময়ী এসেছেন আচার্যদেবকে দেখতে। তিনি চলে গেলে আচার্যদেব ওপর থেকে নামবেন না, দেখাও করবেন না কারো সংগে। আমি নিরাশ হলাম, কিন্তু অপেক্ষা করতে লাগলাম। মা চলে যাচ্ছেন, আচার্যদেব তাঁকে বিদায় দিতে নীচে এসেছেন। ভীড়ে একটু বিশৃংখলা এল, সেই অবসরে তাঁর পাদস্পর্শ করতেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয়?

পরিচয় দিলাম এবং সংগে সংগে নিজের গবেষণার বিষয়ও জানাতে ভুললাম না। বিদ্যাব্যসনী কবিরাজ মহাশয় যেন রসের সন্ধান পেলেন। সেবক ও সচিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কবিরাজ মহাশয়ের বাক্‌নির্ঝরধারা প্রবাহিত হতে লাগল। শরীরের কষ্ট তখন কোথায়? আমার গবেষণার বিষয় 'সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের ভক্তি পদ্ধতির স্বরূপঃ তুলনাত্মক অধ্যয়ন।' তিনি শঙ্করের 'বদতো ব্যাঘাত দোষ' তীব্রভাবে চর্চা করে বিভিন্ন ভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্যগণের পরস্পর তারতম্য দেখিয়ে বিচার করলেন। শেষে বললেন আপনার

বিষয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তো শংকর। সাবধানে কাজ করুন। বিষয় সুন্দর, খুবই উপযোগী।'

এই হল তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞরূপ—সুখে বিগতস্পৃহ দুঃখে অনুদ্বিগ্ন।

কাশীতে ফিরে এলেন বেশ কিছুদিন পর। আবার চলল সেই পুরনো কার্যক্রম। তবে এবার একটু পরিবর্তন এসেছে। কঠোরতা কমেছে অনেক। এখন একটু অন্যের মুখাপেক্ষী হয়েছেন বেশী—সে হল ঐ ড্রেসিং।

আগের মতোই বিদ্যার্থী ও জিজ্ঞাসুর ভীড় আছে। তিনি সর্বদা বাইরের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক পরিহার করে চলতেন। কোনো সভাসমিতিতে যেতেন না অথবা কোনো সভাসমিতির সম্মানিক সদস্যতাও স্বীকার করতেন না। কেবল তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক অথচ সক্রিয় সহযোগ ছিল। একটি মলদাহিয়াস্থিত বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমের পরিচালনা, শরৎকুমারী সংস্কৃত পাঠশালার পরিচালনা এবং গোয়েংকা ট্রাস্টের পরিচালনা। কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালের কোনো সময়ে তিনি এসব স্থান থেকে পদত্যাগ করেন, ধীরে ধীরে সব কিছু থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন।

যখন সংস্কৃত কলেজ ছাত্রাবাসে থাকতেন তখন একদিন ডঃ ভেনিস তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে বিস্মিত হন তাঁর পুস্তক সংগ্রহ দেখে। তিনি বললেন, কবিরাজ, তুমি বই পড়তে ভালবাস তা জানি, তুমি যে এত বই সংগ্রহ করেছ এ আমার জানা ছিল না।

তিনি যে বই পড়তেন শুধু তাই নয়, বহু বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর পাঠকক্ষ অথবা শয়নকক্ষ, বড় হলঘর, পাশের ঘর এমন কি পূজার ঘর বইয়ে ভরা থাকত। বই যেন উপচে পড়ত। অনেক বই উপহার হিসেবেও পেয়েছেন। হেসটিংস-এর এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ান এ্যান্ড ফিলো-সোফি-র অনেকগুলো ভলিউম, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, নানা প্রসিদ্ধ লেখকের ইতিহাস দেশ ও বিদেশের, অনেক ক্লাসিক এ সব ছাড়াও ছিল ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় গ্রন্থের নানা সংস্করণ, নানা প্রকার আলোচনার বই বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী ও সংস্কৃত। একদিন ঠিক করলেন এ সব বই উপহার দেবেন বিশ্বনাথ পুস্তকালয়ে। সূচী তৈরি হতে লাগল। তাঁর সব বইয়ের এক চতুর্থাংশ উপহৃত হল। এ দিয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মহামহোপাধ্যায় গোপী-নাথ কবিরাজ স্মারক বিভাগ রচনা করলেন। এই বিভাগের পুস্তক সংখ্যা ৭৪১৩। স্থির করেছিলেন আরো বই দেবেন ঐ সংস্থায়। ভালবাসতেন সংস্থাটিকে, ভেবেছিলেন, তাঁর সমগ্র সংগ্রহ এখানে থাকলে পাঠক ও গবেষক উপকৃত হবেন, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

১৯৬৮-৬৯ থেকেই শরীর ভাল চলছিল না। মাঝে মাঝে জ্বর হত। চিকিৎসা চলছিল, তাতে সাময়িক উপকার হলেও স্থায়ী কোনো উপকার দেখা যায়নি। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক জীবন যাত্রা তাতে ব্যাহত হয়নি।

এই সময় তাঁর জীবনের বহুদিনের সাথী তাঁর পত্নী দীর্ঘ রোগভোগের শেষে পরলোকগমন করলেন (১৯৬৯, ১৮ই এপ্রিল)। তাঁর সেবার জন্য কন্যা সুধা ছিলেন পিতার গৃহে। কিন্তু তবু সব সেবা ও যত্ন উপেক্ষা করে তিনি চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে দুই পৌত্রীর বিবাহ হয়েছে এবং পৌত্র শশিশেখরেরও বিবাহ হয়েছে। গৃহে যে ছন্নছাড়া ভাব ছিল তাতে শ্রী এসেছে। পত্নী বিয়োগের পর তাঁর সংসারে যে বন্ধন ছিল তা যেন কেটেছে। তবে এ সব আমার লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা। হৃদয়ে কোথায় ব্যথার সমুদ্র বর্তমান তা কে জানে?

শরীর অসুস্থ সে খবর মা আনন্দময়ী জেনে ব্যবস্থা করালেন যাতে 'বাবা' অর্থাৎ আচার্য গোপীনাথের অসুস্থতার বীজ কি তা জানা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো আবশ্যক। সেখানে মেডিক্যাল চেক আপ হবে এবং বিধিমত চিকিৎসাও হবে।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ আচার্যদেব কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সার সুন্দরলাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হবেন বলে কাশী আনন্দময়ী আশ্রমে মাকে দর্শন করে যাবেন এরূপ ব্যবস্থা হয়। মা আনন্দময়ী তাঁর নামের উৎসর্গীকৃত হাসপাতালের প্রাঙ্গনে অপেক্ষা করছিলেন। আচার্যদেব এলেন, মা বললেন, বাবা কয়দিন হাসপাতালে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে এসো।

এ কথায় আচার্যদেব বললেন, আমি কিন্তু বেশী দিন থাকব না। শরীরটা ভাল হলেই আবার ঘরে ফিরতে চাই। পূজার সময় কত বাইরের লোক আসে আমাকে লক্ষ্য করে—তাদের কত জিজ্ঞাসা।

মা শুধু বললেন, ভাল হয়ে এসে আশ্রম হয়ে বাড়ী যাবে।

কিন্তু হাসপাতালে তাঁকে থাকতে হল অনেক দিন। পুজো কাটল। তাঁর প্রোসট্রেট গ্লাণ্ড-এর চিকিৎসা হল এক নতুন পদ্ধতিতে। তখন হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একজন ক্যানাডিয়ান চিকিৎসক প্রোসট্রেট গ্লাণ্ড-এর চিকিৎসার নতুন বিধি শিক্ষা দিচ্ছিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। সৌভাগ্য-বশতঃ সেই ডাক্তার ঠিক সেই সময় উপস্থিত ছিলেন কাশীতে। তিনি সযত্নে চিকিৎসা করলেন। ধীরে ধীরে আচার্যদেব আরোগ্যলাভ করলেন, কিছুদিন সেখানে থেকে চলে এলেন আশ্রমে। আবার প্রস্রাবে অবস্ট্রাকশান হল, আবার গেলেন হাসপাতাল। আবার সেখানে অবস্থান। এর পর স্থির হল আশ্রমই আচার্যদেবের অবস্থানের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। এখানে হাসপাতালের সুবিধা আছে, বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালও কাছে। ডাক্তার সেখান থেকে আচার্যদেবকে দেখতে আসতে পারেন, গৃহে থাকলে তা কখনই সম্ভব হবে না। তারপর আছে আশ্রমে নিয়ম ও শৃঙ্খলার জীবন। সময় মত পথ্য ও সেবার ব্যবস্থা, লোকের ভীড়কে সংযত করার সযত্ন ব্যবস্থা।

সুধাদি এবার পুত্র, পুত্রবধূ, শিশু পৌত্র পৌত্রীর আকর্ষণ ত্যাগ করে,

চলে এলেন আশ্রমে মায়ের আহ্বানে। ১৯৬৯—১৯৭৬ এই দীর্ঘ সাত বছর প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় আচার্যদেবের কয়জন ভক্ত তাঁর সেবায় ছিলেন সতত তৎপর। এঁদের মধ্যে শ্রীধর ভট্টাচার্য ও গোপাল মজুমদারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা অবসর সময়ে গুরুজীর নানা অসুবিধা দূর করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন তাঁদের মধ্যে আচার্যদেবের শিষ্যা শ্রীমতী কোশল্যাওয়ালী, শ্রীজগদীশ্বর পাল ও শ্রীচন্দ্রশেখর স্বামীর নাম করতে হয়।

মার সতত জাগ্রত দৃষ্টি আচার্যদেবকে যেন ঘিরে ছিল। যখন তিনি আশ্রমে থাকতেন তখন তো কথাই নেই কাশীর বাইরে অবস্থানকালেও মনে হয়েছে শিশুসন্তান যেন মাতৃসান্নিধ্যেই আছে। কন্যাপীঠের মেয়েরাও যথাসাধ্য সেবা করত।

আশ্রমে অবস্থান কালে আচার্যদেব শরীর ভাল থাকলে তত্ত্বপ্রসঙ্গ করতেন। এই সময়ের রচনা 'মাতৃকা রহস্য'। শ্রীযুক্ত গৌরীশাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে এটি রচিত হয়। এই রচনাটি স্থান পেয়েছে তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় ভাগে। রচনাটি সুদীর্ঘ, এটি পাঠ করলে আচার্যদেবের এই বার্ধক্যেও অখণ্ড স্মৃতি স্থিতধী দেখে বিস্মিত হতে হয়।

এই অবস্থায় সম্পাদনা করেন মহাকালসংহিতার কামকলা খণ্ড, ভূমিকা রচনা করেন কয়েকটি নবীন গ্রন্থের। যে সব প্রবচন দেন সে সমুদয়ের বিবরণ পাই পরমার্থ প্রসঙ্গের তিনটি প্রকাশিত গ্রন্থে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসা থাকলে উত্তর আসত শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে। বলতেন, কষ্ট কোথায়? যে স্থিতি হতে উত্তর আসে শরীর তো গৌণ সেখানে।

তাঁর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন দিনপঞ্জী লেখার। যখন নিজে পারতেন না সেবকদের কেউ কাছে থাকলে তাদের দিয়ে লেখাতেন দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথাগুলো। কোনো ভক্ত যে প্রতিদিন আসে, তার অনুপস্থিতি নোট করাতেন। আর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন 'গুরুবাণী' শোনার। একটি ভক্তের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব যাত্রার ক্রম প্রতিদিন যা প্রকাশ পেত তা শুনতেন পরম আগ্রহে। পড়তে চাইতেন নিজে। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছিল বলে মোটা অক্ষরে কালো করে লিখে দিলে পড়তেন।

পুজা সন্ধ্যার কোন বাধা নিষেধ ছিল না। বিছানায় বসেই মায়ের দেওয়া দুটি চাদর নিতেন, ঘরের আলো কমিয়ে দেওয়া হত, একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করে ক্রিয়া করতেন প্রায় ঘণ্টা খানেক। যারা অন্তরঙ্গ তারা ঘরেই মেঝেতে বসত, বলতেন—তোমরা ধ্যান বা জপ করো। বাইরে যাবার দরকার নেই।

কখনো মা এলে দুটো একটা কথা হত। তারপর আচার্যদেব মৌন থাকতেন নিবিড় শ্রদ্ধায়। শ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ কাশীতে এলেই আচার্যদেবের নিকট অবশ্য আসতেন। দুজনে ভাব বিনিময় হত।

নানা মানুষ তখনো আসত তবে সময়ের বিধিনিষেধ ছিল বলে আচার্য-

দেবের অনর্গল বাগ্‌ধারা যেন অনেকটা সীমিত হয়েছিল। সারাদিন থাকতেন অন্তর্মুখে।

১৯৭৬ সালে মার্চ-এপ্রিলে শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মা এলেন দূর থেকে। মার শরীরও তখন ভাল ছিল না। আচার্যদেবের কক্ষে বসে রইলেন দীর্ঘকাল। মার সান্নিধ্যে আচার্যদেব সুস্থ হয়ে উঠলেন। সকলে বিস্মিত হল দেখে যে, মরণাপন্ন মানুষ কেমন সুস্থ হয়ে উঠল।

মার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎকার, স্থূল শরীরে আর দেখা হয়নি।

তারপর এল ১৯৭৬-এর ১০ই জুন। আচার্যদেবের শরীর আর যেন রক্ষা করা যায় না। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার। দূরে নয়, আনন্দময়ী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

তারপর এল ১২ই জুন। সেদিন জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন। সকাল ৯টায় পূর্ণিমা ছাড়বে।' আমরা আশঙ্কা করেছিলাম হয়ত পূর্ণিমা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যাবে।

এ তারিখটি আমার জীবনে কেন ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাসে মুছে যাবে না। গুরুজী সন্ধ্যা ৫-১৮ মিনিটে দেহ রাখলেন।

সকালে মার কাছ থেকে দুজন ব্রহ্মচারী এসেছেন একটি চন্দনের মালা নিয়ে—মা দিয়েছেন। তাঁরা এসেছেন কনখল থেকে। বিরজানন্দজী ও নির্মলানন্দজী। তাঁরা গুরুজীর কত প্রিয়, আবার কত আপন মা আনন্দ-ময়ীর। ঠিক একদিন আগেই এসেছেন শ্রীপানু ব্রহ্মচারীজী—গুরুজীর সঙ্গে এঁদের যে কি গভীর সম্পর্ক, আজ কোন নতুন সম্বন্ধ নয়, বহু দিনের সে সম্বন্ধ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের।

পানুদা ইঙ্গিতে বললেন, মার কথার ভাবে যেন বোঝা গেল বাবার শরীরটা এ-যাত্রা আর থাকছে না। পানুদা কিন্তু কর্তব্যে অটল রইলেন। ডাক্তার চ্যাটার্জি ও ডাক্তার মুখার্জি অত্যন্ত ভালবাসা ও আন্তরিকতায় কি সেবা করলেন! কাজে কোনো ত্রুটি নেই। ক্রমাগত দু দিন দু রাত তাঁদের চোখে ঘুম নেই, নেই বিশ্রাম। ক্লান্তিও দেখা গেল না কারো। গোপাল মজুমদার, শ্রীধর, জগদীশ্বর, দিদি, সীতারামজী, শশী সবাই বসে আছেন পাশে। কখনো জয়গুরু, জয়মা ধ্বনি উঠছে, আর ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গাজল দেওয়া হচ্ছে মুখে। কান্না, স্তব্ধতা, ভয় মেশানো পরিবেশ। গুরুজী তখনো সচেতন। পায়ে ইনজেকসনের সূচ বিঁধলে মুখে ব্যথার কুঞ্চন। নাড়ীর গতি চলছে স্রোতের ধারার মতো, আবার কখনো স্থির স্পন্দনেও। মনে হয়, হয়ত স্বাভাবিক। আবার সারা শরীর ঘামে ভিজে ঠাণ্ডা, হিমশীতল।

হাসপাতাল আসার আগেই দুটো কানেই ভাঁজ পড়েছে। আমাদের মনে হল এ কিসের লক্ষণ?

কাশীনরেশ বিভূতিনারায়ণ সিংহ এলেন ১১ই বিকেলে। আচার্য-

দেবকে জানাল কেউ। গুরুজী শুনলেন সেকথা। হাত উঠল আশীর্বাদের ভঙ্গীতে। উনি রইলেন কিছুকাল।

পূর্ণিমা কাটল ৯-৩০ মিনিটে। পানুদা আমাকে বললেন—ওঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ইংরেজী ও হিন্দীতে লিখে রাখতে, প্রেস থেকে চাইবে।

আমি ব্যস্ত রইলাম প্রায় চারটা পর্যন্ত। হাসপাতালে পৌঁছলাম প্রায় পাঁচটায়। হঠাৎ ওঁর মুখ থেকে রক্ত উঠল খানিকটা। তারপর সব বাঁধন খুলে দেওয়া হল। তারপর সব শেষ।

দেহটিকে নিয়ে আসা হল আশ্রম প্রাঙ্গনে।

একটি মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ ঘটল।

আচার্যদেব তাঁর মনীষীজীবনের স্বীকৃতিরূপে নানা লৌকিক সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি সম্মানের প্রার্থী ছিলেন না। কিন্তু সম্মান তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এদের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১· মহামহোপাধ্যায় — ভারত সরকার ৪ঠা জুন, ১৯৩৪
২· কোরোনেশন মেডেল — ভারত সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭
৩· ডি· লিট — এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭
৪· ডি· লিট্ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬
৫· সার্টিফিকেট অব অনার — রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫৯
৬· ফেলোশিপ — বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪
৭· পদ্মবিভূষণ — ভারত সরকার ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৪
৮· ফেলোশিপ — এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬৪
৯· ডি· লিট্ — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৫
১০· সাহিত্য বাচস্পতি — হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, ১৯৬৫
১১· সর্বতন্ত্র সার্বভৌম — গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৭
১২· ফেলোশিপ — বম্বে এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৯

এ ছাড়া তিনি সাহিত্যিক পুরস্কার দুটি গ্রন্থের জন্য লাভ করেন। একটি সাহিত্য অকাদমী থেকে এবং অন্যটি উত্তরপ্রদেশ সরকার থেকে। এ ছাড়া বহু বিশিষ্ট পদক ও প্লেক্ নানা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত হন।

আচার্য বিদ্যাগুরু গোপীনাথ

আচার্যদেবের অধ্যক্ষতা কালে (১৯২৪—১৯৩৭) একদিকে যেমন নানা বিদ্বত্তা পূর্ণ গবেষণার কাজ চলতে থাকে, অন্যদিকে তাঁর সাধু সন্দর্শনও বাড়তে থাকে। তিনি সাধুজনের সম্পর্কও তত্ত্বজ্ঞানের পথ বলেই মনে করতেন। বিভিন্ন সাধকের প্রকৃতি অনুসারে তাঁদের আধারে যে তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে তা যে রহস্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ ধারাই হবে এ বিশ্বাস তাঁর কোনোকালেই ছিল না, তাই সাধুজীবনের ব্যক্তিগত ধারা কোনো বিশিষ্ট সাধনক্রমের সঙ্গে মেলাবার প্রয়াস তিনি কখন করেন নি। নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস বর্জন করে তিনি তাঁদের ধারার সত্য রূপটি হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন বলেই কোথাও তথ্যের বিকৃতি যেমন ঘটে নি, অন্যদিকে তাঁর দেখা তত্ত্ব ও তথ্য যথাযথ রূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়েছে।

তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—'তত্ত্বরূপী ভগবান তো এক ও অখণ্ড, তা সত্ত্বেও মানুব নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে খণ্ডভাবে তাঁহাকে ধারণা করার চেষ্টা করে। ইহা স্বাভাবিক। এই জন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পথও এত বিচিত্র। কেবল বিচিত্র নয়, কখনো কখনো বিরুদ্ধও প্রতীত হয়। কিন্তু বিরুদ্ধ প্রতীত হইলেও তাহারা বিরুদ্ধ নয়।'

এইকালে আচার্যদেবের মনীষীরূপ দেখার সৌভাগ্য অনেকের হয়েছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন হয়েছেন। তাঁরা যদি কখনো তাঁদের সংস্মরণ লেখেন তবে আমরা তাঁর আচার্যরূপের কিছু চিত্র পেতে পারি, কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব হবে?

তিনি প্রতিদিন কিভাবে চলতেন তার একটা বিবরণ আমরা গ্রন্থের একটি অংশে দিয়েছি। তাঁর কাছে প্রতিদিন বহু মানুষের আগমন ঘটত, তার মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু তত নয়, যত গবেষক বিদ্যার্থীর। কিন্তু তাদের ভিড় থাকলেও তিনি সময় করে বিদ্যার্থী অথচ জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থীকে নিয়ম করে শাস্ত্র গ্রন্থের পাঠ দিতেন।

আচার্য বলদেব উপাধ্যায়জী এ সময়কার একটা বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখছেন যে আচার্যদেব কোনো গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রদানকালে বিষয়ের সঙ্গে এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে তাঁর শরীর-বোধ পর্যন্ত থাকত না। বিশেষ ক্লিষ্ট বিষয়ও অতি অনায়াসে অন্যের হৃদয়ে পৌঁছে দেবার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। দর্শন, ধর্ম, যোগ ও তন্ত্র, বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বহু অজ্ঞাত ও অল্পজ্ঞাত রহস্য কথা, ভক্তি ও রসশাস্ত্রের গম্ভীর চমৎকারিতা তাঁর

প্রবচনে প্রকাশ পেত। তিনি রহস্যের অন্তস্তলে পৌঁছে তার ব্যাখ্যা করতেন। এই ছিল তাঁর বিশিষ্টতা।

কবিরাজ মহাশয়ের কাছে কোনো গ্রন্থের পংক্তিবন্ধ আলোচনা করা অথবা অধ্যয়ন করা সম্ভব হত না। তাঁর অলৌকিক প্রতিভা পংক্তিতে বন্ধ না থেকে উন্মুক্তভাবে বিষয়ের আলোচনা করে গ্রন্থের ও পংক্তির আশয়রূপ নবনীত শ্রোতার নিকট উপস্থিত করতেন।

উপাধ্যায়জী প্রসঙ্গ ক্রমে আরও বলেছেন যে মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেবার কাশীতে দুর্গাপূজা করেন তখন তিনি কবিরাজ মহাশয়ের বিদ্বত্তায় এত মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি অর্থ ও খ্যাতির প্রলোভন ত্যাগ করে কাশীতেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন।

কোনো সাধুপুরুষকে প্রথম দর্শনেই এবং তাঁর সঙ্গে অল্প দু-চারটি কথা বলেই চিনে নেওয়া তাঁর কাছে সহজ ছিল। তিনি নিজে সন্ত ছিলেন, তাই 'সন্ত হী সন্ত কো পহঁচানতে হৈঁ।'

তাঁর যে প্রবচন চলত তাতে যে তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি ও বিচারই প্রধান সাধন ছিল তা নয়, তিনি বোধের উদার ভূমি থেকে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর 'স্বসংবেদন'ই এক সুদৃঢ় সাক্ষ্য।

তিনি বলছেন, 'জপ যজ্ঞ কি? আজ হঠাৎ প্রত্যক্ষ হইল বদরীনাথজীকে বুঝাবার সময়। স্থূলে এইভাবেই সূক্ষ্ম হয়—সূক্ষ্ম কারণে আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া পড়ে। মনে হচ্ছিল নাভির দিকে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। এ অগ্নি চিন্ময়। আমরা সাধারণতঃ যা কিছু নাম বা জপাদি করি, সব ইড়া পিঙ্গলায় শ্বাস চলার সময়। সুষুম্নায় কেহ জপ করিতে পারে না, উহা আপনা-আপনি হয়। ইড়া-পিঙ্গলার বায়ু স্থূলভাবে চলে—জপও স্থূল, শব্দও স্থূল। কিন্তু ঐ শব্দ গুরুদত্ত বলিয়া উহার ভিতরে সত্ত্বশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। অন্য শব্দেও আছে—মাত্রা কম। বারবার স্থূলভাবে শব্দ উচ্চারণ করা মানেই ঐ শব্দকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেওয়া। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ঐ কুণ্ডে শব্দ পড়িলেই শব্দের স্থূলাংশ বা তামসাংশ ঐ অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। সূক্ষ্মাংশ বা সত্ত্বাংশ সুষুম্নার পথে আপনিই উপরে উঠিতে থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্মের বিবেচন ঐ অগ্নিতে হইয়া থাকে। স্থূল শব্দ সুষুম্না পথে উঠিতে পারে না।

ফলতঃ যতই জপ করা যায়, ততই সত্ত্বশক্তির কণা ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া সঞ্চিত হয়। বেশী পরিমাণ হইয়া গেলে ধ্যান সমাধি আপনিই আসে।'*

আচার্যদেবের জীবনে যে জ্ঞান স্রোত সতত প্রবহমান ছিল তার দুটি ধারা লক্ষিত হয়, একটি লৌকিক অপরা বিদ্যার ধারা এবং অন্যটি অলৌকিক

* স্বসংবেদন, ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৪-৭৫।

পরা বিদ্যার। তিনি যেখানে অপরা বিদ্যার আলোচক সেখানে তিনি রহস্য সন্ধানী ও গম্ভীর তত্ত্বের আলোচনায় পারংগত মনস্বী। অধ্যক্ষতা কালে তিনি যে বিদ্যার আলোচনায় ও নানা নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত সেখানে বিশ্বের বিপুল সাহিত্য ভান্ডার তাঁর কাছে এক দিগন্ত বিস্তৃত অধ্যয়নক্ষেত্র, সেখানে তাঁর মনন ও অনুশীলন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বিশ্বের বহু গ্রন্থ সম্যক্ উদ্ধরণই এর প্রমাণ। তাঁর রচিত একটি ছোট নিবন্ধ পাঠ করলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হতে পারে।

আচার্যদেবের অধ্যাপনাশৈলীর কথা অনেকে বলেছেন। অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্যদেবের কথা বলেছেন: দিনের পর দিন তাঁর কাছে কত মানুষের আগমন ঘটত। তিনি জ্ঞানের ভান্ডার উজাড় করে সর্বজন নির্বিশেষে বিতরণ করতেন, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিচার নেই, জিজ্ঞাসা থাকলেই হল। তাঁর ছিল নির্বিচারে বিশ্বাস—সব তো শিবময়। কেউ যদি সাধন-সম্পত্তি বিহীন হয়েও উচ্চ অধিকারী রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তাতে দোষ কোথায়? সবই তো শিবরূপ সুতরাং তাতে অবিশ্বাসের কি আছে?

তাঁর পাতঞ্জল যোগের অপূর্ব ব্যাখ্যানের কৌশলের কথা উল্লেখ করে বলেন—এ কোনো টীকাকারের ব্যাখ্যার বিবরণ নয় অথবা ভাষ্যের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ নয়, এ হল প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আচার্যদেব বলতেন—এই নবীন আলোক তিনি লাভ করেছেন শ্রীশশিভূষণ সান্যালের কাছে।

তাঁর অখন্ড দৃষ্টির আলোকে কোনো দার্শনিক বিচারের অবমূল্যায়ন হয়নি। প্রত্যেক প্রস্থানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে তাতে যতটুকু সত্য বর্তমান সম্যক্ নিরূপণ করে তাকে তার যথাস্থান দিয়েছেন। আবার সেই বিশেষ প্রস্থানের দৃষ্টিভঙ্গী কি, কোথায় তার বাস্তব তাৎপর্য তাও নির্দেশ করেছেন। শাঙ্কর বেদান্তের উল্লেখ করে বারবার ঐ দৃষ্টির এক-দেশীয়তা দেখিয়েছেন, তবে এ কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে শঙ্করাচার্য যে বিশ্বাতীত স্বরূপকে বোঝাতে চেয়েছেন তা পরবর্তী ধারণায় কিভাবে বিকৃত হয়েছে। আচার্যদেবের বিরোধ সেইখানে।

সাংখ্যের কৈবল্যে তিনি যে ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন যোগের কৈবল্যে সে বিরোধ পরিহারের পথ খুঁজে পেয়েছেন 'সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধি সাম্যে কৈবল্যম্' এই সূত্রে। এটি পরমকৈবল্য। এই কৈবল্যে প্রকৃতির পরমশুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তখন পুরুষ থেকে প্রকৃতির বিয়োগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রকৃতি তখন চিন্ময়ী, সে সময় পুরুষ প্রকৃতিতে সামরস্য সম্পন্ন হয়।

আচার্যদেবের প্রবচনশৈলীর কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন, 'সেদিন ষড়্দর্শনের ধাপগুলি বড় সুন্দর ভাবে বলিতেছিলেন। , আমাদের দেশে দর্শনের গতি ঠিক পাহাড়ের সারকুইটাস মুভমেন্ট-এর মত আগাইয়া গিয়েছে। তাই পাহাড়ের এক প্রান্ত হইতে যাহা ভিজিবল্, অন্য প্রান্তে

তাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের কোনো নামগন্ধ নাই, ন্যায়ে আসিয়া ঈশ্বর দেখা দেন। আবার সাংখ্যে ঈশ্বর লুকাইয়া যান, পুনরায় পাতঞ্জলে আবির্ভূত হন। মীমাংসায় আবার ঈশ্বর চলিয়া যান, দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়েন, শেষে বেদান্তে আবার নয়নগোচর হন। কিন্তু যে ঈশ্বর প্রথম দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যান, পরে যখন আবার তাঁকে দেখা যায় তখন তাঁর সে রূপ থাকে না, তিনি আর এক হায়ার ফর্ম-এ দেখা দেন। নৈয়ায়িকের ঈশ্বর কর্মফলদাতা মাত্র। সাংখ্য বলিলেন, কর্মফল প্রকৃতি হইতেই আসিবে। প্রকৃতিই সব ফল যথাযথ প্রসব করিবে, সেজন্য তোমার ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। পাতঞ্জল বলিলেন, প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞান তো আসিবে তাঁহা হইতে, নতুবা 'তারক' জ্ঞান কে দেবে? তাই গুরুরূপে তাঁকে চাই—'পূর্বেষা মপি গুরুঃ'। তাই পাতঞ্জলের ঈশ্বর আসিলেন জ্ঞান-দাতারূপে, গুরুরূপে। মীমাংসা বলিলেন—গুরু আমার বেদ, ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? শেষে বেদান্ত আসিয়া দেখাইলেন বেদের স্বয়ংপ্রকাশ তার মূলেও তিনিই। সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া চলে না। এমনি করিয়া আমাদের দর্শনের ধারায় ঈশ্বর উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতররূপে একবার করিয়া অন্তর্হিত হইয়া আবার প্রকাশ পাইয়াছেন।

মুক্তির কনসেপসন-এও ঠিক তাই। বৈশেষিকের মুক্তি দুঃখনিবৃত্তি—নেগেটিভ, আবার ন্যায়ের মুক্তিতে সুখাভিব্যক্তির আভাস মিলে। উহা পজেটিভ। সাংখ্যে আবার দুঃখ নিবৃত্তি, পাতঞ্জলে প্রত্যক্ চেতনাধিগম। মীমাংসায় আবার নেগেটিভ, শেষে বেদান্তে আনন্দে পর্যবসান।'*

আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তির উপায় প্রসঙ্গে একদিন বলছিলেনঃ 'আত্মা স্বাতন্ত্র্যময় ও অখণ্ড মহাপ্রকাশস্বরূপ। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার নিরাকার নির্গুণ স্বরূপকে গ্রহণ করিতে হয়, তারপর তাঁহার সাকার অথবা সকল দিককে গ্রহণ করা আবশ্যক। আত্মার নিরাকার স্বরূপ বিশ্বাতীত কিন্তু তাঁহার সাকার স্বরূপ বিশ্বাত্মক। উহা ব্যষ্টিরূপে, সমষ্টিরূপে এবং মহাসমষ্টিরূপে গ্রহণীয়। এই বিবিধ স্বরূপ প্রাপ্তির পরে আত্মার পরম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই পরমস্বরূপে সাকার নিরাকার, সকল নিষ্কল, সবিশেষ নির্বিশেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া যায়। ইহার পর যোগের পথ খুলিয়া যায়। যোগে যখন ঘনীভূত ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ হয় তখন তাহার উর্ধ্বে অন্বয় অবস্থার আবির্ভাব ঘটে।'

এই প্রসঙ্গে আচার্যদেব তিনটি গতির কথা উল্লেখ করতেন, একটি দক্ষিণাবর্ত, অন্যটি বামাবর্ত এবং সর্বশেষ সরলগতি। যোগী দক্ষিণাবর্তক্রমে এই সাকার জ্ঞেয়রূপে বিশ্বকে অতিক্রম করে নিরাকার জ্ঞানস্বরূপে উপনীত হন এবং পরিশেষে নিরাকার আত্মসত্তা লাভ করেন। বহু সাধক এই নিরা-

* পত্র প্রসাদ, পৃঃ ৩২-৩৩।

কার আত্মদর্শনকে সাধনার চরম লক্ষ্য মনে করেন, কিন্তু আচার্যদেব এই স্থিতিকে আত্মার 'পৃষ্ঠদর্শন' নামে অভিহিত করেন এবং একে সাধনার অনুলোম গতি বলেন।

তিনি বলেন, 'সদ্‌গুরুর কৃপা থাকিলে যোগী এই স্থানে না থামিয়া মোড় ঘুরিয়া বামাবর্ত গতিতে চলিয়া নিজ স্বরূপের নিকট উপস্থিত হইতে পারে।'

এর ফলে কি হয় সে কথার উত্তরে বলেন, 'দক্ষিণাবর্ত ক্রমে যে জ্ঞেয়রূপী বিশ্বের জ্ঞানে বিলয় হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরুত্থান হয়, কিন্তু উহা তখন জড় না থাকিয়া চিন্ময় হইয়া যায়। যখন সমস্ত বিশ্ব তাহার চিন্ময় রূপ লইয়া পুনরায় উত্থিত হয় তখন, বিশ্বাত্মক আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার 'সম্মুখদর্শন'।

কিন্তু এখানেও গতির শেষ নয়। এতদিন ছিল আবর্তগতি কিন্তু এবার যে গতি তার নাম দিয়েছেন সরলগতি। এই গতি অনেকটা সুষুম্নার সরল-গতির অনুরূপ। এই সরলগতির দ্বারা পূর্ণসত্তার দর্শন ঘটে, কিন্তু প্রথমে থাকে ব্যবধান। এই ব্যবধান কাটে কিভাবে তার উত্তরে বলেন, 'পূর্ণ-স্বরূপের নিরন্তন অনিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিতে করিতে এই ব্যবধানও দূরীভূত হয় এবং উপাস্য উপাসকের যোগ আরম্ভ হইয়া থাকে। তারপর যোগ-প্রক্রিয়ার গাঢ়ত্ব আসিলে উপাসক উপাস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং উপাস্য উপাসকে। তখন উভয়ে সমরসতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই যোগের পরা-কাষ্ঠা। ইহার পর সামরস্যও থাকে না। উহারও অতিক্রম হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার পূর্ণস্থিতি।'

আচার্যদেবের এক বিশেষ পরিচয় তিনি প্রগাঢ় বিদ্বান ও মনীষী, কিন্তু বিদ্বত্তা ও মনীষা তাঁর বাইরের পরিচয়। তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় অনুসন্ধিৎ-সুর, যে অনুসন্ধান তাঁকে ভারতীয় রহস্যশাস্ত্রের মূল সূত্রকে অধিগত করতে সাহায্য করেছে এবং তাঁর জীবনধারাকে নবরসে উজ্জীবিত, সঞ্জীবিত ও সঞ্চালিত করেছে। অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিগূঢ়-মর্ম এভাবে অধিগত করে ক'জন বিদ্বান এর পূর্বে তাকে নিজ জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করেছেন তা অনু-সন্ধানের বিষয়। শাস্ত্র কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় মাত্র না থেকে তাঁর নিকট পরমার্থপথের সঙ্গী হয়েছে। সেইজন্য দেখতে পাই সব শাস্ত্রের মর্মার্থ কত সহজে তাঁর আধার হতে প্রকাশিত হয়েছে।

যাঁরা সাধারণ মানুষ অথচ যাঁদের জিজ্ঞাসা বর্তমান তাঁদের জিজ্ঞাসায় আচার্যদেব কত সরল ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করতেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। অনেকের মনে হয়েছে মনীষাই বুঝি শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবি-কাঠি। বুদ্ধি যদি শাস্ত্রালোচনায় ও বিশ্লেষণে শাণিত হয়ে ওঠে তাহলে হয়ত এভাবেই গূঢ়রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। কিন্তু এ-বিচার যে যথার্থ নয় তা কিন্তু অল্প আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা অনেক সময় অধ্যাত্ম সাধনার নানা শব্দের সঙ্গে পরিচিত হই

এবং বিভিন্ন ক্রমের কথা শুনি। সেসব শব্দ ও ক্রমের কথা শুনে আমরা অবশ্যই বিস্মিত হই কিন্তু তার রহস্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই সহজে ঘটে না, ফলে আমরা এক প্রকার অস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলি।

আমরা শুনেছি কারো হয়ত সুষুম্না খুলে গেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন ওঠে যার সুষুম্না খুলেছে সে কি প্রাপ্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে—না তার আরো কিছু প্রাপ্তব্য আছে? প্রচলিত শাস্ত্র গ্রন্থে যদি এর উত্তর খুজতে হয় তাহলে অন্বেষক বৃথাই খুজে বেড়াবেন, কিন্তু আচার্যদেব কিভাবে বলতেন তাঁর কথাতে এখানে তা উল্লেখ করছি।

'মধ্যমার্গে কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই বুঝিতে হইবে যে স্থূলদেহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও সূক্ষ্মদেহের প্রথম স্তরে প্রবেশ ঘটিয়াছে। তখন শ্বাস কাল-নাড়ীকে পরিহার করিতে আরম্ভ করে ও সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধঃ-উর্ধ্ব সঞ্চরণ করিতে থাকে, বহির্জগতের স্মৃতি তৎকালে লুপ্তপ্রায় হয়, কিন্তু ভিতরের চৈতন্য উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে।'

এর পর যে স্থিতির উদয় হয় সে প্রসঙ্গে বলেন—

'পরবর্তী ভূমিতে সুষুম্নার অন্তঃস্থিত বজ্র-নাড়ীতে প্রবেশ হয় ও সূক্ষ্মদেহের প্রথম স্তর হইতে নিষ্ক্রান্তি হইয়া দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান হয়। তখন বজ্রানাড়ীর শাখা-প্রশাখাতে সঞ্চরণ হইতে থাকে।'

এটি সূক্ষ্মদেহে সঞ্চরণের কথা। আমরা ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু আচার্যদেব বলেন,—

'ইহার পর চিত্রিণীতে প্রবেশ লাভ হয়। বজ্রানাড়ীর অভ্যন্তরে ইহার স্থিতি। সেখানে প্রবিষ্ট হইলে সংশয়হীন জ্ঞানের উদয় হয়, হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয় ও বিকল্পময় অশুদ্ধ জীবভাব কাটিয়া যায়। ইহাই সূক্ষ্মদেহের তৃতীয় স্তরে বিশ্রাম লাভ।'

তারপর সৌভাগ্যক্রমে আরো গতি হলে কি হয় তার উত্তরে বলেন, 'চিত্রিণীর অন্তঃস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ হইলে নিজেকে হৃদয় হইতে দ্বাদশান্ত (ব্রহ্মরন্ধ্রই মহাশূন্য) পর্যন্ত স্পন্দনশীল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ব্রহ্মনালে স্থিতি, শুদ্ধ কারণদেহে বা মহাকারণদেহে অবস্থান এবং জগজ্জননী মায়ের কোলে বিশ্রাম। বিশুদ্ধ অমৃতই এখানকার ভোগ্য। ইহার উর্ধ্বে আর ভোগ নাই, তখন চৈতন্যময় স্থিতি ও প্রশান্তি। তখন বস্তুভোগ ও শান্তি অথচ স্থিতি ও ক্রিয়ার ভেদও কাটিয়া যায় অর্থাৎ সব থাকিয়াও যেন কিছুই থাকে না।'

একদিন বিকল্পের কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন, বায়ুই বিকল্পের কারণ, তাকে সম না করতে পারলে বিকল্প উঠবেই। প্রাণ ও অপানের ধারা রুদ্ধ করতে না পারলে বিকল্প আসা স্বাভাবিক। যদি নিয়ম করে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এক সময় স্থির বা সমভাব আসবে। ঐ সমতা আসছে কিনা, তার লক্ষণ হল হয়ত বিদ্যুতের ছটার ন্যায় আলোর কণা চোখের

সামনে তীর বেগে যাতায়াত করবে। তারপর এক সময় ঐ আলোর কণা স্থির হয়ে দাঁড়াবে ভ্রূমধ্যে। তখন ঐ আলোর ধারা ধরে অগ্রসর হতে হবে। তখন দেখা যাবে যে এই যে বিস্তৃত জগৎ তা ভাসছে এক আলোর সমুদ্রে। সে আলোর কোনো ধারণাই নেই তোমাদের, কিম্বা সাধনজগতে যারা কিঞ্চিৎ প্রবেশ করে নি, কল্পনায়ও আনতে পারে না। জগতের কোনো আলো দিয়ে তাকে বোঝানো যায় না। যে বিদ্যুতের ঝিলিকের কথা বললাম, তা ঐ আলোর সহস্র লক্ষ কণিকার একটি কণা মাত্র। তারপর ঐ আলোর ধারা তোমার সত্তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ঐ আলোর সমুদ্র ভেদ করে। এভাবে চলতে চলতে তুমি পৌঁছবে সহস্রারে। ঐ সহস্রারের কোনো ধারণা তোমার আছে কি, হেমেন্দ্র ?

আমি চুপ করে রইলাম। উনি বললেন, যদি তুমি সেখানে পৌঁছও তাহলে দেখবে কূলে নেই কিনারা নেই, অনন্ত এক নীল জলরাশি, তাতে ফুটেছে এক কমল। সহস্র তার অর—সূর্যের সহস্র অরের যেমন অনন্ত বিস্তার তেমনি। কিন্তু তারও ভেদ হয়। তারপর উন্মনী। ঐ উন্মনীতে মনের যে ক্ষীণ মাত্রা বর্তমান তাকেও শেষ করতে হয়। তারও আগে আছে খণ্ড শিলষ্ট, কলা যুক্ত। এখনও তো অখণ্ড নয়, নিষ্কল। নিষ্কল অবস্থায় উপনীত হয়ে যদি ফিরে আসে কেউ তাহলে সে পাবে নিজের মধ্যে সবকে এবং সবের মধ্যে নিজকে। আনাপানের সহজ পথে এই পরমপ্রাপ্তি ঘটতে পারে।

একদিন ব্রহ্ম, গুরু, ও শিষ্যের প্রসংগ করছিলেন। বললেন, ব্রহ্ম, গুরু ও শিষ্য মূলতঃ একই আত্মস্বরূপ। কিন্তু যেখানে ব্রহ্ম, গুরু ও শিষ্য এই তিনটি পৃথক সত্তার কথা বলা হয়, সেখানে ভেদ না থাকলেও ভেদ কল্পনা করা হয়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক থেকেও তাতে অনন্ত ভেদ কল্পিত হতে পারে। ব্রহ্ম বস্তুতঃ স্বরূপস্থিতিরই নামান্তর, গুরুও তাই—কিন্তু ব্রহ্ম তাঁর নিজস্ব রূপকে জীবের নিকট অনাবৃত করেন না। তবে তাঁর নিজস্ব রূপ যাঁর কাছে অনাবৃত সেইটি তাঁর গুরুরূপ। মনে কর, ব্রহ্ম যেন মধু অর্থাৎ আনন্দ-সমুদ্র, ঐ আনন্দসমুদ্র আস্বাদন করেন গুরু এবং শুধু তাই নয়, ঐ আনন্দ-মধু শিষ্যের সত্তায় সঞ্চারিতও করেন ঐ গুরু। যিনি নির্বিকল্প ব্রহ্ম-স্থিতিতে স্থিত থাকেন, তিনি মধু হয়ে যান একথা সত্য, কিন্তু ঐ মধু তিনি না পারেন আস্বাদ নিতে কিম্বা অপরকে আস্বাদ দিতে, তাই তিনি সদ্গুরু পদবীতে আরূঢ় হতে পারেন না।

যদি কোন জীবন-মুক্ত পুরুষ লোক ব্যবহারের প্রতি উন্মুখ হন তবে তিনি নির্বিকল্প স্থিতি অক্ষুন্ন রেখেই শুদ্ধ বিকল্পের ভূমিতে বিহার করতে পারেন।

একদিন ত্রিশক্তির উপাসনার রহস্য কথা বলছিলেন, 'আমাদের দেশে শাক্ত-

উপাসনার যে ক্রম বর্তমান তাতে কালী, তারা ও ষোড়শী এই তিনটির প্রধানতা লক্ষিত হয়। শাক্ত সাধকগণ পরমাস্থিতিকে মহাশূন্যের অতীত বলিয়া মনে করেন। আমার মনে হয় শাক্ত সাধকগণ মহাশূন্য ভেদ করিবার জন্য সন্নদ্ধ হইয়া ক্রমদীক্ষার মার্গে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া পূর্ণত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ণত্বের পথে যাইতে হইলে মহাশূন্য ভেদ করা একান্ত আবশ্যক।'

এই মহাশূন্য কি এ প্রসঙ্গে বললেন, 'সাধনপথে চলিতে হইলে এই স্থূল দেহ এবং স্থূল জগৎ ভেদ করিয়া অন্তর্মুখ ও উর্ধ্বমুখ গতিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়, লক্ষ্য থাকে আত্মসাক্ষাৎকার, কিন্তু লক্ষ্য প্রাপ্তির পূর্বে ভাবময় জগতের উর্ধ্বে মহাশূন্য সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাকে ভেদ করা আবশ্যক। স্থূল সূক্ষ্মাদি সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ মহাপ্রলয়ে ও অতিমহাপ্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ শূন্যরূপ ধারণ করে। শূন্যের পরেও গভীরতর শূন্য আছে। এইজন্য শূন্যেও বৈচিত্র্যসম্পন্ন। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন শূন্যের মধ্যে যেটি চরম ও পরমশূন্য তাহাকে এইখানে মহাশূন্য নামে বর্ণনা করিতেছি। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা ব্যাপিনী সত্তার অন্তর্গত।

মধ্যযুগের সন্ত মহাজনগণ সকলেই এই শূন্যের কথা জানিতেন। এই মহাশূন্য ভেদ করা চিৎশক্তির সাহায্য ভিন্ন সম্ভব নয়। এইজন্যই মনে হয় পূর্ণ দীক্ষার পর ক্রমদীক্ষার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পূর্ণাভিষেক শাক্তাভিষেকের পরে সম্পন্ন হয়। ইহাতে মন্ত্রের প্রাধান্য থাকে কিন্তু উপাস্য কালী মহাপ্রলয় অথবা অতিপ্রলয়ে আভাসমান শক্তিস্বরূপই কালী। তখন বিশ্বশ্মশানভূত এবং ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দক্ষিণাম্নায়ে ইহার উপাসনা হয়। ইহার পর ক্রমদীক্ষা অভিষেকের পর তারিণী বা তারাবিদ্যা উপাস্যা হন। এইভাবে ইচ্ছা ও ক্রিয়ার নিষ্পত্তি পূর্ণ হইয়া গেলে দক্ষিণাচার সিদ্ধান্তাচারে পরিণত হয়। যোগিগণ এইটিকে ত্রিপাদ-সাধনার অন্তর্গত মনে করেন। মন্ত্রের সাধনা এখনও রহিয়াছে। কালী ও তারা এই উভয় শক্তি আপন আপন কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহার পর সাম্রাজ্যদীক্ষাভিষেকের সময় আগত হয়। এই উপলক্ষ্যে উপাস্যরূপে আবির্ভূত হন ত্রিশক্তির অন্তর্গত তৃতীয়া অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরী। এইটি পরাপ্রকৃতির উপাসনা। এই সময় কামকলা রহস্য জানা আবশ্যক। ইচ্ছা ও ক্রিয়ার পর এই স্থানে জ্ঞানভাব উদিত হয়। বলা বাহুল্য এখানে সাধনার মধ্যে জ্ঞানেরই প্রাধান্য। এই অবসরে পঞ্চকূট দীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এগুলি সবই সাম্রাজ্যদীক্ষার স্তর। ইহার পর মহাসাম্রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। ইহার লক্ষ্য অর্ধনারীশ্বর। এই অবস্থায় অর্ধাম্বিকেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। দার্শনিক দৃষ্টিতে এইটি ভেদাভেদের অবস্থা। এখানে আর মন্ত্রের প্রাধান্য নাই। এখানে লয় প্রধান। ইহার পর যোগদীক্ষাভিষেক ঘটিয়া থাকে। তখন জীব পঞ্চভূত হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে যোজনাপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর পূর্ণ দীক্ষাভিষেক।

এইখানে যোগের পূর্ণত্ব ঘটিয়া থাকে। ইহার পর সর্বান্তে মহা-পূর্ণদীক্ষা যাহার পর আর কিছু নাই। আচার্যগণ বলেন মন্ত্রযোগে মহাভাবের উদয় হয়, মহাভাবের পর মহালয় এবং অন্তে যোগ প্রতিষ্ঠা।'

আচার্যদেবের যোগ সাধনার ক্রম বুঝতে হলে এই আলোচ্য ক্রমটি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, আমরা তাঁর সাধনাক্রমের আলোচনায় আবার এ প্রসঙ্গে আসব।

তত্ত্বপ্রসঙ্গ

আচার্যদেবের অধ্যাপনা রীতির একটু পরিচয় আমরা পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি, এখন আমরা তাঁর বিবৃত তত্ত্ব প্রসঙ্গের কয়েকটি নমুনা এখানে দিলাম। এগুলো লেখক নানা সময়ে তাঁর কাছে শুনে লিপিবদ্ধ করে। তাঁর অসংখ্য তত্ত্ব কথার এগুলো ভগ্নাংশ মাত্র, তবু এ সবই সাধনজীবনে পরম উপযোগী বিবেচনায় এখানে সংযোজিত হল।

স্বরূপ প্রাপ্তির উপায়

আত্মা স্বাতন্ত্র্যময় ও অখণ্ড মহাপ্রকাশ স্বরূপ। তাহাকে লাভ করিতে হইলে প্রথমে তাহার নিরাকার নির্গুণ স্বরূপকে গ্রহণ করিতে হয়, তারপর তাহার সাকার সগুণ অথবা সকল দিককে গ্রহণ করা আবশ্যক। আত্মার নিরাকার স্বরূপ বিশ্বাতীত কিন্তু তাহার সাকার স্বরূপ বিশ্বাত্মক। উহা ব্যষ্টিরূপে, সমষ্টিরূপে এবং মহাসমষ্টিরূপে গ্রহণীয়। এই ত্রিবিধ স্বরূপ প্রাপ্তির পরে আত্মার পরমস্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই পরমস্বরূপে সাকার নিরাকার, সকল নিষ্কল, সবিশেষ নির্বিশেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া যায়। ইহার পর যোগের পথ খুলিয়া যায়। যোগে যখন ঘনীভূত ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ হয় তখন তাহার উর্ধ্বে অন্বয় অবস্থার আবির্ভাব ঘটে।

এই দৃষ্টি অনুসারে সর্বপ্রথমে বিশ্বভেদ করা আবশ্যক। ইহা দক্ষিণাবর্ত ক্রমে করিতে হয়। যোগী আত্মা সম্মুখে দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানশক্তি সমূহকে নির্মল করিতে করিতে অগ্রসর হন। জ্ঞান যতদিন পর্যন্ত মলিন থাকে ততদিন পর্যন্ত বাহিরের ভানও থাকে, আবার উহা নির্মল হইতে থাকিলে বাহির তিরোহিত হইয়া যায় এবং পরিশেষে জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গেলে বাহিরে জ্ঞেয়ের ভান থাকে না। যোগিরাজ পতঞ্জলি এই স্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'জ্ঞানস্য আনন্ত্যাদ জ্ঞেয়মল্পম্।' অর্থাৎ জ্ঞান অনন্ত হইয়া গেলে অর্থাৎ ভাসমান জ্ঞেয় তিরোহিত হইয়া যায়।

ইহার তাৎপর্য এই যে যোগ মার্গের প্রারম্ভিক অবস্থায় উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান যে-ক্রমে নির্মল হইতে থাকে ঠিক সেই-মাত্রায় জ্ঞেয়ের সঙ্গে একাকারত্ব সাধিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ বিশ্ব আকাররহিত হইয়া নিরাকার আত্মসত্তার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। ইহারই নাম বিশ্বভেদ।

এই বিশ্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রভৃতি নানা আকারে গঠিত। ইহা বিকাশের

ক্রমানুসারে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু যোগীর অগ্রগতির সংগে সংগে তাহার জ্ঞান নির্মল হইয়া গেলে তাহার প্রভাবে এই সাকার বিশ্বজ্ঞানরূপে ভাসিত হইয়া পরিশেষে নিরাকার আত্মসত্তায় পর্যবসিত হইয়া যায়। ঐ সময় জ্ঞাতা আত্মা নিজেকে জ্ঞেয়রূপে লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতা তিনিই তখন নিরাকাররূপে জ্ঞেয় হইয়া যান। বহু সাধক এই নিরাকার আত্মদর্শনকে সাধনার চরমলক্ষ্য মনে করিয়া এই খানেই স্থিতিলাভ করেন, কিন্তু ইহা আত্মার 'পৃষ্ঠদর্শন' মাত্র। দক্ষিণাবর্ত গতির ইহা চরম ফল এবং ইহাকে সাধনার অনুলোমগতিরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

সদ্‌গুরুর কৃপা থাকিলে যোগী এই স্থানে না থামিয়া মোড় ঘুরিয়া বামাবর্ত গতিতে চলিয়া নিজ স্বরূপের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। এই গতির নাম বিলোম গতি। তখন পূর্বে দক্ষিণাবর্ত ক্রমে জ্ঞেয়রূপী বিশ্বের জ্ঞানে বিলয় হইয়া গিয়াছিল তাহার পুনরুত্থান হয়। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে এই পুনরুত্থান চিন্ময় স্বরূপে ঘটিয়া থাকে। প্রথমে বিশ্ব মায়িক-অচিৎ অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন ছিল। বিলোমগতি না হইলে জড় বিশ্ব নিবৃত্ত হইয়া নিরাকার আত্মস্বরূপে স্থিত হইত, কিন্তু গুরুকৃপায় পুনর্বার গতি লাভের ফলে অস্তগত বিশ্বের পুনরুদ্ধার সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উহা তখন জড় না থাকিয়া চিন্ময় হইয়া যায়। এবার লয়ের মার্গ সমাপ্ত হইয়াছে। এই স্থিতিতে অস্তগত বিশ্ব পুনরায় আবির্ভূত হয়। পরিশেষে যখন সমস্ত বিশ্ব তাহার চিন্ময় রূপে লইয়া পুনরায় উত্থিত হয় তখন বিশ্বাত্মক আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার 'সম্মুখদর্শন', এবং ইহাই বিশ্বাত্মক আত্মার সাকার দর্শন। প্রথমে আত্মা তাহার নিরাকার স্বরূপ লাভ করিয়াছিল, তখন বিশ্ব ছিল নিরাকার আর এখন আত্মার নিত্য সাকাররূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা উভয়েই পরস্পর ভিন্ন—এক আত্মার অনুলোম গতির ফল, আত্মার পৃষ্ঠরূপ এবং দ্বিতীয় আত্মার বিলোমগতির ফল, আত্মার সম্মুখরূপ।

এই উভয়রূপই বাস্তবিক পক্ষে একই আত্মার অখণ্ডরূপের অন্তর্গত যাহার দর্শন সরলগতির অনুসরণ করিয়া ঘটিয়া থাকে। সে সময়ে গতির আবর্তন থাকে না। দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত সমাপ্ত হইয়া যায়। যখন গতির আবর্ত থাকে না তখন সরলগতি খুলিয়া যায়, যাহার ফলে কেন্দ্রস্থিত বিন্দুর অখণ্ডরূপে দর্শন হইয়া থাকে। যেরূপ যোগমার্গে ইড়া ও পিঙ্গলার আবর্তগতি—উহা দক্ষিণাবর্ত কিম্বা বামাবর্ত যাহাই হউক না কেন, শেষে যেমন সুষুম্নার সরলগতি দ্বারা আত্মার পূর্ণরূপের দর্শন ঘটিয়া থাকে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই অখণ্ড সাক্ষাৎকারে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ক্ষোভ চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই সরলগতির দ্বারা পূর্ণসত্তার দর্শন হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু প্রাপ্তি তখনও হয় না, কেন না দ্রষ্টা ও দৃশ্য, উপাস্য ও উপাসকের ভেদ তখনও থাকে। কিন্তু

বক্রগতি নিবৃত্ত হইবার ফলে পূর্ণসত্যের সাক্ষাৎকারে যে ছিল বাধক তাহা এখন নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবধান তখনও আছে। এই ব্যবধান দূর না হইলে যোগ সম্ভবে না। পূর্ণ স্বরূপের নিরন্তর অনিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিতে করিতে এই ব্যবধানও দূরীভূত হয় এবং উপাস্য উপাসকের যোগ আরম্ভ হইয়া থাকে। তারপর যোগ প্রক্রিয়ায় গাঢ়ত্ব আসিলে উপাসক উপাস্যে অনুপ্রবিষ্ঠ হয় এবং উপাস্য উপাসকে। তখন উভয়ে সমরসতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে—

'শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ'

ইহাই সামরস্য। ইহাকে শিব বলিলে উভয়েই শিব, শক্তি বলিতে চাহিলে উভয়েই শক্তি। উভয়েই সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। এই সামরস্যকে পৌরাণিকগণ সাযুজ্য নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাই যোগের পরাকাষ্ঠা। ইহার পর সামরস্যও থাকে না। উহারও অতিক্রম হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার পূর্ণ-স্থিতি। সেখানে সবকিছু আছে; অথচ কিছুই নাই। ইহাতে পরিপক্বতা আসিলে আত্মা অচল স্থিতি লাভ করে।

আত্মদর্শন

তোমার প্রশ্নের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা রহিয়াছে। তুমি এখানে দর্শনের কথা বলিয়াছ, জ্ঞানের কথা নহে। দর্শন ও জ্ঞান একটি অনুভূতির দুটি দিক। যোগপথ ও জ্ঞানপথ আয়ত্ত হইলে অনুভূতিটি পূর্ণতাসম্পন্ন হয়। জ্ঞানহীন দর্শন ও দর্শনহীন জ্ঞান উভয়ই অসম্পূর্ণ। আমরা সাধারণতঃ দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। তদনুসারে দর্শন ও জ্ঞানে বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয়। লৌকিক ও ব্যবহারিক জগতে কোন বস্তুর দর্শন হইলেও তাহার জ্ঞান না হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নি-কর্ষ, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ এবং আত্মার সহিত মনের সন্নিকর্ষ এই সকল না থাকিলে প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। তাহা ছাড়া সহকারীরূপে আলোক প্রভৃতি নিমিত্তের আবশ্যকতা আছে। এই সব কারণ সম্মিলিত হইলে দর্শন ব্যাপার সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও বস্তু-বিষয়ক পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন হয় না। ইহা অতি সাধারণ কথা। লৌকিক দৃষ্টিতে দর্শন হইলেও ইন্দ্রিয় জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ দর্শন হইলে বস্তুর একটি দিক মাত্র সাক্ষাৎকৃত হয়, দেশভেদ ও কালভেদকৃত অন্যান্য দিক আচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। তা ছাড়া স্থূল বস্তুর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বিবিধ গুণ সত্ত্বেও শুধু রূপেরই সাক্ষাৎ হয়। সুতরাং জ্ঞান যে পরিচ্ছিন্ন তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া কালাব-চ্ছিন্নভাবে দর্শন হয় বলিয়া একটি বিশিষ্ট ক্ষণেরই দর্শন মাত্র হয়, অতীত ও অনাগত অবস্থার দর্শন হয় না। এই জাতীয় বহু প্রকার অবচ্ছেদ (লিমিটে-শনস) রহিয়াছে। জ্ঞান সম্বন্ধে অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে মনের সম্বন্ধ

অতি ঘনিষ্ঠ। মনের একাগ্রতা যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদনুসারে জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর। ইহাই হইল লৌকিক দর্শন ও জ্ঞানের কথা। উভয়ত্রই অর্থাৎ দর্শন এবং জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই 'ইদং'রূপে ভান হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মদর্শন এবং আত্মজ্ঞান এই জাতীয় নহে।

অখণ্ড মহাপ্রকাশই আত্মার স্বরূপ। তাহাকে 'অহং'রূপে উপলব্ধি করাই আত্মার উপলব্ধি। অহংরূপে উপলব্ধি না করিতে পারিলে ব্যাপক মহাশূন্যরূপে উপলব্ধি করিলেও তাহাকে আত্মোপলব্ধি বলা চলে না। সাধারণতঃ সবিকল্পকভাবে আত্মার উপলব্ধি আত্মজ্ঞানরূপে পরিচিত। ঐ উপলব্ধি বিকল্পশূন্য হইলে তাহা হয় আত্মদর্শন। আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে চরম অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের কোন কার্যকারিতা থাকে না। ইহা হইল একপক্ষের কথা। এতদ্‌ভিন্ন আরও একটি পক্ষ আছে। সেদিক হইতে আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে চিৎশক্তির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সংস্কারযুক্ত হইলে এবং তৎপূর্বে আত্মা নির্বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইলে (শ্রীগুরুর মহাকরুণা হইতে) মনোভূমিতে এবং ইন্দ্রিয়ভূমিতে দর্শন সম্ভবপর হয় এবং জ্ঞানও সম্ভবপর হয়। যখন সর্ববৃত্তির নিরোধ হইয়া যায় অথচ আত্মাতে একীভূতরূপে প্রকাশ-শক্তির উদয় না হয়, তখনও আত্মদর্শন হয় না। নিরোধের ফলে ভাগ্যবশতঃ বিবেকের প্রভাবে চিদুন্মেষ স্পষ্টীভূত হইলে তাহাকে আত্মস্বরূপে বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভবপর, কারণ তখনই সংগে সংগে অনাত্মরূপে গুণ সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। ইহার পরই গুণ সম্বন্ধ হইতে পৃথক্‌কৃত আত্মভাবের সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু আত্মরূপে নহে—গুণসম্বন্ধ-বর্জিত আত্মরূপে। ইহা আত্মার কেবল অবস্থার দ্যোতক। ইহা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেও আত্মরূপে আত্মসাক্ষাৎকার নহে। ইহা নির্গুণ-আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার। কিন্তু আত্মভাবের উদয় এখানে সম্ভব নহে। আত্মভাবের উদয় হইলেই তাহা আর 'কেবল' অবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহারই নাম অস্মিতা। ইহার একমাত্র কারণ চিদ্রূপা আত্মশক্তির বিকাশের অভাব। এই আত্মশক্তির বিকাশই শুদ্ধবিদ্যারূপ মহানুগ্রহের একমাত্র ফল। এই প্রকার অনুগ্রহপ্রাপ্ত আত্মা শুধু 'কেবল'রূপে নিজেকে দর্শন করেন না, কিন্তু অহংরূপে দর্শন করেন। ইহাই মহাশক্তির খেলা। এই প্রকার আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে ইহারই নাম হয় পরমাত্ম দর্শন। কারণ এই স্থিতিতে পরমাত্মাকে দর্শন করা এবং নিজেকে দর্শন করা একই কথা।

কিন্তু মূলে এক ভিন্ন দুই নাই, কিন্তু এক হইলেও এই অচিন্ত্য চিদ্‌রূপা আত্মশক্তির প্রভাবে সর্বভাবে নিজেকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব রহিত দর্শন ও ভাবযুক্ত দর্শন উভয়ে পার্থক্য আছে। ভাবযুক্ত দর্শনের মধ্যে মহাভাবযুক্ত দর্শন ও খণ্ডভাবযুক্ত দর্শনেও পার্থক্য আছে। এই অনুভূতির পৃষ্ঠভূমিতে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় বুঝিতে হইবে। ভাববর্জিত জ্ঞান শুষ্কজ্ঞান, ভাবযুক্ত জ্ঞানই মহাভাবের মধ্য দিয়া রসে পরিণতি লাভ করে।

এই জন্যই যদিও আত্মস্বরূপে এক ও অভিন্ন তথাপি 'আমি-তুমি' ভাবের মধ্য দিয়া অনন্ত প্রকার রসের আস্বাদন সম্ভবপর হয়। তাহাতে ঐশ্বর্যের স্ফুরণ হইতে পারে এবং ঐশ্বর্যহীন মাধুর্যেরও স্ফুরণ হইতে পারে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী অবান্তর ভাবসকলেরও স্ফুরণ হইতে পারে। আত্মা যখন শক্তি-সম্পন্ন তখন শক্তির প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র বিশ্বও ভাসমান হয়। মায়াশক্তির দিক দিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় আত্মদর্শনে সমগ্র মায়িক জগতেরও দর্শন হইতে পারে। কারণ মায়া আত্মারই বহিরঙ্গ শক্তি। তদ্রূপ আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জীবজগতেরও দর্শন হইতে পারে। কারণ জীব মাত্রই আত্মারই তটস্থ শক্তি। বিশ্বজগৎ যেমন আত্মার বহিরঙ্গ শক্তি হইতে উদ্ভূত তেমনি জীবজগৎও তটস্থ শক্তি হইতে উদ্ভূত। তদ্রূপ আত্ম-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত নিত্যধামেরও দর্শন হইতে পারে। কারণ নিত্য-ধামসকল আত্মার অন্তরঙ্গ বা স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত। এই সকল নিত্যধাম মায়ার অতীত এবং কালেরও অতীত। কিন্তু নিত্য হইলেও এই সকল আত্ম-শক্তিরই বিলাস। তবে ঐ শক্তি বহিরঙ্গা শক্তি নহে কিংবা তটস্থা শক্তি নহে, কিন্তু স্বরূপভূতা শক্তি যাহা সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। পূর্ণ আত্মদর্শন হইলে কিছুই বাদ যায় না বা উপেক্ষিত হয় না।

আর একটি কথা, ভাববর্জিত আত্মদর্শনে মহাভাবের স্ফুরণরূপে লীলা-ধামের দর্শন ঘটে না। মায়াযুক্ত আত্মদর্শনে বিশ্বের দর্শন এবং অনন্ত জীবের দর্শন সম্ভবপর হয়। কারণ বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠাতা আত্মা। তবে একটা কথা আছেঃ আত্মদর্শন সংকুচিত আত্মার এবং সংকোচ-হীন আত্মারও হইতে পারে। সংকুচিত আত্মদর্শন এক প্রকার বিবেকমূলক, বিকাশময় আত্মদর্শন যোগমূলক; অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মা নিজেকে যখন মায়া হইতে অথবা তটস্থ জীবশক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া অন্তর্মুখে আত্মদর্শন করে তখন উহা মায়াহীন এবং তটস্থ আত্মহীন দর্শনরূপে পরি-গণিত হয়। কিন্তু যখন শক্তিসহকারে শক্তিমান আত্মার দর্শন করে তখন আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই গৌণভাবে হইলেও মায়ারাজ্য অথবা তটস্থ রাজ্যেরও দর্শন হইয়া থাকে। বিশ্বব্যাপার মায়ামূলক, ইহা বহি-র্মুখী শক্তি। আত্মার স্বরূপস্থিতি—ইহা জ্ঞানমূলক। এই জ্ঞানের প্রভাবে কৈবল্যাদি বিভিন্ন অবস্থা আত্মার উপলব্ধিগোচর হয়। এই উভয় স্থলে কর্ম ও জ্ঞানের যে স্থান আছে ভাবের সে স্থান নাই। কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের ন্যায় ভাবেরও একটা রাজ্য আছে। সেই ভাবরাজ্যের দর্শন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ভাবের ভাবুক ও রসিক ভক্তবৃন্দের দর্শন মহাভাবের বিকাশ না হইলে হয় না। মহাভাব হ্লাদিনী শক্তিরই ব্যাপার। হ্লাদিনী শক্তি এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সন্ধিণী ও সংবিৎ শক্তির নির্যাস স্বরূপ। সুতরাং হ্লাদিনী শক্তিসমন্বিত আত্মার দর্শন আত্মার পূর্ণ দর্শন বলিয়া এক হিসাবে গণ্য হইতে পারে। ইহাই নিত্যলীলারাজ্যের স্বাভাবিক উল্লাস। এতদ্-

ব্যতীত শক্তিবিরহিতভাবে আত্মদর্শন হইতে পারে। শক্তি-বিরহিত বলিলে বুঝিতে হইবে অনন্ত শক্তি আত্মাতে অন্তলীনভাবে রহিয়াছে, তাহাদের অভিব্যক্তি নাই। এইরূপ আত্মদর্শন স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নামান্তর। তোমার যাবতীয় শংকার সমাধান ইহা হইতেই হইতে পারিবে।

আধ্যাত্মিক কাশী

ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁহার এক স্তোত্রে বলিয়াছেন—'সা কাশিকাহং নিজ-বোধরূপা'। আমরা ক্ষেত্ররূপে যে কাশীর সহিত পরিচিত তাহা পৃথিবীর একটি ভূক্ষেত্র। রচনার বৈশিষ্ট্যবশতঃ এই ভৌমকাশী মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাশীতে মরণমাত্রে মুক্তি লাভ হয়—ইহা প্রসিদ্ধ। এই কাশী ভারত-বর্ষে উত্তরবাহিনী গঙ্গার তটে অবস্থিত, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অবশ্য উত্তরকাশী দক্ষিণকাশী প্রভৃতি অন্যান্য কাশীর কথাও পাওয়া যায় এবং তাহাদেরও মহিমা আছে। কিন্তু উত্তরবাহিনী বরুণা ও অসীর সঙ্গম-স্থলে যে কাশী বর্তমান তাহার অসামান্য মহিমার কথা বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই কাশী অজ্ঞানীর জন্য। স্থানের প্রভাবে এই ক্ষেত্র জীবকে মুক্তি দিয়া থাকে ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যে কাশীর কথা বলিয়াছেন তাহা একমাত্র জ্ঞানীরই প্রাপ্য। সাধুগণ বলেন যে, ভৌমকাশীতে মরণকালে ভগবান শঙ্কর মুমূর্ষুকে ইষ্ট-নাম দান করেন এবং তাহার ফলে জীবের ঊর্ধ্বগতি হয়। এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা যে কাশীর কথা বলিতেছি তাহা নিজবোধরূপ অমনস্ক কাশীধাম। তাহা পাইতে হইলে সদ্‌গুরুর কৃপাতে মায়াতীত যোগমায়ার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুক্ষেত্র প্রথমে লাভ করিতে হয়। এই বিন্দুই অর্ধমাত্রা যাহা সদ্‌গুরুরূপে পরমেশ্বরের কৃপায় লাভ হইয়া থাকে। জীব জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির আবর্তন হইতে উদ্ধার হওয়ার জন্য যোগমায়ার দ্বারা রচিত এই অর্ধমাত্রার পথে চলিতে থাকে। সে যতই অগ্রসর হয় ততই কালসম্বন্ধ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। সে প্রথমে যে ভূমিতে প্রবেশ লাভ করে সেই ভূমির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর। তাহাতে অবস্থিতি আসিলে সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি সিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধাবস্থার প্রারম্ভ। তখন বিশ্বের যে জ্ঞান তাহার বোধে ভাসে তাহা লৌকিক জ্ঞানের অনুরূপ নহে—তাহা তুরীয় জ্ঞান। সেখানে কালের সম্বন্ধ বদ্ধ জীব অপেক্ষা কম। তারপর ক্রমশঃ নিরোধিকা ভেদ করিয়া নাদ ও নাদান্তে প্রবেশ হয়। ইহা উচ্চতর জ্ঞান। এই অবস্থায় পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই অহংজ্ঞানের বিকাশ বোধে ভাসে। নাদান্তের পর ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ হয় এবং শূন্যে প্রবেশ হয়। তখন মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়ার অবসান ঘটে এবং পরিশেষে তাহারও অতীত অবস্থায় মহাশূন্যে প্রবেশ হয়। ইহার নাম ব্যাপিনী কলা। এই অবস্থায়

সাধক সর্বব্যাপক, অবশ্য দেশ কাল ও মনের সম্বন্ধ তখনও থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ কম হইয়া আসে। সমনা-শক্তির স্তরে অর্থাৎ মহামায়ার দ্বারদেশে দেশ ও কাল অতিক্রান্ত হয় এবং মনেরও সম্যক পরিত্যাগ হইবার উপক্রম ঘটে। তখন থাকে সবই কিন্তু আভাসরূপে। ইহাই সমনাভূমি এবং ইহাই বিশ্বের কেন্দ্রস্থান। কিন্তু ইহা পূর্ণত্বের অভিব্যঞ্জক নহে। ইহার পর পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হইলে উন্মনীশক্তির আবির্ভাব হয়। এই উন্মনীশক্তি আত্মাকে পরমপদে পৌঁছাইয়া দেয়। সেখানে কালের কলন নাই, মনের স্পন্দন নাই, দেশেরও কোন স্থান নাই। ইহাই নিষ্কল পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি স্থান। তখন শিবশক্তি স্পন্দ-অস্পন্দের কোন স্থান থাকে না। এক অখণ্ড-সত্তা শিবরূপে আত্মাকে গ্রহণ করে। আত্মা কৈবল্য অথবা নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেও শিবত্ব লাভ করে না। আবার মহামায়ার রাজ্যে শিবত্ব লাভ করিয়াও উন্মনা লাভ করে না বলিয়া প্রকৃত শিবত্ব লাভ ঘটে না। শুধু নির্বাণ লাভ করিলে শিবত্ব লাভ হয় না আবার সমগ্র বিশ্বের সম্রাট হইলেও শিবত্ব লাভ হয় না। ভগবান শঙ্করাচার্য সেই শিবত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

'সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা।'

অর্ধমাত্রার রহস্য

প্রঃ। অর্দ্ধমাত্রার রহস্য কথা জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা বুঝাইয়া দিন।

উঃ। অর্দ্ধমাত্রার সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীদুর্গা-সপ্তশতী বা চণ্ডী পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা এই অর্দ্ধমাত্রার সহিত স্বরূপতঃ না হইলেও নামে পরিচিত। ইহা অনুচ্চার্য কেন এবং সাধন অথবা জ্ঞানের পথে প্রয়োজন কেন এই জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। আমি নিজের বোধ অনুসারে তত্ত্বটি আলোচনা করিব। বিষয়টি অত্যন্ত গভীর ও অত্যন্ত রহস্যময়। আমরা জানি আমাদের জাগতিক জীবন তিন ভাগে বিভক্ত। ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে পরিচিত। অন্যান্য সাংসারিক অবস্থা ইহাদের মধ্যে কোনটির অন্তর্গত। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটি লইয়া আমাদের বোধময় জীবন। জ্ঞাতা এক কিন্তু জ্ঞেয় ভিন্ন ভিন্ন। তদনুসারে জ্ঞানেরও স্তরবিন্যাস ঘটিয়া থাকে। জাগ্রৎ অবস্থা স্থূল অবস্থার অন্তর্গত। এই অবস্থায় ভৌতিক জগৎ সাক্ষাৎকার হয়। তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা হয়, যেমন রূপ দর্শনের জন্য চক্ষু, গন্ধ ঘ্রাণের জন্য নাসিকা ইত্যাদি। এই সব ইন্দ্রিয় মনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অর্থসন্নিকর্ষবশতঃ বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য মনের সঙ্গে আত্মার যোগ অবশ্য থাকে। স্বপ্নজগৎ স্থূল নহে, সূক্ষ্ম। ইহার জন্য বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। এই জগতের জ্ঞান অন্তর্মুখ ইন্দ্রিয়যুক্ত মনের দ্বারা হয়, অবশ্য আত্মমনঃ-

সংযোগ পশ্চাতে স্থির ভাবেই থাকে। স্বপ্নদর্শন অথবা ঐ জাতীয় সূক্ষ্ম দর্শন ইহারই অন্তর্গত। সুষুপ্তি অবস্থাতে অথবা ঐ জাতীয় মোহ অবস্থাতে স্থূল, সূক্ষ্ম কিছুরই দর্শন হয় না। তখন অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে একটি শূন্যের আভাস মাত্র থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, বায়ুর ক্রিয়া অথবা মনের ক্রিয়া থাকে না। সুষুপ্তি দুই প্রকারঃ সবেদ্য সুষুপ্তি ও অপবেদ্য সুষুপ্তি। আমরা সাধারণতঃ যে সুষুপ্তির সঙ্গে পরিচিত তাহা একপ্রকার অপবেদ্য সুষুপ্তি। সবেদ্য সুষুপ্তি বলিতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুরূপ সকল অবস্থাই বুঝায়। তথাকথিত নির্বিকল্পক সমাধি এক প্রকার অপবেদ্য সমাধি ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহার পরই জাগতিক জীবনে আবর্তন ঘটিয়া থাকে। কারণ সুষুপ্তিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জাগ্রৎ অবস্থার উদয় হয়। এই প্রকার পুনঃ-পুনঃ ঘটিতে থাকে। এই আবর্তগতিই সংসার। এই আবর্ত বামাবর্ত না হইয়া দক্ষিণাবর্তও যদি হয় তাহা হইলেও ইহা সংসার ভিন্ন অপর কিছু নহে। সরলগতি ভিন্ন সংসারের বাহিরে যাওয়া যায় না এবং সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত সরলগতি লাভ কঠিন। সংসার-ভূমি কালরাজ্যের অন্তর্গত। ইহার যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে তেমনি ইহার বাহিরেও বিভিন্ন স্তর আছে; কিন্তু সরলগতি না পাইলে সংসারের বাহিরের দিকে যাওয়া যায় না এবং সংসার অতিক্রমও হয় না। আমাদের গ্রাহকসত্তার নিকট ইন্দ্রিয় ও মন এ দুটি উপকরণ নিত্য বর্তমান। ইহার পর গুরুকৃপায় শুদ্ধবিদ্যার প্রাপ্তি হইলে প্রজ্ঞাযুক্ত শুদ্ধ মনকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শুদ্ধ মনেরও ক্রমিক শুদ্ধি আছে ইহা মনে রাখিতে হইবে।

আমরা কালরাজ্যের অধিবাসী বলিয়া আমাদের সাংসারিক জীবন কাল-রাজ্যের অন্তর্গত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির উর্ধ্বে সরলগতি প্রাপ্ত হইলে জাগ্রৎ অর্থাৎ প্রবুদ্ধ মনের সাহায্য পাওয়া যায়, তখন কালরাজ্য অতিক্রম করিবার উপায় ক্রমশঃ কার্যকর হইতে থাকে। যাহাকে আমরা তুরীয় অবস্থা বলি তাহা শুদ্ধবিদ্যার পরই আরম্ভ হয়। শুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্তির পর ক্রমশঃ তুরীয় অবস্থার বিকাশ হইতে থাকে। এই বিকাশের পরিণতিতে কোন স্থানে তুরীয়াতীত অবস্থার উদয় হয়। তাহার পর তুরীয়াতীত অবস্থা অতীত হইলে পূর্ণরাজ্যে প্রবেশ হয় বলা চলে। তুরীয়াতীত অবস্থা পূর্ণরাজ্যের দ্বারস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমরা কালরাজ্যে সঞ্চরণ করিতেছি, কিন্তু গতিটি আবর্তগতি। তাই এই গতিতে পুনঃ পুনঃ আবর্তন থাকে। সরল-গতি লাভ করিলে এই আবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। সরলগতিতে যতই কালকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা হয় ততই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ স্থানে কালের মাত্রা অত্যন্ত কম হইলেও উহা কালাতীত নহে। আমাদের সাধনজীবনের চরম উদ্দেশ্য কালের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া কালাতীতে প্রবেশ করা। কারণ পূর্ণচৈতন্যের খেলা কালকে অতিক্রম

না করিলে পাওয়া যায় না। এই জন্য যোগিদিগের অবলম্বিত উপায় কালের রাজ্যের মধ্য দিয়া কালাতীতে প্রবেশ করা।

সত্যের দর্শন মনসাপেক্ষ, অথচ মন থাকিলে পূর্ণ সত্যের দর্শন ঘটে না, উহা মনোময় কল্পনারাজ্যেরই অন্তর্গত হয়। মনের পূর্ণমাত্রা হইতে সংসার দর্শন ঘটে, কিন্তু মনকে দ্বিধা-বিভক্ত করিলে মনের প্রথমার্দ্ধ দ্বারা জগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিময় সংসার অবস্থা গৃহীত হয়। মনের এই অর্দ্ধ আবর্তনশীল। ইহার আবর্তন কোন সময়েই বন্ধ হইতে পারে না। তবে একমাত্র গুরুদত্ত শুদ্ধজ্ঞানের প্রভাবে নিম্নার্দ্ধ পরিত্যক্ত হইয়া পরার্দ্ধ ক্রিয়াশীল হয়। নিম্নার্দ্ধ অজ্ঞানাত্মক মন, পরার্দ্ধ শুদ্ধবিদ্যাযুক্ত মন। এই অবস্থায় যে সত্যের দর্শন হয় তাহাতে সাংসারিক বিকল্প থাকে না। এইটি হইল অর্দ্ধমাত্রা। ইহা এক প্রকার চিৎশক্তিসম্পন্ন মন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই অর্দ্ধমাত্রার মন ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে থাকে। এই ভাঙ্গনের ফলে অর্দ্ধমাত্র মন পাদমাত্রে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য উহাও অর্দ্ধ। পাদমাত্র মন ট্র মনের নামান্তর। এই ক্রম ধরিয়া অগ্রসর হইলে মন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য এখানে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া আছে শুদ্ধ মনের এবং তাহার সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিত চিৎশক্তির। ক্রমশঃ উপরের স্তরে মনের মাত্রা কমিতে থাকে এবং চিৎশক্তির মাত্রা বাড়িতে থাকে। কিন্তু মন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইলেও এই বিভাগের দ্বারা মন শূন্যে পরিণত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মন ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্ব। মনের নিবৃত্তি হইলেই বিশ্বাতীত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভাগ করিতে করিতে মনকে নিঃশেষ করা যায় না। এই যে ক্রমশঃ মনকে ভাগ করার ব্যাপার ইহাই যোগমায়ার খেলা। মনের প্রথমার্দ্ধ যেখানে কাজ করে তাহাকে বলে মায়ারাজ্য, মনের শোধিত দ্বিতীয় অংশ যেখানে কার্য করে তাহার নাম যোগমায়ার রাজ্য। মন যেখানে থাকে না তাহারই নাম বিশুদ্ধ চিদ্‌রাজ্য। উন্মনা অবস্থার প্রভাবে বিশুদ্ধ চিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ হয়। উহাই পরমেশ্বরের বা পরাসংবিদের নিজধাম। উহাকে বিশ্বাতীত বলা হইয়াছে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ ঐ স্থানে যাওয়া যায় না। বিশ্ব অনন্ত, তাহাকে শেষ করিয়া বিশ্বাতীতে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইখানে একটি গভীর রহস্যের ব্যাপার রহিয়াছে। মনকে ত্যাগ না করিতে পারিলে বিশুদ্ধ চিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। যতদূর মনের গতি বিশ্বসত্তা ততদূর পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী। এই যে মনের গতি বা বেগ তদনুসারে বিশ্বসত্তার অনুধাবন ইহাই যোগীর পুরুষকার। কিন্তু ইহা অনন্ত। তাই কোন স্থানে যাইয়া যোগীকে এই অন্বেষণের চেষ্টা হইতে বিশ্রাম নিতে হয়। ইহাকেই বলে সমর্পণ। সমর্পণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাতীত চিদ্‌ভূমি খুলিয়া যায়। এই যোগমায়ার রাজ্যে অর্দ্ধমাত্রার গতি অনুসরণ করিতে করিতে যে যোগী যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহাকে ততবড়

যোগী বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ণত্বের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। যোগীর যোগবলের ক্রমবিকাশ মনের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা মনোনিবৃত্তির উপর নির্ভর করে।

পরিপূর্ণ অবস্থার চিত্রে মনের প্রথমার্ধ নিয়া জাগ্রৎ স্বপ্নময় সংসার রহিয়াছে। তারপর দ্বিতীয় অর্ধ নিয়া ক্রমশোধিত যোগমায়ারাজ্যরূপ শুদ্ধ মনের রাজ্য রহিয়াছে। ইহার পর মনের আত্মসমর্পণ পূর্ণ হইলে মনোনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত চিদুজ্জ্বল পরম স্বাতন্ত্র্যময় পূর্ণসত্য রহিয়াছে। ইহার বাহিরের দিকটা তুরীয়াতীত ও ভিতরের দিকটা স্বরূপস্থিতি। এই পরিপূর্ণ অবস্থাই অখণ্ড অবস্থা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই অবস্থায় আরূঢ় যোগী সকলেই পূর্ণ ও সমান হইলেও তারতম্য-সম্পন্ন। কারণ মনোনিবৃত্তি যে সকলেরই এক স্থানে হয় এমন নহে। মন নিবৃত্ত হইয়া গেলেও চিদাত্মক মন চিচ্ছক্তিরূপ ধারণ করিয়া স্বরূপকে নিরন্তর অনুগমন করিতে থাকে, কারণ তখনকার মন ঠিক মন নহে, ইহা চিচ্ছক্তিরই একটি রেখা মাত্র। যাহা বলা হইল তাহা হইতে যে বিশ্বকে শেষ করিয়া বিশ্বাতীতে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ মন যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ বিশ্বের অভাব কোথায়? বিশ্বকে অভাবযুক্ত না করিতে পারিলে বিশ্বাতীতে প্রবেশ হয় না।

অর্ধমাত্রার রহস্য এখন বুঝিতে পারা যাইবে যে এই অর্ধমাত্রার সাহায্য না পাইলে যোগমায়াময় শুদ্ধজগৎ পাওয়া যায় না। অনেক শুষ্ক জ্ঞানী প্রথমে মনকে পরিহার করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে পূর্ণত্বে প্রবেশ হয় বটে কিন্তু পরিপূর্ণ সত্তার দিগ্‌দর্শন হয় না। এই প্রকার জ্ঞানীর দৃষ্টিতে শুদ্ধ জগতের কোন স্থান নাই। সুতরাং অর্ধমাত্রার বিকাশ ভিন্ন শুদ্ধ জগতের বিকাশ কিভাবে হইবে?

ষট্‌চক্র

সাধকগণের পরিভাষা অনুসারে তৃতীয় নেত্র অথবা জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনই দেহ থেকে অর্থাৎ দেহাত্মবোধ হতে মুক্ত হওয়ার প্রথম নিদর্শন। ষট্‌চক্রের প্রতি চক্রেই এক একটি বিন্দু আছে। ঐ বিন্দুই চক্রের কেন্দ্র এবং ঐ চক্রের অধিষ্ঠাতা চক্রেশ্বর ঐ বিন্দুতে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রতিটি চক্রের বহিরঙ্গ বর্ণ দ্বারা রচিত। তাকে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীরূপা চিৎশক্তির সহায়তায় বিগলিত করে নাদে পরিণত করতে পারলেই চক্রস্থ বিন্দুর প্রাপ্তি সম্ভব হয়। তারপর ব্রহ্মনাড়ীর স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বমুখী স্রোতে তার ঊর্ধ্বগতি সংঘটিত হয়। এইভাবে ছটি চক্রেরই বিন্দু-প্রাপ্তি ও বিন্দুর ঊর্ধ্বগতির ফলে ভ্রূমধ্যের কিছু উপরে শ্রীজ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়। এই অবস্থায় সাধক পঞ্চাশৎ বর্ণ ও তা থেকে উদ্ভূত নাদ অতিক্রমপূর্বক বিকল্পশূন্য একটি বিশুদ্ধ জ্যোতি লাভ করে। এই জ্যোতিটিই বিন্দু, যাহা ভেদ করে ব্যষ্টি জগৎ থেকে সমষ্টি জগতে

প্রবেশ করতে হয়। বিন্দু জ্ঞানাত্মক জ্যোতিস্বরূপ। তাতে জ্ঞেয় ভাবসকল অভিন্নরূপে নিহিত থাকে। এই জ্যোতি লাভ করে এরই অন্তঃস্থিত শূন্যকে আশ্রয় করে যোগী বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করার অধিকার পায়। ভক্ত ও যোগিগণ বুঝবার সুবিধার জন্য বিশ্বকে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও মহাসমষ্টি রূপে তিনভাগে ভাগ করেছেন। ব্যষ্টি বলতে একটি বিশিষ্ট নরদেহ বুঝতে হবে। সন্তগণের পরিভাষায় একে বলে পিণ্ড। সমষ্টি বলতে ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝায়। অসংখ্য পিণ্ডের সমন্বয়রূপী ব্রহ্মাণ্ডই সমষ্টি পদের অর্থ। ব্রহ্মাণ্ড-সংখ্যা অগণিত ও অগণ্য। সমষ্টির দৃষ্টিতে এই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিই মহাসমষ্টিরূপে বর্ণিত হবার যোগ্য। এই পর্যন্তই ভাবসৃষ্টির পরিসীমা। এর পর শূন্য। ভাবময় কোন সত্তাই সেখানে নেই। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই শূন্য বা অভাবও সৃষ্টিরই অন্তর্গত।

ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে যেতে হলে একটি শূন্য ভেদ করে যেতে হয়। আবার তেমনি সমষ্টি থেকে মহাসমষ্টিতে যেতে হলেও শূন্য ভেদ আবশ্যক হয়। এই নিয়ম অনুসারে মহাসমষ্টিরও ভেদ হয় এবং মহাসমষ্টির অতিক্রম সিদ্ধ হলে চরমশূন্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

ষট্‌চক্রের ভেদ সম্পন্ন হইলে সমষ্টিরাজ্যে বা সমষ্টি সত্তায় প্রবেশ ঘটে। মাতৃগর্ভস্থ সন্তান যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন ঐ মাতৃগর্ভই তার নিকট একরাজ্য। কিন্তু মাতৃগর্ভ হতে প্রসব লাভের পর সে আর মাতৃগর্ভস্থ পূর্বরাজ্যে স্থিত হয় না। তখন সে বাহ্যকালের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। এ স্থলেও ব্যাপারটা কিয়দংশে সেইরূপ। যতক্ষণ আত্মা ব্যষ্টি দেহকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ যোগীর প্রথম লক্ষ্যই হয় ঐ অভিমানটি ত্যাগ করে ব্যাপকতর রাজ্যে প্রবেশ করা। অভিমান কিন্তু ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না। কারণ ব্যষ্টির অভিমান ভেঙ্গে গেলেও সমষ্টির অভিমান তাকে পেয়ে বসে। অথবা প্রকারান্তরে বলা চলে, সমষ্টির অভিমানে অভিমানী হওয়া ও ব্যষ্টির অভিমান হতে মুক্ত হওয়া একই সময়ে সংঘটিত হয়। এর সারাংশ এই যে সাধক অথবা যোগী ষট্‌চক্রভেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী হয়ে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি লাভ করতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ড অথবা সমষ্টি সত্তাতেও ষট্‌চক্রের ন্যায় বিভিন্ন কেন্দ্র আছে। পরপর ঐ সব কেন্দ্র স্থানকে অবলম্বন করে যোগীর চৈতন্য উন্মীলিত হতে থাকে। এক পক্ষে এই গতি জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত প্রগতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পূর্বেই জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয়েছে বলেই জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ এবং উত্তরাজ্যে সঞ্চরণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে জ্ঞানের পরেও মহাজ্ঞান আছে। সমষ্টির পর যেমন মহাসমষ্টি আছে এও কতকটা সেইরূপ। এইজন্য জ্ঞানরাজ্য হতে নির্গম এবং মহাজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ উভয়ই আবশ্যক। জ্ঞানরাজ্য হতে নির্গম পূর্ববৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বদিকের বিন্দু ভেদ করে ঘটে থাকে। একেই ব্রহ্মাণ্ডপুরুষের জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন বলে। পিণ্ডস্থ পুরুষের জ্ঞাননেত্রের বিকাশের সঙ্গে এর অনেকাংশে সাদৃশ্য

আছে। এই নেত্রের উন্মীলন না হলে মহাজ্ঞানরাজ্য দৃশ্য হয় না এবং তাতে প্রবেশে সামর্থ্য জন্মে না। মহাজ্ঞানরাজ্য বলতে সৃষ্টির অংগীভূত সমগ্র বিশ্ব বুঝতে হবে। মহাসমুদ্রে খণ্ড খণ্ড দ্বীপমালা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতি দ্বীপ সমুদ্রের জল দ্বারা চারিদিকে ব্যাপ্ত—এই অন্তরালস্থিত জলের অন্তরায় বশতঃ এক দ্বীপের সংগে অন্য দ্বীপের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত সমুদ্রে অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ বিদ্যমান আছে। এ সব দ্বীপের সংখ্যা নির্দেশ সম্ভবপর নয়। এই মহাসমুদ্র বাস্তবিক কারণ-সমুদ্রেরই নামান্তর এবং এ সকল দ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। এ সকল দ্বীপের যে সমষ্টি তাই মহাসমষ্টি। ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা হলেও এই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিরূপ মহাজ্ঞানরাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এর জন্য ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পুরুষের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করে ব্রহ্মাণ্ড হতে নির্গম এবং অন্তরালবর্তী শূন্য ভেদ করে তৎতৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ আবশ্যক। এইমহাসমষ্টি এক হিসাবে 'আদিসৃষ্টি' রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। যাকে কারণ-সমুদ্র-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে তাই বিরাট আকাশ, যাতে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসছে।

বলা বাহুল্য, এ পর্যন্ত অজ্ঞানের খেলা পূর্ণভাবে বিদ্যমান। অবশ্য ব্যষ্টি অজ্ঞান অপেক্ষা সমষ্টির অজ্ঞান সূক্ষ্ম এবং সমষ্টির অজ্ঞান হতে মহাসমষ্টির অজ্ঞান আরও সূক্ষ্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম হলেও অজ্ঞান অজ্ঞানই। মহাসমষ্টির অজ্ঞানই মূল অজ্ঞান। মহাসমষ্টি দেহে অভিমানী পুরুষই আদিজীব। একেই আদিজীব বলা হয়ে থাকে। এর পর আর জীবভাব থাকে না। এই এক জীবই প্রতিবিম্ব ভেদে অনন্তজীবরূপে প্রকাশ পায়।

মহাসমষ্টির অতিক্রমে যে জ্ঞানের বিকাশ তাই পূর্ণজ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে তাই যথার্থ আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানের উদয় হলে আত্মাতে যে অহং-প্রতীতির উদয় হয় তাকে পূর্ণ অহং বলা যায়। এই অহং-এর প্রতিযোগী অন্য অহং থাকতে পারে না। দুর্গাসপ্তশতীতে আছে—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। এটিই অদ্বিতীয় জ্ঞানের সূচক।

কারণসমুদ্রের ওপারে না গেলে এই অদ্বিতীয় অহংপ্রতীতি লাভ করা যায় না। কারণ এই অদ্বৈত অহংভাব বিভক্ত হয়ে সৃষ্টিকালে অহং ও ইদংরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নামে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। এই দুটি ধারা থাকা পর্যন্ত অন্তরালে শূন্যের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য জ্ঞানের পূর্ণতার পক্ষে পর পর সকল শূন্যই ভেদ করতে হয়। আপাততঃ আমরা তিনটি শূন্য গ্রহণ করেছি—শূন্য, মহাশূন্য ও অতি মহাশূন্য। কিন্তু প্রয়োজন হলে বুঝবার সুবিধার জন্য শূন্যের সংখ্যা বাড়ান যেতে পারে। কিন্তু শূন্য যতই হোক না কেন মহাশূন্যের পর আর শূন্য নেই। কেহ কেহ একে আত্যন্তিক শূন্য এবং অনন্ত শূন্য বলে থাকেন। দ্বৈত দৃষ্টিতে এই চরমশূন্যের ভেদ

হয় না এবং সেইজন্য চিৎ ও অচিতের সমন্বয় এবং জীব ও ঈশ্বরের একত্ব-প্রতীতি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে জ্ঞানী বা যোগী এই অন্তিম শূন্যকেও ভেদ করতে সমর্থ হয় সে স্বভাবতই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকে, কারণ সেখানে একমাত্র অহং ভিন্ন ইদং-এর কোন স্থান থাকে না। এই পরমরাজ্যে প্রবেশ করার যে দ্বার তার নাম 'ভ্রমরগুহা'। ভ্রমরগুহা চরমশূন্যের পরে এবং পূর্ণ-সত্যের পূর্বে অর্থাৎ উভয়ের সন্ধিস্থানে অবস্থিত। ভ্রমরগুহা ভেদ হলে প্রকৃত সত্যরাজ্যে প্রবেশ ঘটে। ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং মহাসমষ্টি সবই কালের রাজ্য এবং কালের নিয়ন্ত্রণের অধীন। কিন্তু সত্যরাজ্য যথার্থ গুরুরাজ্য। কালের রাজ্যে মন ও মায়ার খেলা থাকবেই এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলাও অবশ্যম্ভাবী। সেখানে আলো-আঁধার, দিবা-রাত্রি সব দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু গুরুরাজ্য দ্বন্দ্বাতীত। সেখানে দিবারাত্রি নেই, সৃষ্টি সংহার নেই এবং চিৎ অচিতের বিভাগও নেই। সেখানে কাল নেই। তবে হ্লাদিনী শক্তির খেলার জন্য, আনন্দের আস্বাদনের জন্য নিত্যগুরুর অধীন তাঁর কিংকররূপে কাল আছে। কালের রাজ্য কার্যকারণভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি ন্যায়ের রাজ্য। কিন্তু গুরুরাজ্য স্বাতন্ত্র্যময়—এটিই প্রকৃত স্বরাজ। এটি প্রেমের রাজ্য—মহা-করুণার রাজ্য। বস্তুতঃ যা প্রেম তাই কালের দিকে দৃষ্টিপাত সহকারে মহা-করুণারূপে পরিণত হয়। এই গুরুরাজ্যেরও অনন্ত বৈশিষ্ট্য আছে।

ওঁকারের স্বরূপ

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে ওঁকার ও অথ এই দুইটি সৃষ্টির আদি শব্দ। ওঁকার শব্দব্রহ্ম স্বরূপ। পরব্রহ্মেরই বহিঃপ্রকাশ শব্দব্রহ্ম। তিনিই পরাশক্তি-স্বরূপ, এই জন্য উপনিষদে ওঁকারকে পরাশক্তি বা উমা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে শব্দ। ইহাই বাহ্যান্তররূপে ভূরাদি আকার ধারণ করিয়া বিশ্ব রচনা করিয়া থাকে। শাস্ত্র অনুসারে শব্দ পর ও অপর ভেদে দুই প্রকার। পর শব্দই আদি শব্দ বা আদি স্পন্দন, যাহা হইতে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ও ভাবনিচয় বাহিরে প্রকাশ হইয়াছে। অপর শব্দের তিনটি বিভাগ। একটিতে শব্দ ও অর্থ অভিন্নভাবে নিত্য প্রকাশমান। অপরটিতে ঐ শব্দ শুদ্ধ বিকল্পরূপে চিত্তাকাশে স্ফুরিত হইতেছে। তাহার পর ঐ শুদ্ধ বিকল্প বহির্মুখ হইয়া বাহ্য বায়ুর আঘাত প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ শুদ্ধ সংকল্প-রাজ্য ছিল ততক্ষণ উহাতে বাহ্যবায়ুর স্পর্শ ছিল না। তখন দিব্য জ্যোতি ও নাদ দিব্য সম্পদরূপে নিরন্তর চিদাকাশের দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধাবমান।

বাহ্যবায়ুর সংস্পর্শে শব্দ ঘনীভূত হয়, প্রাণের সঙ্গে যোগ হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের উদয় হয় এবং শ্রোত্রগ্রাহ্য স্থূলবর্ণরূপে শব্দ প্রকাশিত হয়। এইটিকে বৈখরী বাক্ বলে। এইটি জীবের বন্ধাবস্থা। এই বিরাট বাহ্য-প্রপঞ্চ ইহারই অন্তর্গত। লোক লোকান্তর সবই বাহ্য বায়ুর অন্তর্গত।

বিশ্বের এই স্তরে দেহের অভিমান স্পষ্টই অনুভূত হয়। শব্দের সাথে তাহার প্রকাশ্য অর্থের কৃত্রিম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শুদ্ধ বিকল্প স্থানে অশুদ্ধ বিকল্পের উদয় হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সুষুম্না একপ্রকার বন্ধ থাকে। এই যে বৈখরী শব্দ তাহা লৌকিক জগতে ভাষারূপে পরিচিত। উহা শুদ্ধ শব্দ নহে। শুদ্ধ শব্দ বৈখরী তো নহেই, অন্তর্বৈখরীও নহে। অন্তর্বৈখরীর পর শুদ্ধ বিকল্পের আভাস জ্যোতির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সময় শব্দের চৈতন্য অনুভূত হয়। মন্ত্রচৈতন্য হইলে ঐ অবস্থা অনুভূত হয়; উহাই জাগরণের সূত্রপাত। তখন মধ্যনাড়ী বা সুষুম্না খুলিয়া যায়, বায়ুর বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত গতি থামিয়া যায়। ইহার পর ঐ শব্দই ক্রমশঃ আদিবাক্ বা পরাবাক্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। তাহাই প্রভূত শব্দব্রহ্ম যাহা পরব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। তখন পূর্ণ অহং বোধের উদয় হয়, সর্বত্রই অহং বিরাজ করে

যোগী ও ঋষিগণ ঐ পরাবাক্‌কেই ওঁকাররূপে নির্দেশ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অতীত, অনাগত, বর্তমান স্থূল ও কারণ তাহা হইতেই উদ্ভূত : এই শব্দমূলক যে জগৎ সৃষ্টি উহা বিশ্বের সকল ধর্মেই কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। খৃস্টানগণের নিউ টেসটামেনট-এ বলা হইয়াছে—দি ওয়ার্ড ওয়াজ উইথ গড—দি ওয়ার্ড ওয়াজ গড। যত প্রকার বীজমন্ত্র শাস্ত্রে প্রচলিত ও অন্যান্য মন্ত্র এই পূর্ণ অহং সত্তা হইতে ফুটিয়াছে, তাহার প্রাপ্তি হইলেই পূর্ণ জাগরণ বা চৈতন্য লাভ হয়।

পৃথিবীর যত ভাষা সকলের মূলে রহিয়াছে বর্ণমালা। বর্ণমালা যেভাবেই সজ্জিত হউক না কেন মূলে একই। এই বর্ণমালা দ্বারা ভাষা রচিত হয়, ভাবের আদান-প্রদান হয়। কিন্তু মূলে যে বর্ণাতীত পাদ রহিয়াছে তাহা বোধের মূল, তাহা প্রত্যেক দেশের বর্ণমালার পৃষ্ঠদেশে বর্তমান রহিয়াছে। তাহার মূলে জ্যোতি। এই জ্যোতিই ওঁকার স্বরূপে পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে ওঁকারই সকল ভাষার মূল। যাঁহারা জপ করিয়া মন্ত্রচৈতন্য করিয়াছেন তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন।

ঐ যে বলা হইয়াছে অশুদ্ধ শব্দ হইতে শুদ্ধ শব্দের দ্বারা অন্তর্জগতে প্রবেশ উহার মর্মগ্রহণ আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি চিত্তের ঊর্ধ্বমুখ-মার্গ খুলিয়া গেলে নাদের প্রকাশ আপনা আপনি ঘটে। বৈখরী অক্ষরের সঙ্গে অথবা শব্দের সঙ্গে অনুস্বার সংযোগ করিলে নিরন্তর জপের প্রভাবে অনুস্বার নাদে পরিণত হয়। নাদে পরিণত হইলে স্থূল আবরণ সব কাটিয়া যায়। তান্ত্রিক প্রক্রিয়াবিশেষের মধ্যে বর্ণ অথবা পদের পর অনুস্বার দিয়া নিরন্তর চিন্তনের ইহাই রহস্য। নাদে উপনীত হইলে বিশ্বব্যাপী স্রোত খুলিয়া যায়, গ্রন্থিবন্ধন সব খসিয়া যায়, ভাবগ্রন্থি, দ্রব্যগ্রন্থি প্রভৃতি নানা গ্রন্থিভাব ভাবের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল অহং বা অহঙ্কার। ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি উহারই প্রকারভেদ। শুধু স্থূল গ্রন্থি নহে, ভাবগ্রন্থিও

কাটিয়া যাওয়া আবশ্যক। দেহাত্মবোধের মূলে যে অহঙ্কার উহা সর্বজন পরিচিত মূলগ্রন্থি। সব গ্রন্থি কাটিয়া গেলে জীব তখন তৎ-তৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে নিজেকে দেখে না। সমস্ত বিশ্ব তখন তাহার আপন হইয়া যায়। গ্রন্থিহীন বলিয়াই তাহাকে মুক্তপুরুষ বলা চলে।

উপায় ও উপেয়-তত্ত্ব

স্বরূপ দৃষ্টিতে গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন কিন্তু ভক্তরূপী জীবের ভক্তি-মার্গের ক্রমবিকাশের দিক থেকে দেখতে গেলে গুরু উপায় স্বরূপ এবং ইষ্ট উপেয়। কারণ গুরুকে আশ্রয় করেই উপেয়ের প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। ইষ্ট-প্রাপ্তি বাস্তবিক পক্ষে মায়া এবং মহামায়া হতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে সংবিৎ-শক্তির রাজ্যে প্রবেশ। প্রকৃতি জড় এবং বাস্তবিক পক্ষে মহামায়াও জড়; কিন্তু সংবিৎশক্তি এ দুয়ের অতীত। শুদ্ধ প্রকৃতিভেদ করতে পারলে কৈবল্য লাভ হয়। সাংখ্য ও যোগের এইটিই লক্ষ্য। মায়া ভেদ করতে পারলেও কৈবল্যেরই প্রাপ্তি ঘটে। বেদান্তের একদেশিগণেরও এটিই লক্ষ্য। শাস্ত্র বলছে বিশুদ্ধ মহামায়া ভেদ করলেও কৈবল্য ঘটে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় কৈবল্য হতে যদিও এটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তথাপি এতেও আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তি ঘটে না। মহামায়া পর্যন্তই জড় প্রপঞ্চের জাল বিস্তৃত রয়েছে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং তার উর্ধ্ববর্তী মায়া হতে মহামায়া শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু এখানেও জড়ত্বের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। বৈষ্ণব আগমে এই মহামায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপে পরিচিত। এই স্থিতি লাভ করার পর ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে, বিশেষতঃ রাগ-মার্গের সাধনার ফলে শ্রীভগবানের বিশুদ্ধরূপে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য লাভ ঘটে। এইটি বাস্তবিক পক্ষে অমনস্ক অথবা উন্মনী অবস্থার সূচক। এই অবস্থায় জগতের যাবতীয় আবরণ হতে মুক্ত হয়ে নির্বাণবৎ প্রশান্ত অবস্থায় অবস্থিতি হলেও ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না।

ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্কল, কিন্তু ভগবৎস্বরূপ নিষ্কল হয়েও অনন্ত কলা-সম্পন্ন। নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার পরমানন্দঘন অখণ্ড অবস্থা। কিন্তু ভগবৎস্বরূপ তত্ত্বদৃষ্টিতে নিষ্কল হয়েও লীলাদৃষ্টিতে অনন্ত কলা-সম্পন্ন। আত্মার ষোড়শ কলা ষোড়শীরূপে এবং তদূর্ধ্বস্থিত অনন্ত কলাসপ্তদশী-রূপে শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অভিব্যঞ্জক। এই কলার সক্রিয় অভিব্যক্তি ব্যতি-রেকে ভক্ত ও ভগবানের অনন্ত মাধুর্যময় প্রেমলীলা সম্ভবপর হয় না। এই প্রেমলীলাতে যোগমায়ারূপা চিৎশক্তির মাধ্যমে লীলাভূমিতে লীলাময়ের অনন্তলীলা প্রকটিত হয়। এটি পৌর্ণমাসী অথবা যোগমায়ার অদ্ভুত রহস্য। কূটস্থ ব্রহ্ম লীলাতীত কিন্তু অনন্ত কলাময় শ্রীভগবান্ লীলারসের রসিক। জীব ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য একাত্মক হইয়াও ভাগবতী দৃষ্টিতে শ্রীভগবানের নিত্য লীলা-সহচর। মায়ারাজ্যে এমন কি মহামায়া ক্ষেত্রেও লীলা হয় না,

কারণ এই দুই রাজ্য কর্মক্ষেত্র ও জ্ঞানক্ষেত্রের প্রতীক। মহামায়া ভেদ করতে না পারলে লীলারাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। লীলারাজ্যে মায়া আছে বটে, কিন্তু তা আছে যোগমায়ারূপে। মায়া এমনকি মহামায়াও আবরণ স্বরূপ। কিন্তু যোগমায়া আবরণ হয়েও স্বরূপের প্রকাশ স্বরূপ। হ্লাদিনী শক্তির খেলাই লীলানামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের লীলাতে প্রতিকূল শক্তির অনুকূল হয়ে থাকে। তাই তখন জীবের আণব সংকোচ জীবভাবের মধ্য দিয়ে মাধুর্যমণ্ডিত হয়; কারণ এই সংকোচ না থাকলে লীলারসের আস্বাদন হয় না। কালের পরিণাম-শক্তি তখন পরিণামহীন স্থিরশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। তাই লীলা-রাজ্যের কাল ধ্বংসকারক কাল নয়, তা হল লীলার সহকারী রূপ। এইরূপ পঞ্চভূতও চিন্ময় রূপে লীলাক্ষেত্রের সহায়ক হয়ে থাকে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে লীলাভূমি মহামায়ারও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থাৎ ভগবল্লীলা নিত্যধামের বিষয় হয়েও খণ্ডকাল ও খণ্ড দেশে ভক্ত-হৃদয় রঞ্জনের জন্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। যাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দের চরিত্র অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা একথা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। দ্রাবিড় দেশের শৈব সম্প্রদায় এবং অড়বাড় নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীভগবানের প্রপঞ্চলীলার সহায়ক ছিলেন প্রসিদ্ধি আছে। সূফীদের ও খৃষ্টীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যেও জগদতীত লোকোত্তর শক্তির অলৌকিক লীলা লোকমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাতন্ত্র্যময়ী চিৎশক্তির নিকট এসব কিছুই অসম্ভব নয়। ভগবৎপরাঙ্মুখ জীব এ সব লীলার কথা শ্রবণ করে ভাগ্য-ক্রমে এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হবে। এবং গুরু ও ইষ্টের মধ্য দিয়ে আত্মার স্বরূপ উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠবে।

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ

সাধুদর্শন

আচার্যদেবের জীবনকথার সঙ্গে তাঁর সাধুদর্শনের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই তাঁর সাধুপ্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তিনি দীর্ঘজীবনে বহু সাধু দর্শন করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়জন বিশিষ্ট সাধু ও মহাত্মার সম্পর্ক তিনি জীবনে শুধু একবার নয় বহুবার বহুভাবে করেছেন। তাঁদের লোকোত্তর জীবনের প্রভাব আচার্যদেব নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি যখন শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কথা বলতেন তখন তাঁর স্বভাবনম্র শ্রদ্ধাপূর্ণ উল্লেখে শ্রোতাও স্বভাবতঃই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আনতচিত্ত হত।

রামঠাকুরের সঙ্গে আচার্যদেবের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় ১৯২৩ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারী। কিন্তু তারও বহুকাল আগে যখন আচার্য গোপীনাথ সংস্কৃত কলেজে বিদ্যার্থী তখন কাশীর বঙ্গ সাহিত্য সমাজ নামক পুস্তকালয়ে যেতেন। সেই সময় কবি নবীন সেন (পলাশীর যুদ্ধের লেখক) রচিত 'আমার জীবন' পড়তে থাকেন। ঐ পুস্তকে 'প্রতারক না প্রবঞ্চক' নামক একটি অধ্যায়ে রামঠাকুরের অদ্ভুত কাহিনীর উল্লেখ দেখেন। সেন মহাশয় যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তখন একদিন তিনি সকালে নিজ কক্ষে সোফায় বসে আছেন এমন সময় দেখতে পান একটি লোক তাঁর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কোথা থেকে এলেন কিভাবে এলেন জানা গেল না। নবীন সেন মহাশয় রামঠাকুর সম্বন্ধে অনের কথা বলেছেন এবং কয়েকটি অলৌকিক কাহিনীও উল্লেখ করেছেন।

আচার্যদেবের সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সূত্রপাত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তীর মাধ্যমে। এই চক্রবর্তী রামঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাঁর কাছেই আচার্যদেব রামঠাকুর সম্বন্ধে বহু কথা শোনেন।

রামঠাকুর কাশী এলে কখনো নারদঘাট, কখনো মানসরোবর, আবার কখনো চিন্তামণি গণেশের কাছে কোনো বাড়ীতে থাকতেন। আবার কাশীর হর-সুন্দরী ধর্মশালাতেও এসে উঠতেন। একবার আচার্যদেবের বাড়ীতে তাঁর বিশেষ অনুরোধে এসেছিলেন। সে সময় প্রায় কিছু খেতেন না বলতে হবে। অন্নভোগ তো নিতেনই না, ফল প্রভৃতিও কম নিতেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রকৃতি অত্যন্ত নম্র ছিল। গলায় তুলসীর মালা, এক-

খানি নামাবলী গায়ে, প্রসন্নতা ও কারুণ্যে ভরা মুখমণ্ডল যেন দর্শকদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকীর্ণ করতেন। লেখাপড়া খুব জানা ছিল না। কোনো মতে বই পড়তেন এবং চিঠি পত্র লিখতেন। তাঁর বিনয় এত ছিল যে আগন্তুক হাত উঠাবার আগেই তাকে প্রণাম করতেন—তাঁকে অভিবাদন করার অবসর পর্যন্ত দিতেন না। তিনি যখন কাশী আসতেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে প্রতিদিন যেতাম। কখনো কখনো তিনি অকস্মাৎ কোথাও চলে যেতেন, কেউ জানত না।'

ঠাকুর মহাশয়ের গুরু ছিলেন একজন দিব্য পুরুষ। তিনি লৌকিক পুরুষ ছিলেন না। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা বলতেন এই মহাপুরুষের নাম ছিল অনঙ্গদেব। তিনি তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করতেন এবং প্রয়োজন হলে ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হতেন।

আচার্যদেব বলতেন, 'আমি শুনেছি যে ঠাকুর মহাশয়ের ধারায় দীক্ষা শব্দের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই ধারায় সাধারণতঃ সাধনমার্গে পথ নির্দেশের জন্য 'নাম' উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। যাকে বাস্তবিক দীক্ষা বলে তা সকলের জন্য সুলভ ছিল না। যিনি দীক্ষা পেতেন, দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেহের পরিবর্তন হত এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হতেন। আরও শোনা যায় যে অনঙ্গদেব স্বয়ং দীক্ষা দিতেন না, সে ভার পড়ত ঠাকুর মহাশয়ের উপর। যখন এই দীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিত ঠাকুর মহাশয় সে সময় লোকচক্ষের অগোচর থাকতেন।'

ঠাকুর মহাশয়ের জীবন অতি অপূর্ব। অতি বাল্য বয়সে তাঁর গুরু সন্দর্শন ঘটে। বারো বছর বয়সে তিনি তাঁর সঙ্গী হয়ে পঁয়ত্রিশ বর্ষকাল হিমালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধাশ্রমে লোকচক্ষুর অগোচরে অতিবাহিত করেন। গুরুর আদেশে লৌকিক দৃষ্টিতে দীর্ঘকাল এক নির্জন বনপ্রদেশে অবস্থান করেন। একদিন গুরু অনঙ্গদেবের সঙ্গে ভ্রমণকালে তিনি জিজ্ঞেস করেন, রাম, এখন তুমি কি করবে?

ঠাকুর মহাশয় বললেন, আমি কিছু জানি না, আপনি যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে।

উত্তর শুনে তিনি বললেন, তাহলে আমাকে ছুঁয়ে এখানে বসে থাক।

ঠাকুর মহাশয় তাই করলেন। গুরুকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তাঁর তন্দ্রাভাব এল। এর পর হল সমাধি। ঐভাবে কতকাল কাটল কে জানে। তারপর গুরু এলেন, বললেন, রাম, ওঠো। রামের সমাধি ভাঙল এ ডাকে। চোখ খুলে দেখেন গুরু সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আর দেখলেন যে সে দেশও নেই, সে কালও নেই। এক গভীর বনে তিনি একলা বসে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্মশ্রু গুম্ফে আবৃত, নখ হয়েছে দীর্ঘ।

আচার্যদেব ঠাকুর মহাশয়ের মুখে তাঁর সিদ্ধাশ্রম দর্শনের কথা শুনে

ছিলেন। এই আশ্রম তাঁর নিজ গুরুদেবের সাধনপীঠ জ্ঞানগঞ্জের মত কোনো স্থান। এ স্থান যোগী ভিন্ন অন্য কারো প্রত্যক্ষগোচর নয়। একটি স্থানের নাম যোগেশ্বর পীঠ এবং অন্যটির নাম কৌশিক আশ্রম। এ দুটি আশ্রমে তিনি এক পরম যোগীর দর্শনলাভ করেন। তাঁর প্রসন্ন, শান্ত উজ্জ্বল মূর্তির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছেন এক দেবীমূর্তি। অনন্ত সৌন্দর্যময়ী সে মূর্তি। তিনি সাক্ষাৎ কুমারী গৌরী। প্রতিদিন একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা এসে নৃত্য ও গানে তাঁদের আরতি করত এবং ফুলের মালা পরিয়ে যেত। ঠাকুর মহাশয় বলতেন, এমন সুন্দর শোভাময় আশ্রম সংসারে আর কোথাও নেই।

এখন থেকে ঠাকুর মহাশয় আরো চারজনের সঙ্গে এক দীর্ঘ অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পার হয়ে যেখানে পৌঁছান সেখানে দিন ও রাতের আলো বা অন্ধকার নেই, গোধূলির আলোর মতো এক স্নিগ্ধ আলো চারিদিকে ব্যাপ্ত রয়েছে। সেই স্থান পার হয়ে একটু অগ্রসর হয়ে দেখতে পান এক দীর্ঘকায় পুরুষ বসে আছেন। তাঁরই শরীরের আলোয় সব অন্ধকার কেটে গেছে। এ স্থান পার হয়ে তাঁরা এক পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করেন—সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল কৌশিক পর্বতমালা। চারদিক বরফে আচ্ছন্ন। যখন তাঁরা কৌশিক আশ্রমে প্রবেশ করলেন তখন ঠাকুর মহাশয় দেখলেন আশ্রমে দশটি আসনে দশজন মহাপুরুষ যুগ যুগ থেকে তপস্যায় নিরত। তাঁদের শরীর অত্যন্ত দীর্ঘ—মনে হয় তাঁরা যেন পাথরের মূর্তি। একমাত্র মুখের লালিমা দেখে মনে হয় তাঁরা সজীব। অক্ষিগোলক লম্বিত চর্মে আবৃত। তাঁদের শরীর দীর্ঘ তপস্যায় চিন্ময়তা লাভ করেছিল।

ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আচার্যদেবের সতের আঠারো বছরের পরিচয়ে গভীর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, এবং বহু তত্ত্বপ্রসঙ্গও হয়েছিল। সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ গ্রন্থের প্রথম ভাগে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তা থেকে যে-প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হয়নি এখানে তার উল্লেখ করা হল। আমরা আচার্য-দেবের উক্তি থেকে ঠাকুর মহাশয়ের দু-একটি তত্ত্বের বিবরণ এখানে উল্লেখ করছি।

দিব্য পুরুষ শ্রীশ্রীরামঠাকুর

মহাত্মা শ্রীশ্রীরামঠাকুরের নাম আজ শিক্ষিত জিজ্ঞাসু-সমাজে সুপরিচিত। তিনি একজন দিব্যপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি নিজে শিক্ষার বর্তমান আদর্শ অনুসারে উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু যাহা মনুষ্যজীবনের পরম লক্ষ্য গুরুকৃপায় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে তাঁহাতে অসীম জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল এবং অজ্ঞানের আবরণ পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে

তাঁহার জীবনধারা অলৌকিক ছিল। তিনি জীবনে পূর্ণ সত্যের যে দিগ্‌-দর্শন করিয়াছিলেন তাহা বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষদিগেরও আলোচ্য। আমি সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর তাঁহার সংগসুখ অনুভব করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার নিকট নানা প্রশ্ন করিতাম, তিনি সরলভাবে ঐ প্রশ্নের সমাধান করিতেন।

তিনি বলিতেন—সম্যক দর্শন লাভ করিতে হইলে ক্রম অনুসারে তিনটি স্থিতি প্রত্যক্ষ করিতে হয়। সর্বপ্রথম স্থিতি অদ্বৈতসত্তা। ইহাই সর্ব-প্রথম আলোচ্য, কারণ সমগ্র বিশ্ব এই পরম অদ্বৈতসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। এই অদ্বৈতসত্তায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে পরম জ্ঞানের প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয় না। অখণ্ড চৈতন্যের সাক্ষাৎকারও অদ্বৈতভাবের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। অদ্বৈত-ভাবের একদিকে দ্বৈত-জগৎরূপ বিশ্বসংস্থান—যেখানে মায়া ও জীবের নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতেছে। জীবের আবির্ভাব, জগতের আবির্ভাব, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের বিচিত্র লীলা সবই অদ্বৈতসত্তার এই দিকে। অদ্বৈতসত্তা হইতেই যাবতীয় সৃষ্টি ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। অদ্বৈত-ভেদের পর পূর্ণ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ হয়। নিত্যলীলাভূমি যোগমায়ার রাজ্য—ইহাই ভগবানের নিত্যলীলা-ধাম। সৃষ্টির মধ্যে যে প্রকার মায়াশক্তির খেলা, সৃষ্টির ঊর্ধ্বে সেইপ্রকার যোগমায়া শক্তির খেলা। যোগমায়া এবং মায়া উভয়ই শক্তিস্বরূপ। মায়ারাজ্যে অজ্ঞানের বিকাশ এবং সেখানে কর্তৃত্ব অভিমানের নিত্য স্ফুরণ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যোগমায়ার রাজ্যে কর্তৃত্ব একেবারেই থাকে না। সেখানে যাহা কিছু ঘটে সবই যোগমায়ার প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। নিত্যলীলা যোগমায়ার অধীন। এই যে লীলা ইহা ভক্তের সহিত ভগবানের লীলা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার অনেক বৈচিত্র্য আছে, কারণ ভাব অনুসারে লীলার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। ঠাকুর মহাশয় বলিতেন যে অখণ্ড পূর্ণসত্তা বুঝিতে গেলে ইহাকে একটি গোলোক স্বরূপে বুঝিতে হইবে। এই পূর্ণ সত্তার অর্থাৎ গোলোকের স্থিতি কালের অতীত। বাস্তবিক পক্ষে যাহাকে কাল বলিয়া বর্ণনা করা হয় সেই কালের স্রোতকে ঠাকুর মহাশয় বিরজানদীর প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করিতেন যাহা পুরাণাদিতে কালিন্দী নামে প্রসিদ্ধ। লীলাক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিসর আছে, তদনুসারে ৮৪ ক্রোশ, ১৬ ক্রোশ এবং ৫ ক্রোশ কল্পিত হইয়াছে। এই পঞ্চক্রোশের অন্তর্গত মুখ্য লীলাকেন্দ্র কল্পিত হইয়াছে—সেটি ভাবের রাজ্য এবং নিত্য তরঙ্গময়। শান্তভাব সেই লীলারাজ্যের বহিঃস্থিত। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই চারিটি ভাবের তরঙ্গ এবং তৎসম্বন্ধ আস্বাদন লীলা-রাজ্যে ঘটিয়া থাকে। লীলার ব্যাপার যোগমায়ার খেলা, তাহাতে ভগবানের কর্তৃত্ব নাই, জীবেরও কর্তৃত্ব নাই। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ'। ইহার তাৎপর্য এই যে ভগবান সর্বত্র প্রকাশিত হন না, কারণ তিনি যোগমায়ায় সমাবৃত থাকেন। যোগমায়া ভেদ

করিতে না পারিলে লীলাপুরুষের সাক্ষাৎকার ঘটে না। এই নিত্যধামের কর্তৃত্ব কাহারও নাই একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি দ্বারা এই নিত্য লীলাভূমিতে প্রবেশ হয় না। এখানে প্রবেশের একমাত্র উপায় শরণাগতি। শরণাগতি আশ্রয় করিলে অর্থাৎ কর্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ করিলে যোগমায়ার কৃপা লাভ হয়। তখন তিনি সকল ভার গ্রহণ করেন। ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই যোগমায়া অবলম্বন করিয়া লীলা আস্বাদন করেন। কালনদী ইহার বাহিরে খেলা করে, তাই ইহা নিত্যলীলা। স্থূল জগতে কালিন্দী বা যমুনা এই কালনদীর প্রতীক।

যে গোলোকের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার যেটি মধ্যবিন্দু তাহাই পরমস্থান। তাহার নাম নিকুঞ্জ। ইহা সমগ্র জগতের কেন্দ্রস্বরূপ। এইখানে লীলার চরম পুষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের স্থিতি অনেক বাহিরে এবং এই প্রকৃতি ও পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই মায়িক জগতের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

সিদ্ধিমা

আচার্যদেব ১৯৩১ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে শ্রীশ্রীসিদ্ধিমার দর্শন পান। তখন আচার্যদেব বড়াদেব মহল্লার সর্বমঙ্গলা লেনের বাড়ীতে থাকতেন। একদিন স্বামী শঙ্করানন্দজী ও বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং কথা প্রসঙ্গে বলেন যে কাশীর খালিশপুরায় এক-জন মা আছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং নিষ্ঠা, ভক্তি ও তন্ময়তা বর্তমান সময়ে খুব কমই দেখা যায়। স্বামীজীর আগ্রহে একদিন তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যান। সেখানে গিয়ে মার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আচার্যদেব অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন।

মা তখন খালিশপুরাতে শিবালয়ের বাড়ীতে ছিলেন। এর পর আচার্য-দেবের নিজের কথাতেই বলি ঃ 'দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একখানা আসনের উপর মা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। মস্তক হইতে পা পর্যন্ত বিশাল অবগুণ্ঠন—ঘোমটার আড়াল হইতে মুখশ্রী দর্শন করিবার উপায় ছিল না। আমরা যাইবার পর তিনি আমাদের দিকে পিঠ করিয়া বসিলেন। বুঝিলাম—নবাগত দর্শকদের নিকট হইতে সংকোচবশতঃ যথাশক্তি আত্মগোপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুখ দেখিতে না দিলেও, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি সংকোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু হইলেও দৃঢ় এবং করুণাব্যঞ্জক মনে হইতেছিল। তাঁহার দর্শন এবং সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিয়াছিলাম। সরলতা, একাগ্রতা, অব্যভি-চারিণী নিষ্ঠা এবং একমাত্র ভগবানের চিন্তাতে সমগ্র জীবনের উৎসর্গ—ইহাই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। সুদৃঢ় বৈরাগ্যের উপর ভগবদ্ ভক্তির সাহায্যে তিনি তাঁহার নিজের জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।'

আচার্যদেব সময় পেলেই তাঁর নিকট যেতেন এবং নানা প্রকার ভগবৎপ্রসঙ্গ

করতেন। সিদ্ধিমা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু দীর্ঘকাল সাধনায় ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সেই অনুভূতি থেকেই তিনি তাঁর সব প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করতেন।

মা এই যুগে কাশীর মতো শহরে যেন প্রাচীন যুগেই বিদ্যমান ছিলেন, বর্তমান সভ্যতার আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয়ও ছিল না। দীর্ঘদিন তাঁর সাধনা গোপনে চলত। যখন তাঁর বাহ্যজীবনে সাধনা ছিল তখন তিনি কাশীর বিভিন্ন মন্দিরে দেবদেবী দর্শন করতেন, নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন ও বাকী সময়ে নির্জনে ভগবদ্ ভজন করতেন। তিনি কুলক্রমানুসারে দীক্ষা লাভ করেছিলেন সত্য 'কিন্তু সে দীক্ষায় তিনি জাগিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব, যতদিন তাঁহার ভক্তিবিকাশের ফলে ঠাকুরের সবিশেষ কৃপালাভ না হইয়াছে, ততদিন হয় নাই।' তারপর যেদিন তিনি কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের পর দেহে চক্রের পর চক্র ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন থেকেই তাঁর প্রকৃত উন্নতির পথ খুলে গেল।

সিদ্ধিমার সাধনধারার বিস্তৃত বিবরণ আচার্যদেব 'শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা' (রাজবালা দেবী বিরচিত) গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তৃত ভাবে দিয়েছেন। এই ভূমিকারই প্রায় সম্পূর্ণাংশ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ২য় ভাগে উদ্ধৃত হয়েছে দেখতে পাই।

তিনি যে একজন অসাধারণ সাধিকা ছিলেন সে বিষয়ে আচার্যদেব তাঁর সাধনক্রমের যে বিবরণ দিয়েছেন তা পড়লে জানতে পারা যায়। কাশীর মানুষ তাঁকে খুব কমই জানত। ১৯৩০ সাল থেকে তাঁর দেহাবসান কাল অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর আচার্যদেব তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে ছিলেন; কিন্তু তারও বহু আগে ১৯১০ সালে তিনি কাশীতে একটি জীর্ণ গৃহে অন্য পাঁচজন ভাড়াটের সঙ্গে বাস করেছেন। সাধারণ গৃহবধূর জীবন ছিল সেই প্রথম সাধন কালে, তারপর যখন তাঁর অন্তর্জীবনের সাধনা আরম্ভ সেদিন তিনি নিঃসঙ্গ, তাঁকে দেখবার, লৌকিক জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্য একদিকে যেমন কেউ ছিল না, অন্যদিকে তাঁর নিজেরও সেদিকে কোনো খেয়াল ছিল না, তখনও দেখি তিনি কি নির্বিকার, কি তাঁর কঠোর তপস্যা, কি কঠিন সাধনা! বিস্ময়ে অবাক্ হতে হয়। যখন সাধনার ক্রমে একদিন তাঁর দেহ-ভেদ হয়ে চিদাকাশে স্থিতি হয় তখন তাঁর শরীরে কত অলৌকিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সমস্ত শরীর যেন তখন ভগবৎলীলা নিকেতন। বিদ্যুতের জ্যোতিতে তাঁর শরীরে কত মন্ত্র, কত বাণী ফুটে বেরুতে লাগল। যে সব ভক্ত সে সময় উপস্থিত থাকতেন তাঁরা দেখতেন সে দিব্যবাণী, সেই কায়া-ভেদী বাণী। তাঁরা সংগ্রহও করেছেন সে বাণী। আচার্যদেব সাগ্রহে পড়-তেন সে বাণী। এ যে সাধনার অমূল্য সম্পদ, এক নতুন অনুভব। সিদ্ধি-মায়ের পরম ভক্ত প্রভাতকুমার ঐ বাণী ধৈর্য সহকারে যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে খাতাতে প্রতিলিপি করত। তারপর তাঁর সংগৃহীত বাণীর প্রতিলিপি

আচার্যদেবকে দিয়ে যেত। 'এইভাবে সমস্ত কায়াভেদী বাণী আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত আমার নিকট সংগৃহীত হইয়াছিল।'

তিনি জ্ঞান ও মহাজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য প্রায়ই মার কাছে গিয়ে বিচার বিমর্শ করতেন। মা বলতেন—যতক্ষণ চৈতন্যের বিকাশ না হয় ততক্ষণ জ্ঞান পূর্ণরূপে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় না। ব্রহ্মজ্ঞান থেকে মহাশূন্যের সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না, কেননা তখনও কর্ম-বীজ মূলাবিদ্যা নষ্ট হয়নি। মহাশূন্য ভেদ হবার পর পরিপূর্ণ ব্রহ্মা-বস্থায় যে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, তাহাই উচ্চস্তরের জ্ঞান। এই জ্ঞান অগ্নি-স্বরূপ বলে মূল অবিদ্যা এতে দগ্ধ হয়। তারপর ব্রহ্মাগ্নি শান্ত হলে চৈতন্যের অভিব্যক্তি ঘটে। তখনই জ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ ফুটে ওঠে। এই উজ্জ্বল জ্ঞানই মহাজ্ঞান। মহাজ্ঞানের এই অবতরণ মহাশক্তিরই অবতরণের সূচনা করে। এর অবতরণে আনন্দের বিকাশ হয়। সে যে কি অসীম আনন্দ তা ধারণ হবে কি করে? কিন্তু তাতেও উদাসীনতা আসে, স্থিরতা তবু অক্ষুন্ন থাকে।

মার ধারায় নির্বাণই পরমপদ, তারপর নিরাকার স্থিতি। সিদ্ধিমার প্রসঙ্গে আচার্যদেব অন্য এক স্থানে লিখেছেন, 'সিদ্ধিমা যাহাকে 'পরমপদ' বলেন অনেক মহাপুরুষ তাহাকে দ্বন্দ্বাতীত বিকল্পহীন স্বরূপাবস্থা বলিয়া থাকেন। মা-ও জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত এমন কি অদ্বৈতভাবেরও অতীত যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় ঐ অবস্থায় বিভিন্ন নামে অংগীকার করিয়াছেন। উহাকে নিরাকার বলিলেও ঠিক ঠিক বর্ণনা হয় না।• কারণ ঐ অবস্থায় সাকার ও নিরাকারের ভেদবুদ্ধি থাকে না। বস্তুতঃ উহা অব্যক্ত অবস্থা।...বলা বাহুল্য এই নিরাকার সত্তাও প্রকৃত নির্বিকল্প সত্তা নহে। কারণ সাকার ভাবও যেমন কল্পনা তেমনি নিরাকার ভাবও এক হিসাবে কল্পনা ব্যতীত অপর কিছু নহে। আকারের বিকল্প সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হইয়া গেলে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, জড় ও চেতন এই প্রকার যাবতীয় দ্বন্দ্ব চির-দিনের জন্য উপশমপ্রাপ্ত এবং প্রকৃত নির্বিকল্পভাবে স্থিতি হয়। সাকারের মধ্যেই নিরাকারের প্রকাশ হইয়া প্রথমতঃ বিশুদ্ধ নিরাকার ভাবের উদয় হয়। তারপর নিরাকার সত্তাসমুদ্রে অবগাহন করিতে করিতে তাহার মধ্যে অচিন্তনীয় ভাবে অখণ্ড সাকার সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। তাহার পর সাকার নিরাকার এক হইয়া গেলে বিকল্পহীন অবস্থার উন্মেষ হয় বলিয়া পরমপদের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

কালীপদ গুহরায়

'কালীদার (শ্রীকালীপদ গুহরায়) সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫১-৫২ সালের কোন সময়ে হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাহার সম্বন্ধে

নানা কথা আমার কানে আসে। তখন শুনিয়াছিলাম কালীদা এক অসাধারণ মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন। ঐ মহাপুরুষের কৃপা তিনি ত্রিশ বৎসর পূর্বে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কৃপায় কালীদা যোগসাধনায় অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করেন এবং নানা প্রকার বিভূতির অধিকারী হন। উক্ত মহাপুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঐ মহাপুরুষ লোকচক্ষে অদৃশ্যই থাকিতেন কিন্তু সময় সময় সহসা প্রকট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। কে ঐ মহাপুরুষ তাহা বলা কঠিন। তিনি যেই হোন না কেন তিনি যে ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কালীদার সম্মুখে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া প্রকট হইতেন এবং কার্যশেষে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেন। কোনও স্থান হইতে তিনি আসিতেন না, বা বিশেষ কোন স্থানে চলিয়াও যাইতেন না, যেখানে প্রকট হইতেন সেইখানেই অন্তর্হিত হইতেন। উক্ত মহাত্মা কত দিনের কেহ বলিতে পারে না। এইরূপ শুনা যায় যে তিনি শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার গুরু ছিলেন। তাঁহার শরীর ইহার পূর্বে কাশ্মীরদেশীয় ছিল। তাঁহার যথাযথ পরিচয় পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁহার শরীর ছিল চিন্ময়। উহা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণেরও অতীত। তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও বাৎসল্যপূর্ণ পুরুষ ছিলেন।'

আচার্যদেবের গৃহে তাঁহার সম্মুখে বসে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কালীদার প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছিলেন। ধীরে ধীরে কি করে আচার্যদেব কালীদার বাসস্থানে যান এবং তাঁর সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় আবদ্ধ হন সে প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করেও জানতে পারিনি। শুনেছিলাম কালীদা ধীরে ধীরে কাশ্মীরের শিবাদ্বৈত দর্শনে অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং আচার্যদেবের কাছে ঐ দর্শনের পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। আচার্য গোপীনাথের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। যেদিন এ দুজনে শাস্ত্রচর্চা হত তখন সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকতে পারত না। কালীদাকে যাঁরা বাইরের দৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁরা জেনেছেন যে তিনি একজন বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণধী, বাক্‌পটু, অতিথিপ্রিয়, বিশ্বের নানাবিধ আধুনিক বিষয়ের জ্ঞাতা, রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খবর তাঁর নখদর্পণে থাকত। আবার তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ মাতৃভক্ত। মা কাশী বাস করবেন। তিনি বৃদ্ধা ও অশক্ত। মাকে একলা কিভাবে কাশীতে ফেলে রাখেন, তাই তিনি কাশী, কেদারঘাটের কাছে বাসা ভাড়া নিয়ে রইলেন।

আচার্যদেব এখানে যেতেন কালীদার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা যে সব রহস্য কথা নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন হতেন তা চিরকাল রহস্যে সমাচ্ছন্ন থাকবে। আচার্যদেব এ সম্বন্ধে বলতে কখনো চাইতেন না। তবে একথা বলতেন, 'তাঁর মত মানুষ খুব কমই দেখিয়াছি। মানুষকে আপন করিয়া

তুলিতে তিনি অসাধারণ দক্ষ পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্বদাই নিজেকে গোপন করিয়া রাখিতেই ভালবাসিতেন। লৌকিক আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার বাস্তবিক পরিচয় কেহই জানিতে পারিত না। কাশীতে কেদারঘাটের যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন সেই বাড়ীর বাহিরে তিনি কদাচিৎ যাইতেন। অথচ অস্পন্দ বিজ্ঞান এবং নিস্পন্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার অনুভবাত্মক জ্ঞান ছিল। তিনি নিজ গুরুকে 'বন্ধু' নামে অভিহিত করিতেন, কেননা উক্ত মহাপুরুষ তাঁহার সঙ্গে সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। তিনি বন্ধুর নির্দেশে গুটিকয় মানুষের কাছে নিজ স্বরূপের অল্প পরিচয় দিয়াছেন, এরূপে আমরা শুনিয়াছি।'

বসন্ত সাধু ও যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

আচার্য গোপীনাথ বহু সাধুসঙ্গ করেছেন। ১৯১৭-১৮ সালে মাত্র কয়েক মাসেই তিনি সাতজন সাধুর সঙ্গ করেন। এঁদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিশুদ্ধবাণী নামক গ্রন্থের সপ্তম ভাগে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বসন্ত সাধুর বিবরণ আমরা এখানে উল্লেখ করছি:

'বসন্ত সাধুর পুরা নাম ছিল বসন্তকুমার ভট্টাচার্য। তাঁহার সাধুজনোচিত বেশভূষা কিছুই ছিল না। তিনি সাদা কাপড় পরিতেন ও ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকিতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী। তাঁহার সহিত আমি প্রায়ই মিশিতাম এবং তাঁহার অনুভূত জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম।'

এঁর নিকট থেকে তিনি সাধনার একটি নবীন অথচ গোপন তথ্য আহরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যোগীকে সহস্রার থেকে হৃদয়ে আসতে হলে গুহানী নামক একটি নাড়ীর সাহায্য নিতে হয়। এই নাড়ীকে স্পর্শ না করতে পারলে জগন্মাতার সঙ্গে বার্তালাপ সম্ভব হয় না।

আবার তাঁর কাছেই শুনেছিলেন বাংলাদেশের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবর্তিত কীর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। কীর্তনে খোলের আওয়াজ পিঙ্গলাতে কার্য করে, করতালের ধ্বনি ক্রিয়া করে মস্তিষ্কে, দুইটি একত্রে বাজাইলে পরস্পরকে নিরুদ্ধ করে ও হৃদয়ে সাম্যভাবের উদ্বোধন হয়।

যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২০-২১ সালে। তাঁর সান্নিধ্যে আচার্য গোপীনাথ কয়েকবার যান। তাঁর রচিত 'সচিত্র সাধন বিজ্ঞান' নামক পুস্তক পড়ে তিনি যোগের কয়েকটি বিশেষ ধারার পরিচয় পান। প্রথমে তাঁর বই দেখে এবং পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নির্দিষ্ট যোগ-ক্রম সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করেন। তিনি তাঁকে তাঁর দেখা আবু পাহাড়ের এক বিশিষ্ট সাধুর কথা বলেন। এই সাধুর কথা শুনে ব্রহ্মচারীজী যখন তাঁকে দেখতে যান তখন তিনি সমাধিস্থ ছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি

তাঁর গুহায় দর্শন করতে যান তখন তাঁর সঙ্গে তাজা ফুলের মালা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এবার সাধুটি সমাধিতে ছিলেন না। ব্রহ্মচারীজী গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর গলায় মালাটি পরিয়ে দিলেন। তখন সাধুটি তাঁকে বললেন—যাও, ঝরণা থেকে স্নান করে এসো।

ব্রহ্মচারীজী স্নান সেরে এসে দেখলেন যে সাধুটি আবার সমাধিমগ্ন হয়ে গেছেন। সমাধি কখন ভাঙ্গে এই আশায় বসে রইলেন দীর্ঘকাল, তারপর হতাশ হয়ে চলে গেলেন। আবার এলেন পরদিন, দেখলেন, সাধুটি চোখ খুলেছেন। তাঁকে দেখেই বললেন, স্নান করে এসেছ?

তখন ব্রহ্মচারীজী বললেন—আমি তো তখনই স্নান করে এসেছিলাম। তারপর উক্ত মহাত্মা তাঁকে কয়টি যোগ প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেন। যোগপ্রকাশজী বলেছিলেন যে ঐ মহাত্মাতে সমাধিকালে কালের কোনো প্রভাব ছিল না। তিনি যে দুদিন আগে তাঁকে যে মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন তা ছিল পূর্ববং অম্লান, কালের কোনো প্রভাব তাতে পড়েনি।

আচার্যদেব যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর দেখা এই মহাপুরুষের কথা তাঁর অখণ্ডযোগের প্রসঙ্গ করতে গিয়ে কালসংস্পর্শহীন স্থিতির কথা বলতেন।

যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারীজী পূর্বোক্ত যোগের পথ ত্যাগ করে পরে এক সময় বাউল সম্প্রদায়ে প্রচলিত রসসাধনায় প্রবেশ করেন এবং তাতে যে সাধনধারা বর্তমান তাতে তিনি বিশেষ উর্ধাবস্থা লাভ করেছিলেন—এসব বিবরণ মনীষী কী লোকযাত্রা গ্রন্থে আচার্যদেব দিয়েছেন।

•

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রসঙ্গ আচার্যদেব খুব করতেন। ১৯১৪ সালে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তিনি প্রায়ই আচার্যদেবের গৃহে আসতেন এবং আচার্যদেবও তাঁর বাসায় যেতেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি লাভান্বিত হয়েছেন একথাও বলতেন।

সতীশবাবু ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের যুগপ্রবর্তক এবং ন্যাশনাল এডুকেশনের ধারাপ্রবর্তকরূপে বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিনয় সরকার, রাধাকুমুদ মুখার্জি, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি, হারানচন্দ্র চাকলাদার প্রভৃতি মনীষীগণ এঁর অনুগামী ছিলেন।

সতীশবাবুর যে অন্তরঙ্গ পরিচয় আচার্য গোপীনাথ দিয়েছেন আমরা সে কথা এখানে সংক্ষেপে দিচ্ছি।

সতীশবাবু ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁর জীবনে কিভাবে গুরুকৃপা লাভ হয় সে কথা একদিন সতীশবাবু নিজে তাঁকে বলেছিলেন: 'আমি পূর্ব—

জীবনে সন্দেহবাদী ছিলাম। আমার পিতৃদেবও অনেকাংশে ঐরূপ ছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা কোন মহাপুরুষের অনুগামী হওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। এমন কি রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকটও আমি ইচ্ছাপূর্বক যাইনি। আমার জীবনে অলৌকিকভাবে সহসা পরিবর্তন ঘটে। আমি বিচিত্রভাবে গোঁসাইজীর (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) আকর্ষণে পড়ি।'

এটি যে সময়কার কথা তখন সতীশবাবু বিদ্যায়, চরিত্রবলে ও নৈতিক গুণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি কেবল সমকালীন ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা ছিল। গোঁসাইজীর একজন শিষ্য তাঁর একজন বন্ধু ছিলেন। তিনিই সতীশবাবুর কথা গোস্বামীজীকে বলেন, যাতে তাঁর জীবনে শুভ পরিবর্তন ঘটে এ আশা তিনি তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। তখন গোস্বামীজী বলেন, কাল সতীশচন্দ্রকে নিয়ে এসো।

সতীশবাবু একথা জানতে পেরে বন্ধুটি যাতে এসে তাঁকে কোথাও নিয়ে না যায় এই ভেবে সকালে উঠেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর মনে ভয় ছিল কোনভাবে মহাত্মার সান্নিধ্যে গেলে তাঁর অসাধারণ প্রভাবে হয়ত তাঁর ভাবনার পরিবর্তন ঘটতে পারে!

তিনি গোস্বামীজীর বাড়ীর বিপরীত দিকে চলতে থাকেন। এভাবে কতক্ষণ চলেছিলেন জানা নেই, হঠাৎ পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়েন। ভাবলেন কোনো বাড়ীতে গিয়ে জল চেয়ে খাবেন। তিনি সামনে যে বাড়ী দেখতে পেলেন তার দরজায় গিয়ে দেখলেন একজন লোক বসে আছে। তাকে বললেন—বড় পিপাসা পেয়েছে, একটু জল দেবেন?

তখন যুবকটি বলল—আপনি আমার সঙ্গে উপরে চলুন, জল সেখানে পাবেন। আমি আপনার জন্যই বসে আছি।

যুবক তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে উপস্থিত হল দেখলেন সেখানে আসন বিছানো আছে। ঐ গৃহ আর কারো নয় গোস্বামীজীর নিজের এবং উক্ত যুবক তাঁরই পুত্র যোগজীবন।

ইতিমধ্যে গোস্বামীজী সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই বললেন, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ।

তারপর তাঁকে নিয়ে অন্য একটি কক্ষে গেলেন, দেখলেন সেখানে পূজা অনুষ্ঠানের সব আয়োজন করা রয়েছে, আসনও পাতা। গোস্বামীজী তাঁকে আসন দেখিয়ে বললেন, ঐ আসনে বোসো। এখনই তোমার দীক্ষা হবে।

একথা শুনে তাঁর বিস্ময় হল, কোনো প্রতিবাদের সাহস হল না। শুধু বললেন—আমি তো এদিকে আসতে চাইছিলাম না, এ কি করে হল?

গোস্বামীজী বললেন, যা হবার তা এমনি করেই হয়। আজই তোমার দীক্ষা গ্রহণের দিন।

তখন অবনত মস্তকে তিনি আসনে বসলেন এবং বিধিমত দীক্ষাও হল। দীক্ষা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তর্জীবনে নানা বিচিত্র অনুভূতি হতে

লাগল। ব্যক্তিত্বে এল আমূল পরিবর্তন। তখন তিনি নিজের ও গুরুদেবের যথার্থ স্বরূপ দর্শন করলেন। উভয়ে কি সম্বন্ধ তারও সাক্ষাৎকার হল। তাঁর অনুভব হল—এই সম্বন্ধই নিত্য এবং অনন্তকালস্থায়ী। তাঁর জ্ঞাননেত্র খুলে গেল।

বাড়ী ফিরে এলেন। সন্ধ্যায় অনুভব হল তাঁর দেহ প্রাণ মন সব মথিত করে একটিই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে—'আমি আছি', 'আমি আছি'। এটি বাইরের কোন শব্দ নয়, বাইরের নয়, ভেতরেরও নয়, অথচ শব্দই—এটি শুদ্ধ বোধাত্মক শব্দ।

এই সময় থেকে তাঁর সব সংশয় নিবৃত্ত হয়। গোস্বামীজী তাঁকে বললেন, তোমাকে জপ করতে হবে না, সাধনার প্রয়োজন তোমার নেই, তোমার সে অবস্থা কেটে গেছে। কিন্তু তোমার কিছু কাজ বাকী। তা তোমাকেই করতে হবে, তোমার হয়ে আমার করা সম্ভব নয়। তোমাকে লোকশিক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে—এই তোমার প্রারব্ধ।

এর পর গুরুর আদেশে ডন সোসাইটির স্থাপনা হয়, এটি কতদিন চলবে তার উত্তরে গুরু বলেছিলেন, যতদিন আমি মানা না করি ততদিন।

তারপর ডন সোসাইটি ও তার ম্যাগাজিন চলেছিল ১৮৯৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত। ১৯১৪ সালে গুরুর আদেশে এটি বন্ধ হয়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। হৃদয় পর দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ত। একদিন অধ্যাত্ম জীবনের প্রারম্ভে কোনো দিব্য-পুরুষ তাঁকে কৃপা করে কিছু দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করলে তিনি দুঃখ থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হবেন। কিন্তু সেদিন তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এই ভেবে যদি দুঃখ দূর করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে গুরুই তাঁকে তাঁর যোগ্যতা দেখে দেবেন। তাঁর নিজের দুঃখ তবু ভাল, অন্যের কাছে দুঃখ দূর করার বস্তু নিলে ব্যাভিচারদোষ হয়, গুরুর প্রতি আস্থা কমে। এই ভেবে তিনি উক্ত মহাপুরুষের নিকট আশীর্বাদই শুধু প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন—তুমি এ থেকেও বড় জিনিস পাবে।

পরে শ্রীগুরুদেবের কাছে জেনেছিলেন—দুঃখ থেকে মুক্তি বড় জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু তা থেকে বড় হল ভগবৎপ্রেম।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরুর নির্দেশে সম্পূর্ণভাবে আজীবন ভগবৎ-নির্ভর হয়ে থাকার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীগুরু তাঁকে এই ব্রতে অর্থোপার্জনের চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে ভাল গৃহে পরিজন সংগে নিয়ে আরামে থাকতে বলেছিলেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত তাঁর এই জীবনধারায় কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নি। নানা জায়গা থেকে তাঁর কাছে অর্থ আসত। তা দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করার পর যা বাঁচত তা পাঠিয়ে দিতেন পুরীতে জগন্নাথ দেবের ভোগের জন্য।

তিনি সাধন জীবনের কথাতে বলতেন—সাধককে প্রথমে মুক্তি লাভ

কবিরাজ মহাশয় ও আনন্দময়ী মা

করতে হয়, তারপর অনুভব হয়—আমি তাঁরই। শ্রীভগবানের দর্শন হলে অনুভবে আসে আত্মসমর্পণের ভাব। তখন কর্তৃত্বের লেশও থাকে না। মনে হয়—আমি যা কিছু করছি—এ তাঁরই কাজ। তাঁর সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীগুরুর প্রসন্নতা লাভ। শিষ্যকে ততদিনই সাধনা করতে হয় যতদিন গুরু আপন না হয়। তারপর গুরুই সব করেন।

তিনি তিনটি স্তরের কথা বলতেন (১) শিশুভাবে জীব সেবা। প্রতিটি জীবকে শিশু মনে করে তার সেবার ভার সাধককে গ্রহণ করতে হয়। এতে জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কোনো প্রশ্ন নেই। (২) দ্বিতীয় স্তর শাস্ত্রানুসারে জীবন নিয়মন। তার পর আসে তৃতীয় স্তর। (৩) এই স্তর থেকেই প্রকৃত ভগবদ্ আরাধনার সূত্রপাত হয়। এটি আরম্ভ হয় যখন ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

এই তিনটি স্তর অতিক্রম করার পর সাধন-দশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আচার্যদেব সতীশবাবুর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে তাঁর সাধন জীবনের বহু রহস্য কথা জেনেছিলেন। বহু বিষয় জেনেও তাঁর সাধনার বহু গোপন তথ্য লোক সমক্ষে প্রচারে বিমুখ থাকতেন। তিনি তাঁর জীবনে তিনটি স্তর লক্ষ্য করেছিলেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা, অধ্যাপনা, ওকালতী ও অর্থোপার্জন এবং পরিশেষে দীক্ষায় এই স্তরের সমাপ্তি।

১৮৯৭ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত দুটি স্তরে শাস্ত্রানুশীলন এবং ভগবদ্-আরাধনার কাল চলে। ১৯১৪ সালের কোনো সময়ে সতীশবাবুর সঙ্গে আচার্য-দেবের পরিচয় ঘটে এবং ১৯৪৮ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

• শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

আচার্যদেব মা আনন্দময়ীকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা আমরা মার সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন রচনা পড়ে জানতে পারি, কিন্তু তা থেকেও বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ কথা হল মায়ের সম্মুখে আচার্যদেবের যে শিশুর সরল মূর্তি প্রকাশ পেত যাদের সম্মুখে এ দুর্লভ দর্শন ঘটত তা দেখবার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এরূপ একটি ছবি কোনো সময়ে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের উদ্যোগে। সেই ভাবগম্ভীর অথচ আত্মসমাহিত দৃষ্টি একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। মার সমক্ষে তিনি উপস্থিত হয়েছেন—তাঁর সম্মুখে তখন সমস্ত দৃশ্য-জগৎ বিলুপ্ত, আছে শুধু মা—দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত। তিনি যে বিশিষ্ট বিদ্বান এবং অধ্যাত্ম বিষয়ের একজন পরিজ্ঞাতা এ বোধ আর নেই, দাঁড়িয়ে আছেন পরমশ্রদ্ধায়। দৃষ্টিতে, দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গীতে তিনি যেন সব সমর্পণ করছেন মাতৃচরণে।

যখন দুর্বল শরীরে আর কষ্ট করে মার কাছে উপস্থিত হতে অশক্ত হলেন

তখন মা নিজে তাঁর কক্ষে এসে উপস্থিত হতেন। কথা হত কম। মা জিজ্ঞেস করতেন, বাবা, কেমন আছ?

আচার্যদেব অল্প কথায় বলতেন—'তুমি যেমনটা রেখেছ।' আবার যখন কঠিন অসুখে আচার্যদেব পীড়িত, তিরোধানের মাস দেড়েক আগে মা এসে বসে রইলেন দু ঘণ্টা তাঁর কক্ষে। রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল সেবার। অবশ্য এ সুস্থতা সাময়িক, প্রদীপ নির্বাপিত হবার আগে একটু উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠা মাত্র।

মার সংগে আচার্যদেবের যে সম্পর্ক তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল বললে ঠিক বলা হবে না। মাকে তিনি নানা সময়ে বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে পেয়ে তাঁর অপূর্ব মাধুর্যময়ী স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। মা-কে তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে আচার্যদেব বহু কথা বলেছেন, আবার এও বলেছেন—

'মার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও বিশ্বাস আমার হৃদয়ের বস্তু, অবশ্য তাহা নির্বিচারে অন্য সকলে গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়। যে বিষয়ে অন্যের সংগে তর্ক-বিতর্ক সম্ভব নয়, যাহা হৃদয়ে সংগোপনে রক্ষা করার বস্তু তাহা বাহিরে আনিয়া আলোচনার বিষয় করিতে মন কখনও সম্মতি দেয় না।'

তার পরেই আবার বলেছেন—'মা স্বরূপে ভাবাতীত মহাভাবস্বরূপিণী। মা অনন্তপ্রকারে অনন্তভাবে সঙ্গম এবং উদ্‌গম হইয়াও সমস্ত ভাবের অতীত। মার এই তুরীয়াতীত স্বরূপ কে গ্রহণ করিতে পারে।

মাকে চিনিতে হইলে মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার সংগে একাত্মতা লাভ করিতে হইবে। মা হইতে পৃথক্ থাকিয়া মার পরিচয় লাভ করা কখনো সম্ভব নয়।'

'তান্ত্রিক বাঙ্‌ময় মে' শাক্তদৃষ্টি' গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রখানি পড়লে জানা যায় মাকে তিনি কিভাবে দেখতেন; মূল হিন্দীর বাংলা প্রতিরূপ আমরা এখানে উপস্থিত করছিঃ

'যিনি স্বরূপতঃ বিশ্বোত্তীর্ণ এবং ভাবাতীত হলেও মহাভাবস্বরূপা এবং সর্বভাবে ক্রীড়াশীলা, নিখিল জগতের কল্যাণরূপিণী, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মে সমন্বয় প্রদর্শিনী জগজ্জননী পরমারাধ্যা মা আনন্দময়ী।'

আবার দেখি আচার্যদেব বলছেন, গুরু একই, যার ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশ হন তিনিই তার গুরু। কার ভিতর দিয়ে হবেন, তা কে জানে? এই যে মা রয়েছেন—মার কাছে সেই ভাব নিয়ে যায় কজনে? মা তো কারো গুরু হন না, অথচ তিনি রাস্তা দেখিয়ে দেন, সেই রাস্তায় চললে ভিতরের পথ খুলে যায়। **সামনে রয়েছেন**—চোখের সামনে **পরব্রহ্ম** স্বরূপ।

মা আনন্দময়ীর কাছে তিনি কিভাবে একদিন উপস্থিত হয়েছিলেন আমার আচার্যদেবের বিবরণের সার সংকলন করে এখানে তা উপস্থিত করছি।

১৯২৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মা আনন্দময়ী কাশীতে এসে রামাপুরা

মহল্লায় কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় অবস্থান করছিলেন। আচার্যদেব এ খবর প্রথমে জানতেন না, তিনি প্রথম জানেন মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের মুখে। তিনি যদিও সহজে কাউকে প্রশংসা করতেন না, কিন্তু মায়ের প্রশংসায় তিনি বলেছিলেন, 'কাশীতে একজন মা এসেছেন, তিনি কুঞ্জবাবুর রামাপুরার বাড়ীতে রয়েছেন। প্রায় সব সময় তিনি সমাধিতে থাকেন। তাঁকে অত্যন্ত উচ্চকোটির মহিলা বলে মনে হয়। আপনি তাঁকে দর্শন করে আসুন।'

এ কথায় আচার্যদেব অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁকে আরও বললেন যে মাকে সমাধি অবস্থায় দর্শন করাও পরম সৌভাগ্যের কথা।

তাঁর একথা শুনে আচার্যদেবের মনে হল, যে-পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কখনো কাকেও প্রশংসা করেন না, তাঁর মুখেও এই প্রশংসাবাণী! শুনে আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

'সেদিন ৬ই সেপ্টেম্বর, আমি সময় করে মাকে প্রথম দর্শন করতে যাই। কুঞ্জবাবুর গৃহে উপস্থিত হই বিকেলের দিকে। সেখানে কুঞ্জবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশাঙ্কবাবু (অখণ্ডানন্দ) আমাকে মার দর্শনের যথাবিধি ব্যবস্থা করে দেন। তাঁরা আমাকে ভোলানাথজীর সঙ্গেও পরিচিত করে দেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করে একটি ছোট কক্ষে নিয়ে যান যেখানে মাকে আমি গভীর সমাধিমগ্ন দেখতে পাই। কিন্তু ভোলানাথজী মার সমাধিভঙ্গের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেও অসফল হন।'

সেদিন মার দর্শনলাভ হলেও কোনো কথা বলা সম্ভব হল না, তাই তিনি সেদিন কিছুকাল অপেক্ষা করে আবার পর দিন আসবেন স্থির করে গৃহে ফিরে আসেন।

তারপর ৭ই সেপ্টেম্বর, আচার্যদেব আবার উপনীত হলেন মাতৃদর্শনে। মা সেবার যে কদিন কাশীতে ছিলেন আচার্যদেব দিনে দুবার মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হতেন। পরে কোনো সময়ে এই দর্শনের কথা তিনি বলেছেন, 'মার দর্শনে আমার মনে যে প্রাথমিক প্রভাব সেদিন পড়েছিল বহুদিন পর তা বিশ্লেষণ করে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যায় যে আমি স্বচক্ষে সেদিন যা দেখেছিলাম তা আমার পূর্বের দেখা সব কিছু থেকেই ভিন্ন। মনে হয়েছিল এমনটা আর কখনো দেখিনি। এ যেন স্বপ্নে দেখা বিষয় জাগরণে প্রত্যক্ষ করা।'

মার সেই স্বল্প স্থিতিকালে কুঞ্জবাবুর গৃহ উৎসব মুখরিত থাকত দিন রাত। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ, যেমন উচ্চ রাজকর্মচারী, পণ্ডিত, সাধু, সাধারণ মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ সমবেত হত সেখানে। উদ্দেশ্য থাকত মাকে দর্শন করা, তাঁকে প্রণাম করা এবং সম্ভব হলে মাকে দুটি একটি কথা বলা। তবে একবার এসে মার সান্নিধ্যে উপস্থিত হলে আবার তাঁর কাছে উপস্থিত

হতে পারলে সকলে কৃতার্থ মনে করত। বার বার মাতৃ দর্শন-সুখ লাভ করতে মনে আকাঙ্ক্ষা জাগত।

প্রতিদিন বিকেলে যে সৎসঙ্গ হত তাতে মাকে ঘিরে বসত নানা শ্রেণীর মানুষ, মাকে নানা প্রশ্ন করত বিভিন্ন লোক, আর মা অনুপম মাধুর্যে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন অল্প কথায়। সব প্রশ্নের উত্তর এত অনায়াস সরলতায় প্রকাশ পেত যে, মনে হত যেন উত্তরের জন্য কোনো অপেক্ষা নেই, একটু ক্ষণ ভাবনা বা চিন্তা নেই, প্রশ্ন যত জটিল বা দুরূহ হোক্ না কেন। আবার ছিল সরস উত্তর, একটু কৌতুকের ঝিলিক।

একদিন রাতে একটি মহিলা মাকে বললেন—'মা, আমি যখন আসনে বসি, মনে হয় আমার সাক্ষিভাব খুলে গেছে। আমার সব সময় ইচ্ছা হয় আমি তোমার কাছে আসি; কিন্তু সব সময় তো আসতে পারি না। এজন্য মনে দুঃখ হয়, তোমার কাছে এলেই আনন্দ, তোমার সান্নিধ্যেই সুখ।'

মা একথা শুনে হাসতে লাগলেন, পরে বললেন—'তোমার কথা বুঝতে পারা গেল না। তুমি বলছ যে তোমার সাক্ষিভাব খুলে গেছে। সাক্ষী মানে দ্রষ্টা তো। খুবই ভাল কথা। কিন্তু বলছ—এখানে এলে আনন্দ হয়, না আসতে পারলে দুঃখ হয়। এতে মনে হয় তোমার সুখ দুঃখের বোধ রয়েছে। সুখ দুঃখের বোধ থাকলে সে তো ভোগ—সাক্ষীর আবার ভোগ কি গো?' এই বলে মা হাসতে লাগলেন।

মার এই সরস আলাপচারী রূপ দেখার সৌভাগ্য আচার্যদেবের বহু বার হয়েছে।

শুধু তাই নয় সৎসঙ্গ চলা কালে কখনো কীর্তন চলত। কোনো ভক্তের কণ্ঠে সুললিত সঙ্গীত আর তার গভীর আবেগ সকলকে পুলকিত ও মোহিত করত, কিন্তু মা যেন ঐ গানের মাধুর্যে কোন্ গম্ভীর ভাবে প্রবেশ করতেন। তাঁর সাধারণ পরিচিত রূপটি এক অসাধারণ অতি প্রকৃত স্বরূপ ধারণ করত। ভক্তদের নিকট মার পরিচিত রূপটি অন্তর্হিত হয়ে সেখানে অন্য এক রূপে প্রকাশ পেত। মার স্বরূপ থেকে স্তোত্র মন্ত্র স্বতঃই প্রকাশ পেত যার সঙ্গে বিশিষ্ট বিদ্বানের পরিচয়ও স্বল্প। ঐ মন্ত্রস্তোত্রসমূহ এত দ্রুত তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হত যে তা কোনোভাবেই লিখে রাখা সম্ভব হত না। এ ছাড়া জানা অজানা নানা বীজমন্ত্র যাতে স্বরবর্ণবিহীন অনেক ব্যঞ্জন বর্ণের সমন্বয় বর্তমান অনায়াস স্পষ্টতায় মার কণ্ঠে উচ্চারিত হত।

আচার্যদেব মার স্বরূপ কি এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন ভক্তগণের মধ্যে মার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা কি তাও নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দ একদিন মাঁকে প্রশ্ন করলেন—মা, তুমি কে?

মা বললেন—আমি কি বলব? তোমরা যা বোঝো তাই।

স্বামীজী আবার জিজ্ঞেস করলেন, মা, যতক্ষণ তুমি সমাধিতে থাক, তখন তা কি সবিকল্প সমাধি অথবা নির্বিকল্প ?

মা বললেন—'এর বিচার আমি কি করে করি, এ তো তোমাদের বিচারের বিষয়, এ তোমাদের কথা। এটা সমাধি কিনা এ-ও তো তোমাদেরই বিচারের কথা। আমি কি বলব? আমি তো লেখাপড়া করিনি। আমি কেবল এটুকু বলতে পারি আমি সর্বদা একই অবস্থাতে থাকি। সমাধি হওয়া আর সমাধি ভঙ্গ হওয়া এসব তোমাদের কথা। আমার কাছে দুই-ই সমান। এই স্থিতির কি নাম তোমরাই বল।'

মার প্রথম দর্শন করার পর যখনই মা কাশীতে আসতেন আচার্যদের সেখানে উপস্থিত হতেন। তখনও কাশীর ভদৈনী পল্লীতে আনন্দময়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মা এলে ধর্মশালায় উঠতেন, আচার্যদেব খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হতেন। ক্রমশঃ অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকে। একবার মা তাঁর পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়কে আচার্যদেবের সঙ্গে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দর্শন করাতে পাঠান। তিনি পুরীতে আচার্যদেবের গুরুদেব শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহাশয়ের আশ্রমে অবস্থান করেন। রথের উৎসব শেষ হলে পুরীর অন্য সব স্থানও দেখা হল। বিপিনবাবু বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের দর্শন লাভ করে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন আচার্যদেব যেন উদ্যোগী হয়ে উক্ত মহাপুরুষের সঙ্গে মার যোগাযোগ ঘটান। কেননা দুজনেই লোকোত্তর সত্তা, এঁদের পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটলে খুবই আনন্দ হবে।

কিন্তু এই যোগাযোগ ঘটে পরে। এ প্রসঙ্গে আচার্যদেব লিখেছেন, 'কিন্তু যোগাযোগ করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, কেননা মা যখন কাশীতে উপস্থিত থাকেন, তখন বাবা অন্য স্থানে। বাবা কাশীতে থাকিলে মা হয়ত অন্য দিকে থাকেন। অবশেষে দীর্ঘ দিন পরে মার সঙ্গে বাবার যোগাযোগ সম্ভব হয়। মা যখন বীরেশ্বর পাণ্ডে ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আমিই ব্যবস্থা করিয়া মাকে বাবার আশ্রমে লইয়া যাই। ইহা ১৯৩৫ সালের শেষ দিকের কথা।'

১৪ই অগ্রহায়ণ বিকেলে শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের সঙ্গে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সাক্ষাৎ হয় কাশীস্থিত বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে। সে সময় মায়ের সঙ্গে প্রায় পনেরজন ভক্ত ছিলেন। 'বাবা ইঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিজ্ঞান মন্দিরের দোতলায় পূবের বারান্দায় করিয়াছিলেন।...আমি মনে করিয়াছিলাম মা নিজ ভক্তগণ লইয়া উপরে যাইবার পূর্বেই বাবাকে মার আগমন সংবাদ দিব, কিন্তু মা আমার সঙ্গে সঙ্গেই এবং একটু আগেই দোতলায় পেঁছে যান, আমি তাঁর পেছনে সঙ্গে যাই। নিকটে যাইয়া মা বলিলেন—'মেয়ে তো বাপের কাছে এল'। এই কথা বলিয়া মা গুরুদেবের দিকে চলিতে

লাগিলেন। বাবা তখন আরামকুশীতে বসিয়া ছিলেন, দাঁড়াইয়া তিনি মাকে বলিলেন, 'মা, এতদিন পরে বাবাকে মনে পড়ল ?'

এই কথার উত্তরে মা বলিলেন—'বাবা, তুমিও তো ডাক নাই।' মায়ের জন্য যে আসন বাবার সামনে বিছানো ছিল মা তাতে না বসিয়া মাটিতে বসিলেন, অন্যেরা বিভিন্ন স্থানে উপবেশন করিলেন।'

কিছুক্ষণ পর বাবার দৃষ্টি মায়ের ভক্ত কাশ্মিরীগণের উপর পড়লে বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'মা, এরা সব কে, কোথা থেকে এসেছে ?'

তখন মা বললেন, 'বাবা, এরা সব একই জায়গা থেকে এসেছে, যেখান থেকে সকলে আসে।'

বাবা তখন বুঝতে পারলেন যে মা পরিহাস করছেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মা, সব তো একই জায়গা থেকে আসে, কিন্তু বাইরে এলেই আলাদা আলাদা।'

মা বললেন—'নানা হয়েও তো সেই একেরই মধ্যে।' এর পর মা ভাইজী-কে বললেন, 'তোরা না কি সব দেখতে চেয়েছিলি, এইবার বাবাকে বল না।' এই শুনে বাবা আচার্যদেবের দিকে তাকালেন।

আচার্যদেব এই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বাবাকে সূর্যবিজ্ঞানের সাহায্যে সৃষ্টি করে কিছু দেখাতে বলেন। বাবা তখন সূর্যবিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং যোগ-বিভূতির সৃষ্টির কি পার্থক্য সে কথার ব্যাখ্যা করে নিজ শিষ্য দুর্গাকান্ত রায়কে ভেতর থেকে লেন্স আনতে বললেন। তিনি লেন্সের সাহায্যে নানা-প্রকার গন্ধ এবং বিভিন্ন প্রকারের ফুল রচনা করে দেখালেন। একটি ফুল থেকে স্ফটিকও নির্মাণ করলেন। এসব দেখে সকলে বিস্মিত হল, মা কিন্তু বললেন, 'বাবা, তুমি যা করছ, মেয়ে কিন্তু সব বুঝতে পারছে।'

বাবা তখন বললেন, 'মা, তোকে দিয়েই তো সব করছি।' তখন মা বললেন—'বাবা, এসব তো প্রকৃতি শক্তির খেলা। এও একপ্রকার মায়ারই খেলা। এক মায়ার ধাক্কায় সব লোক মোহিত হয়ে আছে, আবার মায়ার উপর মায়া কেন ? মায়া দূর করে দাও।'

মা তখন আচার্যদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবাকে ধর, এঁর কাছে পরম বস্তু রাখা আছে। উনি আবরণের উপর আবরণ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখছেন।'

এবার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর আবরণ এনো না, সব আবরণ দূর কর, পরমবস্তু খুলে দাও।'

তখন বাবা বললেন, 'মা, আমি তো দেবার জনই হাত বাড়িয়ে রয়েছি, কিন্তু নেয় কে ?'

এর পর বাবা বলেন, 'মা, পিতার ঘরে এসেছ, কিছু খেতে হবে।'

মা বললেন, 'এরা সব মেয়েকে খাইয়ে এনেছে।'

তখন বাবা বলেন, 'তবে কিছুই খাবে না ?'

একথা শুনে মা বললেন, 'তা, মেয়ে তো কতবারই খায়। মেয়ে কিন্তু নিজে হাতে কিছু খায় না।'

মা তখন দাঁড়িয়ে। তাঁর কথা শুনে বাবাও দাঁড়িয়ে মার মুখে একটু মিষ্টান্ন তুলে দেন, কিন্তু তার আগেই মা-ও দ্রুত হাতে বাবার মুখে মিষ্টান্ন দেন। কে যে প্রথমে দিলেন জানা গেল না।

সকলে জলযোগ করলে মা বললেন, 'বাবা এবার অনুমতি দাও যাই।'

একথা শুনে বাবা বললেন, 'মা, যাচ্ছ যাও কিন্তু নিজের এই বুড়ো বাপকে কিন্তু ভুলো না।'

মার সঙ্গে আচার্যদেবের সম্পর্ক প্রায় ৪৮ বছরের। মাকে নানা স্থানে, যেমন কাশী, বিন্ধ্যাচল, বৃন্দাবন, রায়পুর, রাজগীর, সোলন, বম্বে, পুণা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখেছেন। কত তত্ত্বপ্রসঙ্গ করেছেন। নিজেও মা-র ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন—মা-র সমক্ষে আবার তাঁরই আশ্রম প্রাঙ্গনে। বিন্ধ্যাচলে (১৯৪৯) সালে মায়ের সম্মুখে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অখণ্ড মহাযোগ সম্বন্ধে বলেছেন।

বলতেন—'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী জগজ্জননী মহাশক্তি...তাঁহাকে দেখিয়াছি একদিকে অভয়া বরদারূপে, আবার তাঁহার কর্তব্যে কঠোর রূপেরও কিছু কিছু ইঙ্গিত কানে আসিয়াছে।...

দিদিমাকে (মা-র জননী) যখনই একান্তে পাইয়াছি মা-র জীবনের অনেক মূল্যবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তাঁহারই মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ হয়।'

মার সঙ্গে পরিচয়ের পর আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আনন্দ বার্তা'র সঙ্গে আচার্যদেবের সক্রিয় সহযোগ দীর্ঘকাল ঘটে। ঐ পত্রিকায় একটি বা দুটি নিবন্ধ আচার্যদেব লিখতেন। আজ সে সব নিবন্ধ জ্ঞানপিপাসুর পরম সম্পদরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া মার বাণীর (অমরবাণী) ও আচার্যদেব রচিত ব্যাখ্যা দীর্ঘকাল ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে বাংলা ও হিন্দিতে সব নিবন্ধ সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আনন্দময়ী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত মাদার এজ সীন বাই হার ডেভটীস গ্রন্থের সম্পাদনাও আচার্যদেব করেন। তাতে আচার্যদেব লিখিত দীর্ঘ-ভূমিকা ও মাদার আনন্দময়ী নামক নিবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই দুটি নিবন্ধ পাঠ করলে আচার্যদেব মা-র সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা হৃদয়ে পোষণ করতেন তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

১৯৬১ সালে আচার্যদেবের শরীরে যে কঠিন অস্ত্রোপচার হয় তার পূর্বে তাঁর রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা, অস্ত্রোপচার প্রভৃতি কার্যের গুরুদায়িত্ব সন্তান-বৎসলা মা স্বয়ং গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলেছেন—'১৯৬১ সালে আমার শরীরে ক্যানসারের জন্য অপারেশন হয়, সে সময় একদিকে যেমন মা আনন্দময়ীর করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আবার অন্যদিকে দিদিমাকে দেখিয়াছি

শিষ্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের ভাণ্ডার হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন।'

তারপর আরোগ্য লাভের পর প্রতি বছর বম্বেতে মেডিক্যাল চেক আপ-এর সব ব্যবস্থা মার করুণায় সম্পাদিত হত। মার প্রত্যক্ষ করুণায় আচার্যদেব ঐ দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল অর্থাৎ প্রায় পনের বছর বেঁচেছিলেন। মার অসামান্য করুণার কথা তিনি কতবার কত ভাবে বলেছেন—'শ্রীগুরুদেব ছাড়া মার সমান এ সংসারে আমার আর কেউ নেই।'

আবার মা আচার্যদেবের কথা বলেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত চিঠিতেঃ এ শরীর তো দেরাদুনে বাবার ঘরে বসিয়া এই কথাই বলিয়াছিল—বাবার এই শরীরটা জাগতিক সুখ ভোগের জন্য আসে নাই।

আবার অন্য একটি ক্ষুদ্র পত্রে মা লিখেছেন—এ ছোট্ট মেয়েটা বাবাকে ছাড়া তো নয়, তদ্ভাবে বাবাকে প্রফুল্লিত রাখে, এইটিই হওয়া। সব সময়ই তো সব সবেতেই সবটাই লগ্ন তো। অলগ্ন রূপেতেই বা কে?—সেই তো। সেইটিই হওয়া।

আর একটি চিঠিঃ মানুষের কঠিন অসুস্থতার মধ্যে কষ্টচিন্তা না হওয়া। মহালক্ষ্যযাত্রীরই ইহা সম্ভব। সব অবস্থায় তদ্ভাবনায় মনটা রাখার চেষ্টা।

মাকে আচার্যদেব বহু চিঠি লিখেছেন। মা সে সব পত্রের উত্তর কোনো ভক্তের সাহায্যে দিতেন। এ সব পত্র বাস্তবিক দুর্লভ সামগ্রী, ভবিষ্যতে যদি কোনো গবেষক এ নিয়ে কাজ করেন তা হলে অনেক বিষয়ে নবীন আলোক লাভ করে জগৎ ধন্য হবে।

নিজ নিবন্ধে মা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা শেষে আচার্যদেব লিখেছেন—আমাদের পক্ষে যাহা বাস্তবিক প্রয়োজন তাহা এই যে তিনি আমাদের মা আর আমরা তাঁহার সন্তান—হৃদয়ে এই অনুভব জাগ্রত রাখা। তাহা হইলে আমাদের ব্যাকুলতা ও ভালবাসার গভীরতায় মা তাঁহার স্বরূপ আমাদের যোগ্যতা ও আধারের গ্রহণক্ষমতা অনুসারে প্রকাশিত করিবেন। তখনই আমরা তাঁহার অপরোক্ষ সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইব। বুদ্ধি বা বিচার আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে বলিয়া আমরা যাহা দেখি তাহা সর্বাংশে সত্য না হইয়া বিকৃত হয়, তাই মাকে আমরা চিনিতে পারি না। মাকে চিনিতে পারিলে নিজেকেও চিনিতে পারা যায়—কেন না তিনি তো আমাদের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়।

মা অনেক সময় 'খেয়াল' কথাটি ব্যবহার করেন। সাধারণ মানুষ কথাটির অর্থ ধরতে পারে না। এই কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন আচার্যদেব ঃ

'মা' যাহাকে খেয়াল বলিয়াছেন তাহা স্বাতন্ত্র্য শক্তির একটি খেলা। সাধারণ লোকের পূর্ণসত্যে প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়া তাহাদের খেয়াল মনের চাঞ্চল্য রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু যাঁহার পূর্ণসত্যে প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে তাঁহার

খেয়াল খেয়ালরূপে প্রতীত হইলেও অমোঘ। এই খেয়াল কখন হয়, কখন হয় না তাহা বাহির হইতে বলিবার উপায় নাই। ইহার উৎপত্তির নিমিত্ত থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কারণ কিছুই নাই অথবা থাকিলেও উহা সসীম মানববুদ্ধির অগম্য।

মা অদ্বৈত ভূমিতে আছেন মনে করিয়া কাহারও কাহারও মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে ঐ ভূমি হইতে লৌকিক ভূমির উপযোগী কথাবার্তা কি প্রকারে হয়। ইহার উত্তরে মা বলেছেনঃ তিনের অতীত যাওয়াই তো ত্রিগুণাতীত। যেখানে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, সেখানে আলাদা বলে থাকেই না। এইজন্য উপর আর নীচের কোন কথাই নাই। আবার উপর নীচেরও জায়গা আছে।

এই কথায় মা যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে মা যে ভূমিতে স্থিত হইয়া কথাবার্তা বলেন তাহা দ্বৈতভূমি পদবাচ্য নহে, অথবা অদ্বৈত-ভূমি পদবাচ্যও নহে। সেখানে দ্বৈতের দিক হইতে দেখিলে দ্বৈতও বটে, অথবা অদ্বৈতের দিক হইতে দেখিলে অদ্বৈতও বটে। তাহা উভয়কে সংপুট করিয়া উভয়ের অতীত। অনুরূপেও সেই, মহানরূপেও সেই—একই কথা। আসল কথা ঐ অবস্থাকে অদ্বৈত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। উহা দ্বৈতের অতীত, অদ্বৈতেরও অতীত, অথচ দ্বৈতও আছে অদ্বৈতও আছে। উহা প্রকৃত নির্বিকল্প অবস্থা। দ্বৈতকে ত্যাগ করিয়া যেমন অদ্বৈতে প্রবেশ করিতে হয়, তেমনি অদ্বৈতে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিসর্জন করিতে হয়। উহাতে সবই আছে অথচ কিছু নাই, আবার কিছু না থাকিয়াও সবই আছে। সুতরাং ঐ অবস্থায় নামা উঠার কোন প্রশ্ন নাই; কারণ নামা উঠাও বিকল্প-বিশেষ। জাগতিক দৃষ্টিতে নামা উঠা আছে, কিন্তু নামা উঠাও তো সেই একেরই ভিতর। সুতরাং সেই একের পক্ষে নামাই বা কোথায়, উঠাই বা কোথায়?

সাধনা ও সাধনজীবন

আচার্যদেবের সাধনা অখণ্ড মহাযোগের সাধনা। এর স্বরূপ কি সংক্ষেপে তার পরিচয় নিজে দিয়েছেন ঃ

এ যোগ শিবের সংগে শক্তির যোগ, আত্মার সংগে পরমাত্মার যোগ, এক আত্মার সংগে অন্য আত্মার যোগ, মহাশক্তির সংগে আত্মার যোগ, লোক লোকান্তরের সংগে পরস্পরযোগ, লোকের সংগে লোকাতীতের যোগ।

তিনি অখণ্ড মহাযোগের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তাঁর নিজস্ব কোনো কল্পনা নয়, এ স্বপ্ন যুগ যুগ ধরে নানা মহাজন দেখে এসেছেন।

তিনি বলেছেন তাঁর সাধনক্রম হয়ত অন্য ধারা হতে ভিন্ন এবং এর বিস্তৃত স্বরূপও অন্য ধারার সংগে সর্বাংশে তুল্য নয়। দুঃখ, মলিনতা, তাপ, কলুষিত বৃত্তি যতদিন সংসারে বর্তমান ততকাল পূর্ণতা কোথায়—এ জাতীয় ভাবনা বিভিন্ন দেশ ও কালের সাধক সমাজে আলোড়ন তুলেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাকে বাস্তবিক পূর্ণতা বলে তা এখনও সুদূরপরাহত। 'দুঃখ-নিবৃত্তি, পরমানন্দপ্রাপ্তি, ব্রহ্মত্বলাভ, মোক্ষ প্রভৃতি অবস্থা ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ লাভ করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহাতে সমষ্টিগতভাবে জগতের দুঃখ নিবৃত্তি সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ যতক্ষণ সকলের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ একেরও অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিরই দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না—কারণ সমগ্র সৃষ্টির অতীত সত্তা অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বদ্ধ।'

তা বলে ব্যক্তিগত প্রয়াসকে তিনি অস্বীকার করেন নি, বলেছেন, 'ব্যক্তিগত ভাবে কেউ যদি দুঃখনিবৃত্তির পথ লাভ করিয়া দুঃখক্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির দুঃখমোচনের পথ নির্দেশ করেন, তবে তাহা হয় খণ্ডভাবে। সমগ্র জগৎকে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ যে জগৎ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপে বিরাট ও অখণ্ড, তাহাকে গ্রহণ করার যোগ্যতা খণ্ডগুরুর পক্ষে সম্ভব হয় না।' কিন্তু সম্ভব না হলেও খণ্ডভাবে জীব উদ্ধারের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে যুগ যুগ থেকে সম্পন্ন হয়ে আসছে। কিন্তু তা হচ্ছে ক্রমিকভাবে। অক্রমে এক মহাক্ষণে সর্বমুক্তি সমগ্র জগতে ঘটবে এ স্বপ্ন খুব কম আধারেই প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু এই সর্বমুক্তি কিভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে কথার উত্তরে বলে-ছেন—সর্বজগতের এবং জীবের দুঃখ দূর করিতে হইলে শুধু শাখা সংস্কার

করিলেই চলিবে না—মূল সংস্কার করা আবশ্যক। মূল সংস্কার মানে কালের নিবৃত্তি।'

অখণ্ড গুরুই কালকে নিরুদ্ধ করতে পারেন। তিনিই কালকে আয়ত্ত করে অখণ্ডগুরুরাজ্য মর্ত্যভূমিতে প্রকট করেন যার ফলে প্রত্যেকেই পূর্ণতার আস্বাদনের অধিকারী হয়।

তবে একটা কথা আছে—অনেকে মনে করেন করুণার অবতরণ ঘটলেই এ সম্ভব। উপর হতে করুণাশক্তির সঞ্চার যদি ঘটে তাহলে জগতে পরিবর্তন অবশ্য সংঘটিত হয়, কিন্তু আচার্যদেব বলেনঃ 'ভিতর হইতে শক্তির বিকাশ না হইলে উপর হইতে সঞ্চারিত করুণাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর নহে।'

তিনি আরও বলেন—'প্রাকৃতিক স্তরে অর্থাৎ স্থূলদেহে যোগীর অবস্থান কালেই পুরুষোত্তমের পরাবস্থা লাভ করা প্রয়োজন। যদি একজনও ঐ অতীত অবস্থা লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে ঐ একজনের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণতার বীজাধান জগতে সিদ্ধ হইবে। তখন স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে ঐ বীজ বিকশিত হইতে থাকিবে। তখন ধরাতলে ঐ পূর্ণতার আভাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। একের মুক্তি সকলের মুক্তির সূচনা করিবে।'

আচার্যদেবের ধারণায় যেভাবে এই অখণ্ড যোগের ধারা প্রকাশ পেয়েছিল আমরা তাঁর রচিত বিভিন্ন নিবন্ধ, গ্রন্থ ও প্রবচন থেকে এই গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

তাঁর জীবন কিভাবে ভক্তির ধারা ধরে, তত্ত্ব বিচারের পথে, সাধক ও যোগিজনের সাধন রহস্য অধিগত করে ক্রমশঃ কোনো এক শুভক্ষণে গুরুর চরণে উপনীত হয়েছে তা আমরা আলোচনা করেছি। ছোট বয়সে যাত্রাগানে দেখা ধ্রুবের তপস্যার ছবি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তী সময়ে সরস্বতী ভবনে গ্রন্থাগারিক রূপে থাকা কালেও সে ছবি ম্লান হয়নি। কিন্তু সে ছিল প্রচলিত সাধন-ধারার একটা পথ, তাতে লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত। এই সাধন পথে ব্যষ্টি মনের উপর বিজয় ঘটে। কিন্তু আচার্যদেব মনে করেন যে এই পথে সমষ্টি-মন ও তার অধীশ্বর ক্ষণকে লাভ করা যায় না। আর তা না হলে জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। এই নিজস্ব মন ও তার অধীশ্বর ক্ষণকে লাভ করতে হলে শিশুর মতো সরল বিশ্বাসে মা ডাকা প্রয়োজন, তাহলেই ক্ষণ প্রকাশিত হবে।

এই ক্ষণের প্রসংগ বিস্তারিতভাবে বলার আগে তাঁর মনে কিভাবে নানা প্রশ্ন জেগেছে সেকথা বলব।

মনে প্রশ্ন উঠেছেঃ 'জগতের উদ্ধারের ব্যাপারটা কি? জগৎকে আপন করিয়া নিতে হইবে—জগতে আমি-ভাবের প্রসার হইবে, তারপর সেই আমিময় মমতার পাত্র জগৎকে শুদ্ধজ্যোতিতে অর্পণ করিতে হইবে। তবেই জগৎ

শুদ্ধ হইবে, শুদ্ধ জ্যোতির্ময় বা চিন্ময় হইবে। জগৎকে আপন না করিয়া অর্পণ করা চলে না।'

গুরু যেমন দীক্ষাকালে নিজ শুদ্ধসত্তা শিষ্যের সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট করে তাকে আপন করেন এও যেন অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু আপন করার পথ কি? সে পথ তিনি পেয়েছিলেন, লিখেছেন ১৯৩৮ সালেঃ কালকে জয় করিতে হইলে কেবলমাত্র নিম্নস্তর ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বস্তরে গমন করিলে চলিবে না। উভয় স্তরের সমীকরণ করিয়া উভয়কে এক করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে অন্নময় হইতে প্রাণময় স্তরে গিয়া এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাণময় স্তরে তাদাত্ম্য লাভ করিলে চলিবে না। প্রাণময় হইতে প্রাণশক্তি লইয়া অন্নময়ে অবরোহণ করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে একদিকে প্রাণময় যেমন অন্নময় সত্তায় সত্তাবান্ হয়, অন্যদিকে তেমনি অন্নময়ও প্রাণময় সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া যায়। পরে এই দুইটি এক হইয়া যায়। এইটি বুঝিবার সুবিধার জন্য ক রাখা গেল। ইহার পর ক ঊর্ধ্বগতির দ্বারা মনোময়ে প্রবেশ করে এবং তাহার সহিত এক হয়। তারপর ক-তে অবতরণ করে এবং ক-কেও মনোময় করিয়া তোলে। ধীরে ধীরে উহা এক হইয়া যায়—ইহার নাম খ। ইহার পর খ ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করে এবং উহার সঙ্গে ঐক্য লাভ করে। তারপর উহা নামিয়া খ-এর সঙ্গে এক হইয়া যায়। ইহার নাম গ। ইহার পর গ উত্থিত হইয়া আনন্দময় কোষকে স্পর্শ করে, এবং উহাকে আপন করিয়া লয়। তারপর ঐ একীভূত সত্তা বিজ্ঞানময় স্তরে অবতরণ করে এবং বিজ্ঞানকে নিজের সহিত অভিন্নরূপে স্থাপিত করে। ইহার নাম ঘ। ইহার পরও অবস্থা আছে। যাহাকে ঘ বলা হইল তাহা একাধারে অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তা। কিন্তু ইহা অচিৎস্বরূপ। ইহার পর ঘ চিৎস্বরূপ আত্মাতে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়। তাহার পর চিৎস্বরূপ আত্মা অবতরণপূর্বক অচিতের সহিত এক হইয়া যায়। তখন চিৎ ও অচিতের কিম্বা আত্মা ও শরীরের ভেদ থাকে না। এতটা পর্যন্ত সম্পন্ন হইলে চিৎ ও অচিতের ভেদ কাটিয়া যায় এবং স্থূল সূক্ষ্মেরও ভেদ থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড সত্তার মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্য তিরোহিত হইয়া এক অখণ্ড সত্তা বিদ্যমান থাকে।

আচার্যদেব যে সাধনায় ব্রতী ছিলেন, তা ছিল খণ্ড থেকে অখণ্ডে উত্তরণে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি পার করে মহাসমষ্টিতে আরোহণের শেষে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মহামিলনে এবং পরম সামরস্যে। এই দুরারোহ যাত্রার কিছু আভাস আমরা নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় স্পষ্ট করার প্রয়াস করব।

আমরা আজ পর্যন্ত যে পরম্পরাগত সাধনধারার সঙ্গে পরিচিত তা হল ব্যষ্টির সাধনা এবং তার প্রাপ্তিও ব্যক্তিগত, কিন্তু আচার্যদেব যে ধারা ধরে চলছিলেন তা ছিল অখণ্ডের, একের প্রাপ্তিতে সমগ্রের প্রাপ্তি। এতে প্রথম

প্রয়োজন কালের বিনাশ। যোগী যে ক্রম ধরে বিভিন্ন স্তর ভেদ করে পরিশেষে যে স্থিতিতে উপনীত হন তাতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রাপ্তি অবশ্য ঘটে, মহাখণ্ডযোগী তাতেই সন্তুষ্ট না থেকে আরো বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে নিজের স্বরূপের অংগীভূত করে তাকেও আয়ত্ত করেন কিন্তু অখণ্ড যোগীর স্বরূপ তা থেকেও আরও উদার বলে তিনি এ বিশ্বের সমগ্রকে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই তিনি কেবল গুরু নন, তিনি জগদ্‌গুরু।

তিনি দেখেছিলেন সন্তগণের রহস্যসাধনার মর্ম; কোনো কোনো অংশে তাঁদের ধারণা নিজ সাধনাক্রমে গ্রহণও করেছেন, আবার বোধিসত্ত্বের আদর্শ ও পরিশেষে কল্যাণব্রতী বুদ্ধের জগদুদ্ধারের ব্রত তাঁর ধারায় চলার পথে প্রেরণাও জুগিয়েছে, কিন্তু যে পথ তিনি নিবিড় নিষ্ঠায় অধিগত করে তারও পরাভূমিতে উত্তরণে প্রয়াসী ছিলেন তা ছিল শ্রীগুরু নির্দিষ্ট ক্রম। এতে যেমন আছে বৈষ্ণব সাধনক্রমে নির্দিষ্ট ভাব হতে প্রেম ও পরিশেষে মহাভাবে উত্তরণের প্রসংগ, তেমনি আছে তান্ত্রিক ও কৌলিক সাধনার বহু অন্তরঙ্গ সাধনক্রমের কথা। তাঁর পথ কিন্তু কোনো ধারা পরিহার করে চলে না, বহু পথ যেন এক পরম সামরস্যে মিলিত হয়ে এক বিস্তীর্ণ মহাসাগর হয়েছে, বিন্দু হয়েছে সিন্ধু, ভাব হয়েছে মহাভাব, শিব হয়েছে পরমশিব, শক্তি হয়েছে কুমারী সপ্তদশী।

তিনি বলেছেনঃ অখণ্ড মহাযোগ সিদ্ধ করতে হলে ক্ষণকে আশ্রয় করতে হয়। ক্ষণ আয়ত্ত হলেই তো হয়ে গেল।

আমরা ক্ষণের প্রসংগ নিয়েই প্রথমে আলোচনা করছি।

সাধনজীবন

আচার্যদেবের ধারায় ক্ষণের বিশেষ মহত্ত্ব বর্তমান বলে আমরা ক্ষণের কথা আলোচনা প্রথমে করছি। তিনি বলেছেন, ক্ষণকে ধরে সাধন ভজন, ভগবৎ স্মরণ, ধ্যান, পূজা, জপ করলে যে ফল লাভ হয় ক্ষণ উত্তীর্ণ হবার পর দীর্ঘ সময় ধরে কোন ক্রিয়ায় সে ফল লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আচার্যদেবের গুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহারাজও প্রতিদিন একটা ক্ষণ ধরে নিজ পূজাকক্ষে প্রবেশ করতেন। যে সময়টিতে তিনি ক্রিয়ায় বসতেন সেই সময়টি সঠিক নির্ধারণের জন্য দু-তিনটি ঘড়ি কাছে রাখতেন, যাতে ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষণ কোনমতেই অতিক্রান্ত না হয়।

আচার্যদেব ক্ষণের রহস্য কথা বহু স্থানে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'এর রহস্য অতি জটিল, অথচ সরল অপেক্ষাও অতি সরল। যোগশাস্ত্রে ক্ষণের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। যাকে আমরা কাল বলে মনে করি তা কিন্তু বুদ্ধিতে কল্পিত অবস্থাবিশেষ মাত্র। ক্ষণই বাস্তবিক সত্য। ক্ষণের যে পর-পর ভাব তা-ই কাল।' প্রশ্ন ওঠে, ক্ষণ যদি একই হয় তবে তার

পর-পর ভাব কি করে সম্ভব? এ কথার উত্তরে আচার্যদেব বলেছেন যে, 'একটি মূল স্পন্দনই বিশ্ববৈচিত্র্যের নিয়ামক। যখন কাল সংকর্ষণের ফলে ঐ মূল স্পন্দন সাম্য অবস্থা লাভ করে তখন দেখা যায় আছে একমাত্র ক্ষণই বর্তমান। ঐ সাম্যাবস্থাই ক্ষণ, আবার যখন ঐ সাম্য স্পন্দনের প্রভাবে ভগ্নবং হয় অথবা আন্দোলিত হয় তখন তাই বুদ্ধির ক্ষেত্রে কালরূপে প্রতীত হয়।' সুতরাং বুঝা যায় সমগ্র কালের পৃষ্ঠভূমিতে একমাত্র ক্ষণই বর্তমান। তখন যোগীর নিকট প্রতীত হয় একমাত্র একটি ক্ষণেই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পরিণাম সংঘটিত হচ্ছে। এই ক্ষণকে আশ্রয় করে যে মহাজ্ঞানের উদয় হয় তাতেও ক্রম থাকে না। ক্রমকে অভিভূত করে সর্ববিষয়ক সর্বাকার জ্ঞান একই ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে। একেই সর্বজ্ঞত্ব বলে।

এই ক্ষণকে লাভ করার পথ কি? সে কথার উত্তরে বলেছেন, 'কালের সত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্রই ক্ষণ নিহিত আছে তথাপি সন্ধি ভিন্ন তাঁকে আবিষ্কার করা যায় না। দিনের মধ্যে কালের অবয়বসকলের সন্ধি স্থূল-ভাবে তিন অথবা চার অথবা আট মাত্রা হয়ে থাকে। ত্রিসন্ধ্যা, চতুঃসন্ধ্যা, অষ্টকাল প্রভৃতি এই বিভাগের উপরে কল্পিত। যে ভাবেই হোক্ এই মহা-ক্ষণের প্রাপ্তি একবার ঘটলে তার আর অভাব ঘটে না। অর্থাৎ হারায় না।

'ক্ষণকে ধরতে হলে গুরুনির্দিষ্ট পথে নিখুঁতভাবে সামর্থ্য অনুসারে কর্ম সম্পন্ন করতে হয় এবং ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে পারলে সেই ক্ষণ আসবেই আসবে।' এই হল তাঁর আশ্বাস।

তিনি অখণ্ড মহাযোগ গ্রন্থে বলেছেন, 'কর্মের জন্য কাল নির্দিষ্ট রহি-য়াছে। নির্দিষ্ট কাল লঙ্ঘন করা কর্মের পক্ষে ঘাতক।...মহানিশার ক্ষণ অর্থাৎ মহামহাক্ষণ হইতেই যোগীর দিবসের সূচনা হইয়া থাকে। এই জন্য মহামহাক্ষণকে ধারণ করা পূর্ণতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।'

এই ক্ষণ প্রাপ্তিতে সাধকের কি লাভ হয় সে প্রসঙ্গে বলেন, 'সাধকের নিজ সাধন বলে ও সম্মিলিত সৌভাগ্যের প্রভাববশতঃ যে ক্ষণটি আবির্ভূত হয় সেইটি মহাক্ষণ। উহাই তাহাকে তাহার পূর্ণতার পথে সাথীরূপে চালনা করে। ঐ ক্ষণের স্পর্শ লাভ হইলে মনুষ্যের নিকট নিত্যসত্যের প্রকাশ হয় এবং তাহার সকল ক্রিয়া পূর্ণতায় পর্যবসিত হয়।'

এই পূর্ণতার স্বরূপ কি, তার উত্তরে বলেন 'ঐ সময়ে সাধকের নিকট নিজের স্বরূপ হইতে পৃথক্ কিছু থাকে না অর্থাৎ সবই তখন এক অদ্বৈত-রূপে প্রতিভাত হয়। ঐ অবস্থায় মহাসত্য—অর্থাৎ বিকল্পহীন, অখণ্ড, অবাধিত সত্য আত্মপ্রকাশ করে।'

প্রথমে ক্ষণের সাধক যে ক্ষণটি পায় তা তার নিজের স্ব-ময় সত্তা। এই সত্তা তাকে মহাসত্তার দিকে নিয়ে যায় অর্থাৎ ঐ সত্তা তার নিজের সত্তা হয়েও এক মহাসত্তারই প্রকারবিশেষ। এরূপ অনুভবে আসে সেই মহাসত্তা যা মহাপ্রকাশময় তাহা বিশ্ব প্রকৃতির মূলে নিজ স্বভাবে বিরাজ করিতেছেন।"

যখন মানুষ নিজ স্ব-সত্তাকে লাভ করে তখন সে নিজের ধারাতে চলতে থাকে এবং পরিশেষে তার স্বরূপে এরূপ প্রকাশিত হয় যে সে সর্বসত্তার সঙ্গে সমভাবে যুক্ত। যেদিন বোধে ইহা জাগ্রত হয় তখন সে সর্বত্র সর্বসত্তার সঙ্গে সমভাবে যুক্ত রয়েছে দেখতে পায় এই মহাসত্যের উদ্ভাস-ই মহাযোগের প্রকাশ। ক্ষণ মূলে এক হলেও ব্যক্তিগত ধারার ভিন্নতা অনুসারে সাধকের নিকট বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি ঐ প্রকাশ বাস্তবিক প্রকাশ হয় তবে উহা মহাপ্রকাশরূপে ফুটে ওঠে। ক্ষণের প্রথম প্রকাশে খণ্ডভাবের উন্মেষ ঘটে তারপর তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলে মহাপ্রকাশের উদয় হয় আবার ঐ মহাপ্রকাশও যে মহাযোগের প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয় তাও তার স্বরূপে ভাসে। এই যোগ নিত্যসিদ্ধ, কোন সাধনের ফল নয়, কোন ক্রিয়ারও পরিণাম নয়। 'ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে উহা অব্যক্তরূপে বর্ণনীয়, কিন্তু উহা আছে, উহাকে গঠন করিতে হয় না। ক্ষণের সম্বন্ধ পাইলেই ঐ অব্যক্ত অথচ চিরব্যক্ত মহাপ্রকাশ সাধকের নিকট স্বপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠে। তখন দেখা যায় এই মহাযোগ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুর সহিত, শুধু তাহাই নহে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ যাবতীয় অবস্থার সহিত এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান সর্বপ্রকার কালের সহিত অভিন্নরূপে নিত্য-সম্বন্ধ। শুধু তাহাই নহে। এই মহাপ্রকাশে সৎ ও অসৎ এবং বৈকল্পিক ভেদও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই স্থিতিতে বিরোধ থাকিয়াও অবিরোধের সহিত একাকার হইয়া প্রকাশ পায়।'

এখন আমরা ক্ষণ সম্বন্ধে আচার্যদেবের ধারণা কি তা অনেকটা বুঝতে পারলাম। এখন দেখতে হবে ক্ষণ কিভাবে সাধকের আধারকে পরিচালিত করে ও তার রাজ্য কোথায়? 'ক্ষণটা হচ্ছে হৃদয়ে।'

এখন এই হৃদয় কি ও কোথায় তার খোঁজ করি, খোঁজ করে, কি পাইঃ 'বৈদিক যুগে দহর বিদ্যা প্রসঙ্গে দহরাকাশ বা হৃদয়াকাশ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। গীতাতে বলা হয়েছে ঈশ্বর বা পরমাত্মা সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করেন এবং সেখান থেকে মায়াশক্তির দ্বারা যাত্রারূঢ় রূপে সর্বভূতকে সঞ্চালন করেন। দেহাবচ্ছিন্ন জীব সংখ্যায় বহু হলেও সকলেরই হৃদয় একই। এই হৃদয় আকাশস্বরূপ। বাইরে যেমন একই ভূতাকাশকে যাকে আমরা নীলাকাশ বলি সকলেই তাকে নিজের নিজের মাথার উপরে দেখতে পাই, তেমনি অন্তরেতেও একই আকাশ যাকে কেউ কেউ চিত্তাকাশ বলেন, আমরা আমাদের হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ অনুভব করি। হৃদয়টি বিশ্বের কেন্দ্র। আমাদের জ্ঞান এই অন্তরাকাশরূপে হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না বলেই বহির্মুখে ইন্দ্রিয় দ্বারে দেহকে আশ্রয় করে রূপ রসাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। এর মূল কারণ দেহাত্মবোধ: যার ফলে আমাদের আত্মসংবিৎ প্রাণরূপে পরিণত হয় এবং প্রাণময়কোষরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত হয়ে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। পরমাত্মাকে লাভ করতে হলে

শূন্যকে ভেদ করতেই হয়। এই হৃদয়রূপী শূন্যকে ভেদ করে হৃদয়ের ঊর্ধ্বগতি লাভ করতে পারলে এই পরিচ্ছন্ন হৃদয়াকাশই চিদাকাশে পরিণত হতে বাধ্য। তখন চিদাকাশে আত্মশক্তি অনুগ্রহরূপে স্ফুরিত হয়ে হৃদয়োত্থিত ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ করে তখন ঐ স্থানেই ভগবৎপ্রেমের পূর্বাভাস অনুভূত হয়।'

ভগবান্ পুরুষ যিনি জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি হৃদয় থেকে ঊর্ধ্বদিকে প্রসৃত নাড়ীর সাহায্যে গতিশীল হন। এই নাড়ীতে গতিশীল পুরুষ এই ভূতাকাশের জগৎ এবং স্বপ্নময় চিত্তাকাশের জগৎ হতে মুক্ত হয়ে চিদাকাশের চিন্ময় জগতে বিচরণ করেন। হৃদয়টি কমলের মতো। ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির ফলে চিত্তের একাগ্রতা যখন সিদ্ধ হয় তখন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সাধক বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হয়ে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্মণ্ডলকে চিন্তা করতে থাকে, ক্রমশঃ একদিন এই একাগ্রভূমিতে প্রকাশের উদয় হয়। এই প্রকাশ প্রথমে চঞ্চল থাকে অর্থাৎ একবার অস্ত যায় ও একবার উদিত হয়, পরে স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। 'এই স্থির প্রকাশের দ্বারা হৃদয়কমল ফুটিয়া ওঠে। তখন অন্তরাকাশের অভিব্যক্তি হয় এবং ঐ অন্তরাকাশটি ঐ প্রস্ফুটিত কমলের কর্ণিকাস্বরূপ। এই অবস্থায় প্রস্ফুটিত হৃদয়কমল দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহার মধ্যে এক চিন্ময়, মহাপ্রকাশময় জগৎ ফুটিয়া ওঠে, এইটি অন্তর্জগৎ—বহির্জগৎ নহে।'

হৃদয়কমল ফুটে উঠলে ঊর্ধ্বস্রোতের ধারাও খুলে যায়। এই ধারা হৃদয় থেকে মূর্ধা এবং মূর্ধা থেকে হৃদয়। এই গতি আরম্ভ হলেই বলতে হয় এটি পূর্ণতা লাভের প্রথম সোপান। সাধনা পূর্ণ হলে অধঃ ঊর্ধ্বগতি শেষ হয়ে যায়। তখন হয় বাস্তবিক হৃদয়স্থিতি। ইহারই নাম পূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ।

আচার্যদেব যে মহাযোগের কল্পনা করেছিলেন তাতে পূর্বোক্ত ক্রম তো আছেই কিন্তু তার আরও পরিণত ও বিকশিত রূপের কথা আছে। সেটা কি তা আমরা তাঁর প্রবচন থেকে যতটা আমাদের বোধে প্রকাশ পেয়েছে যথাসাধ্য বলবার চেষ্টা করছি।

আচার্যদেব প্রসঙ্গক্রমে সাধক ও যোগীর গতি ও স্থিতির কথা বলেছেন। সদ্‌গুরু সাধককে শক্তিপাতকালে ততটুকু মাত্রায় শক্তি সঞ্চার করেন যাতে তার কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় ও সে ঊর্ধ্বগতি অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। যে সকল অশুদ্ধ বাসনা সাধকের অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিকে আচ্ছন্ন রাখে সেগুলো গুরুকৃপাতে কুণ্ডলিনী-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হয়। এর ফলে সাধকের অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয়ে গুরুদত্ত চিন্ময়ী শক্তিস্বরূপ ইষ্টের আকার ধারণ করে। সাধক তার নিজ কর্মের প্রভাবে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীর শক্তি বর্ধিত করে এবং তাহা ক্রমশঃ চৈতন্যরূপে আত্মবিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে চিন্ময়ত্ব প্রদান করে। 'এই কার্য

সম্পন্ন হইতে হইতে ক্রমশঃ নিজের সঙ্গে অভিন্নভাবে ইষ্ট-স্বরূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু উহা সাধকের দর্শনগোচর হয় না। কারণ অশুদ্ধ বাসনার কিঞ্চিৎ অবশেষ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত শুদ্ধ বস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। শোধনকার্য সম্পূর্ণ হইলে মলিন বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে উহা একেবারেই থাকে না। তখনই নির্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহপাত হয়। এই নির্বিকল্প জ্ঞানের উদয়ে সাধক বাসনামুক্ত হইয়া নিজেকে ইষ্টের সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে। ইহাই এক হিসাবে তাহার ইষ্ট দর্শন এবং অন্য দিক দিয়া দেখিলে ইহাই তাহার আত্মদর্শন। তার স্থিতি চিদাকাশে হয়।'

যোগীর আধ্যাত্মিক গতি সাধক থেকে ভিন্ন। তার আধার অধিকতর শুদ্ধ বলে সদ্‌গুরু তাকে যোগদীক্ষা প্রদান করেন। 'যোগী যে শক্তি লাভ করে তা তাঁর বলে তার প্রভাবে মলিন বাসনাদি শুধু দগ্ধ হয় না, পরন্তু তাহা শোধিত হইয়া যোগীর সহায়করূপে তাহার নিত্যসাথী হয় এবং তাহার অনুকূলশক্তিরূপে পরিণত হয়। ঐ অনুকূলশক্তি তখন যোগীর আত্মশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। যোগী যোগক্রিয়ায় চিৎশক্তি দ্বারা শুধু আকার রচনা করে না। কিন্তু কর্মবলে গুরুদত্ত চিদাকারের সহিত সংঘর্ষ করে মলিন বাসনাকে শোধন করে এবং তাকে অনুকূল শক্তিরূপে পরিণত করে। সর্বশক্তিসম্পন্ন এই চিন্ময় আকারকে যোগী নিজের সহিত অভিন্নরূপে বোধ করে। কিন্তু যোগী ইহাকেও অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়, এবং ইহার সাক্ষী ও নিয়ামক হয়। যোগী নিজ স্বরূপে এই আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ইহার পূর্ণত্ব সাধনে তৎপর হয়। এই পূর্ণতার প্রাপ্তিগত মাত্রার উপরেই তাহার বিশ্বকল্যাণ-সাধনের মাত্রা নির্ভর করে।'

আচার্যদেব বলেন যে যোগী যখন সদ্‌গুরু থেকে অনুগ্রহ রূপে দীক্ষা লাভ করে তখন তার লক্ষ্য থাকে গুরুরাজ্যের শিখর দেশে উপনীত হওয়া। গুরুর তীব্রতর কৃপা লাভের ফলে তার কুণ্ডলিনী অধিকতর প্রবুদ্ধ হয় এবং চিৎশক্তির উন্মেষ ঘটে। এরই নাম শুদ্ধবিদ্যার উদয় অথবা গুরুরাজ্যে প্রবেশ। ক্রমশঃ তার আধারে শুদ্ধবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং ভবিষ্যতে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। শুদ্ধবিদ্যা গুরুরাজ্যের বস্তু, একে দিব্যজ্ঞান বলে। এতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই থাকে। তারপর গুরুরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষ হয় এবং সমগ্র বিশ্ব কেন্দ্রস্থ এক অহংভাবের উপরে স্পষ্টভাবে ভাসতে থাকে। তখন অহংভাবই হয় আত্মস্বরূপের পরিচায়ক—ইহাই আত্মাতে আত্মবুদ্ধির উদয়ের প্রতীক। 'তখন শক্তির জ্ঞানাংশ সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত থাকে; কিন্তু ক্রিয়াংশ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রিয়াশক্তির ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে আত্মাতে অহংভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং পূর্ণ অহংভাব ফুটিয়া ওঠে। প্রথমে যে অহংভাবের উপর ইদংভাবের আভাস ছিল পরে তাহা আর থাকে না। এই

প্রকাশাত্মক শিবভাবই গুরু রাজ্যের কেন্দ্র। এইখানে মিলিত জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া-শক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা স্বাতন্ত্র্যরূপে দেখা দেয়। ইহারও ক্রমিক বিবর্তন আছে—ইচ্ছার যেটি পূর্ণতম বিকাশ সেইখানেই জ্ঞান ক্রিয়া ও ইচ্ছার পূর্ণ একত্ব সিদ্ধ। বস্তুতঃ শিব ও শক্তির একত্বও সেইখানেই।'

এইটুকু সম্পন্ন হলে ঐ যোগী এবার যে কার্যে ব্রতী হয়েছেন সেদিকে লক্ষ্য করেন। এতদিন তাঁর লক্ষ্য ছিল শিবত্ব লাভ কিন্তু এই শিবত্ব লাভ তাঁর লক্ষ্যপ্রাপ্তির সহায়ক হলেও পরমশিবত্ব লাভের সোপান ভিন্ন আর কিছু নয়।

এখন আমরা দেখতে পাব যোগী কিভাবে শিবত্ব থেকে পরমশিবত্বে উন্নীত হন সেই যাত্রার বিবরণ। 'প্রাচীন সাধন পদ্ধতিতে শিবভাবই অর্থাৎ শিব ও শক্তি যেখানে পরম অন্বয় স্থিতিতে সমাসীন তাহাই পূর্ণত্বের নিদর্শন। তন্ত্র-শাস্ত্রে ছত্রিশ তত্ত্বের উপদেশে শিবভাবের আদর্শ প্রদর্শিত হইলেও ইঙ্গিতে তত্ত্বাতীত পরমশিবে কি প্রকারে উপনীত হওয়া যায় তাহার পথ নির্দেশ করা হয় নাই। তবে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে শিবভাবের মধ্যে শক্তির পূর্ণ-সত্তা অভিন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।'

এই অন্তর্নিলীন শক্তিকে জাগাবার যে সাধনা তাই সংক্ষেপে অখণ্ড-যোগীর সাধনা। তাঁর ব্যক্তিগত পূর্ণতা শিবত্ব লাভে যদিও ঘটে, কিন্তু তাতে এই বিশ্বসংসারের কি লাভ? তাই তিনি ঐ শিবত্বলাভে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। তিনি জানেন শিবভাব প্রকাশাত্মক এবং বিশ্বাতীত এবং ঐ ভাবই পূর্ণত্বের মূলভিত্তি। কিন্তু ঐ অখণ্ডযোগীকে আরও এগোতে হবে কারণ শক্তির জাগরণ ব্যতীত ঊর্ধ্বগতি সম্ভবপর নহে। যখন শক্তির জাগরণ আরম্ভ হয় তখন কি ঘটে তা বলছেন, 'শক্তির কিঞ্চিৎ জাগরণে শিব হন শব, কিন্তু শক্তির আরও অধিক জাগরণ শিব হন সুপ্ত। শক্তির পূর্ণ জাগরণে শিব হন পূর্ণ জাগ্রত।'

জাগরণের এই যে বিভিন্ন স্তর তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'কালী আদ্যা-শক্তি, ইহা শিবময়ী শক্তির জাগরণের প্রথম পর্ব। শিব তখন শব। তারা সন্ধিস্থান—তখনও শিবের শবত্ব পরিহৃত হয় নাই। ললিতা বা রাজরাজে-শ্বরী তৃতীয়া শক্তি, ইহার পূর্ণ জাগরণে শিব হন নিদ্রিত। এবারে শবভাব কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিদ্রাভাব (নিমেষ) এখনও আছে।'

আচার্যদেবের গুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস জ্ঞানগঞ্জের সাধনা পূর্ণ করার জন্য নবমুণ্ডী আসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সাধনায় এই অবধি পূর্ণ হয়েছিল, তবে এখনও পূর্ণত্ব অবশিষ্ট আছে। তিনি নাভিধৌতির ফলেই শিবভাব হইতে পরমশিবভাব পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন মনে করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি রাজরাজেশ্বরীকে নিজেরই নাভি হইতে উত্থিত কমলে আসন দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু রাজরাজেশ্বরীকেও ভেদ করিতে হইবে, তবেই অখণ্ড গুরুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই ভেদ সম্পন্ন হইলে পরম শিবের সুপ্তিভঙ্গ (নিমেষ

ত্যাগ) হইবে, তখন আর শিব-শক্তি বলিয়া পৃথক কিছু থাকিবে না, এক অখণ্ড চৈতন্য থাকিবে।

যোগীর এই যে অগ্রগতি এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন স্তর ভেদ তা কর্মসাপেক্ষ। এই কর্ম যোগীর। যোগী যখন তাঁর গুরুর নিকট থেকে যোগদীক্ষা লাভ করেন তখন তিনি প্রাথমিক অনুগ্রহ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম সমাপ্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর স্বকীয় কর্মের ফলে তিনি প্রথমে গুরুরাজ্য ভেদ করতে সমর্থ হন। আমরা পূর্বে বলেছি এই গুরুরাজ্যের চরম সীমা শিবত্ব লাভ। যদি যোগীর শিবত্ব লাভই মুখ্য লক্ষ্য না হয় এবং লক্ষ্য যদি আরও ব্যাপক হয় তবে তাঁর পক্ষে আবার কৃপার প্রয়োজন আছে। এই কৃপা দ্বিতীয় রাজ্যে ঘটে। 'এই রাজ্যে কৃপা যেমন আরও গভীর তেমনি এর সঙ্গে সংসৃষ্ট কর্মের বল ও প্রসারও অধিক। এই দ্বিতীয় রাজ্যেও কর্ম বাকী রহিয়াছে এবং কৃপাও অবশিষ্ট রহিয়াছে। এখনও কর্ম ও কৃপার মিলন সংঘটিত হয় নাই। এখনও গুরুর কৃপা ও শিষ্যের কর্ম কতকটা পৃথক পৃথকই বিদ্যমান, উভয়ের অনেকটা মিলন সংঘটিত হইয়াছে। পরমা প্রকৃতির শেষ সীমা পর্যন্ত কৃপার অবধি। সেই পর্যন্ত যে কর্ম তাহা স্পষ্ট কৃপার অধীন। কিন্তু পরমাপ্রকৃতির রাজ্য ভেদ করা, অখণ্ড গুরুধামে প্রবেশ করা এবং সর্বপ্রথমে শিবাবস্থা হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হওয়া, সবই মহাকৃপা সাপেক্ষ।'

কৃপা ও কর্মের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ বর্তমান তার কথা আচার্যদেব গম্ভীর ভাবে আলোচনা করেছেন। দীক্ষা কালে যোগী গুরু থেকে যে কৃপা-শক্তি লাভ করে কর্মদ্বারা সেই কৃপাকে শোধ করতে হয়। এই কর্মের বহু বিচিত্রতা বর্তমান, তা সত্ত্বেও তাঁকে কর্ম-ভরসা করেই এগোতে হয়। কর্মই এখানে প্রধান, অখণ্ডযোগে কৃপা গৌণ এবং স্থূল দৃষ্টিতে কৃপা লুপ্তপ্রায়। তারপর কর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হলে মহাকৃপা আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু তারও পূর্বে অর্থাৎ মহাকৃপার অবতরণের পূর্বে যোগীকে কৃপা-শূন্য কর্মের পথে চলতে হয়। যোগীকে অধিকার-সম্পত্তি লাভ করার জন্য স্থূলদেহে গুরু-নির্দিষ্ট কর্মরাশিকে সমাপ্ত করতে হয়, আভাসও যেন বাকি না থাকে। কৃপাশূন্য কর্মের পথে চলার সময় কৃপার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'তৃষ্ণার্ত পথিক পিপাসায় আর্ত হইয়া কাঁদিতে থাকে। তৃষ্ণানিবর্তক জল অর্পণ করিবার জন্য কেহ তাহার নিকট হাত বাড়াইয়া দেয় না।'

আমরা আচার্যদেবের জীবনে এর ছবি দেখেছি। যদি কোথাও কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আর কতদিন অপেক্ষা, আর কতকাল এই দুরূহ যাত্রা চলবে এ জিজ্ঞাসা তাঁর ছিল। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ যোগীর মাধ্যমে নিজ যাত্রার ইঙ্গিত জানতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু সে যে তাঁর কোনো খেলা কিনা কে বলতে পারে?

আমরা এ পর্যন্ত যে যাত্রার কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম তা যে একজন বিশিষ্ট যোগীর যাত্রার কথা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়, সে বিশিষ্ট

যোগী আর কেউ নয়—সে আধারটি মহাযোগী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের। তিনি নিজ গুরু থেকে যে পথ পেয়েছিলেন তা কোনো খণ্ডযোগীর পথ নয়, অথবা মহাখণ্ডযোগীরও নয়, সে পথ অখণ্ড মহাযোগীর। তিনি জেনেছিলেন অখণ্ড মহাযোগই বিশ্বকল্যাণের একমাত্র পথ।

এই যোগের স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে এই যোগের পথ তাঁর জীবনকালে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল আমরা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে তাঁর সাধনার কথা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। আচার্যদেব তাঁর নিজের কথা খুব কমই বলতেন, বলতেন তাঁর ছোটবেলার কথা, তাঁর জীবনের অসংখ্য খুটিনাটি, বলতে কোথাও ভুল হত না। কিন্তু সাধনার কথা কমই বলতেন। তাঁর জীবনে যে লক্ষ্য ছিল তা ছিল অখণ্ড মহাযোগের পথ, কিন্তু এ পথও খুব গোপন ছিল। 'অখণ্ড মহাযোগ' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর এবং তারও অনেক পরে 'অখণ্ড মহাযোগের পথে' বইখানি বের হবার আগে সাধারণ জিজ্ঞাসু তাঁর কাছে নানা তত্ত্বজিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁদের কারো কাছে নিজ লক্ষ্যের কথা ব্যক্ত করেন নি। তাঁর সাধনা চলত গোপনে।

কিন্তু তারও আগে তাঁর জীবনে কত বিচিত্র অনুভূতি জন্মেছে তাও কি কেউ আগে জেনেছে?

তাঁর দীক্ষার পর পূজার ঘরে যখন তিনি পূজা বা ক্রিয়ায় বসতেন তখন আলোয় গড়া অসংখ্য পাখী উড়তে দেখা যেত, প্রথম দিকে অল্প, পরে গোণা যেত না। এর রহস্য কি কে বুলবে? তারপর প্রখর রোদে পথ চলতে একটা স্নিগ্ধ ছায়া তাঁর শরীরকে তাপ থেকে বাঁচাত।

দীর্ঘকাল মাথায় তেল দিতেন না, বলতেন একটা ক্রিয়া করতেন সে সময় যখন এমনিই মাথা স্নিগ্ধ থাকত, তেল দিয়ে অতিরিক্ত স্নিগ্ধতার কোনো প্রয়োজন দেখা দিত না।

১৯২২ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক। থাকতেন সে সময় ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে একটা বাসায়। তাঁর পড়ার ঘর, থাকার ঘর ও পূজার ঘর সব আলাদা ছিল। থাকতেন দোতলায়; আর সব ঘরগুলোই দোতলায়। তখনও কলেজের প্রিন্সিপাল হন নি। মাঝে মাঝে তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ দেখাশুনা করতেন।

তাঁর পূজার ঘরে নিজের মা ও স্ত্রী ছাড়া কেউ প্রবেশ করতেন না। ক্বচিৎ কখনও দু একজন বন্ধুবান্ধব সে ঘরে যেতেন।

কলেজে সকালে পণ্ডিতের টোল ছিল এবং দুপুরে কলেজের ক্লাশ। বেলা ৯টা নাগাদ কলেজে যেতেন। কলেজ থেকে ফিরতেন বেলা ২টা থেকে ৩টার মধ্যে।

সকালে পূজার ঘর বন্ধ করে আহ্নিক করতেন এক-ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা সময়। তারপর উঠতেন এবং জলযোগ করে কলেজ যেতেন।

একদিন সকালে আহ্নিক শেষ হয়েছে, প্রণাম করেছেন। জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় আছে, ঘরে বইপত্র সবই দেখতে পাচ্ছেন অথচ মন একেবারে শূন্য, তিনি যে কলেজের অধ্যাপক, তাঁকে যে কলেজ যেতে হবে, তিনি যে গোপীনাথ কবিরাজ, তাঁর যে স্ত্রী-পুত্র আছে, একেবারেই সে কথা মনে ছিল না, অথচ তখন তাঁর সমাধি হয়নি, পূর্ণচৈতন্য আছে। এ অবস্থা ২/৩ মিনিট কনটিনিউ করেছিল। পরে যখন ইচ্ছা হত তখনই দেশকালের ঊর্ধ্বে যেতে পারতেন। এই উপলব্ধিই আরও বেশী করে দেখা দেয় ১৯৫২ সালে। তখন এই উপলব্ধির গভীরতা আরও বেশী। এই উপলব্ধি পাবার জন্য ধরা বাঁধা নিয়ম নেই, কোনো ক্রিয়াকলাপ নেই।

এই দিব্যানুভবের অন্য এক দিক তাঁর স্বাধ্যসংবেদন। এই অনুভবের দ্বার কিভাবে একদিন খুলে যায় তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেনঃ একবার ১৯১৬ সালে আচার্যদেব মেঘনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনিত্যগোপাল ভট্টাচার্যের কর্মস্থল রেবাড়ী (রাজস্থান) বেড়াতে যান। একদিন একলা ষ্টেশনের দিকে বেড়াতে গেছেন, হঠাৎ নিজের ভেতর তত্ত্বের স্ফুরণ হতে থাকে। এই হল প্রথম স্ফুরণ, তারপর প্রায় চার বছর এই অনুভব দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে চলত। তারপর ১৯২০ সালের পর থেকে এই অনুভবের ক্রমে কোথাও বিচ্ছিন্নতা ছিল না। স্ফুরণের পর দেরী হলে তত্ত্ব যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য সঙ্গে নোটবই থাকত, সঙ্গে সঙ্গে সব কথা লিখে রাখতেন। এসব তত্ত্ববস্তু তাঁর ভাবনার ফল বলে মনে করলে ভুল হবে, তবে আন্তর-মনন বলা যেতে পারে। কোনো কোনো মনীষী একে শুদ্ধবিকল্প-রূপ বলে অভিহিত করেছেন এবং জ্ঞানের সাধকল্পক ভূমি থেকে নির্বিকল্প ভূমির মধ্যবর্তী স্থিতিরূপে নির্দেশ করেছেন।

আচার্যদেব বলেছেন—'প্রজ্ঞার জন্যই সমাধি আবশ্যক, তবে ব্যক্তিবিশেষে সমাধি ব্যতিরেকেও প্রজ্ঞা ফুটিতে পারে।' আমার মনে হয় আচার্যদেবের ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটেছিল, তার ফলে হৃদয়ে যে প্রশ্ন জেগেছে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ফুরণ ঘটেছে হৃদয়ের স্বচ্ছভূমিতে।

এই উন্মেষ যে কখন কোথায় ঘটবে তা আগে থেকে জানা যেত না। পথে চলতে চলতে, রেলওয়ে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে, কাশীতে, নবদ্বীপে, পুরীতে অথবা আরো কত জায়গায়।

তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি তাঁর গুরুদেবের নিকট তত্ত্বকথা খুব কমই শুনেছেন, 'সব কিছু তাঁহার নিকট আসিয়াছে উপর হইতে—ভগবানের কৃপায় তাঁর অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হইয়াছে।'

আচার্যদেবের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু কখনো সে সব নিজে থেকে প্রকাশ করেন নি। একবার তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু গোরখপুরের 'কল্যাণ' পত্রিকার সম্পাদক হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয় তাঁকে এবং অন্য কয়জন বিশিষ্ট সজ্জনকে কয়টি প্রশ্ন করেন, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলঃ

আপনার জীবনে এমন কোনো ঘটনা কি ঘটেছে যাতে ঈশ্বরের সত্তা অথবা তাঁর করুণার প্রতি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্যদেব সবিনয়ে বলেনঃ আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমি ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা লোকের কাছে প্রকাশিত করিতে অসমর্থ। তবে এতটা বলিতে পারি যে ঠিকমত তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার উত্তর মেলে—ইহা নিশ্চিত। তিনি আমাকে ঘোর বিপদে বহুবার অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন, যাহার প্রতীকার কোন লৌকিক উপায়ে সম্ভব হইত না, এবং যে কথা স্মরণ করিলে তাঁহার করুণা ও প্রেমভাব হৃদয়কে অভিভূত করে। জ্ঞানের রাজ্যে, কর্মক্ষেত্রে ও ভাবমন্দিরে তাঁহারই মঙ্গলময় সত্তা এবং শক্তি আমি নিরন্তর কতরূপে অনুভব করি, বর্ণনা করিয়া তাহা শেষ করা যায় না।

এই বিষয় এতই গোপন যে এই সম্বন্ধে সাধারণতঃ কাহারও সঙ্গে আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি এক দিকে যেরূপ বিশ্বাসশীল অন্যদিকে তেমনি সংশয়প্রবণ। সুতরাং আমি নিজের জীবনে যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে সব প্রকার প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাচাই না করিয়া নিজে তাহাকে কখনও সত্যরূপে গ্রহণ করি নাই অথবা করি না। আমার বিশ্বাসে যাহা সত্য তাহা সর্বদাই সত্য। সুতরাং পরীক্ষা করিলে তাহার উজ্জ্বলতা বাড়েই, কমে না।

প্রাতিভাসিক সত্তা হইতে ব্যবহারিক সত্তাকে জ্ঞানের আলোকে পৃথক করিয়া চিনিতে না পারিলে পারমার্থিক সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। শ্রীভগবানের কৃপা এবং সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রতিভাস হইতে ব্যবহার, এবং ব্যবহার হইতে পরমার্থের দিকে যাইবার পথ কিছু প্রতিভাত হইয়াছে, কিছু কিছু খুলিয়াছেও, কিন্তু নিজ পুরুষার্থরূপী উদ্যমের সহায়তায় যখন তাঁহার নিত্যপ্রকৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে, তখন স্বভাবের স্রোতে চলিতে চলিতে প্রত্যেক স্তরে তাঁহার উপলব্ধি করিতে থাকিব এবং সোপানপরম্পরায় জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমরূপে নিত্য যোগের বিকাশে তাঁহার অখণ্ড সত্তময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় স্বরূপ লাভ করিয়া অন্তিমে লীলা অবসানে তাঁহার সর্বভাবময় অথচ সর্বভাবাতীত পরমরূপে স্থিত হইতে পারিব।'

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃত পাঠে আচার্যদেবের চরিত্রের একটা দিক উদ্ভাসিত হয়। তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যে কত গভীর সাধারণ মানুষ তার কতটুকু অংশ বুঝতে পারে? তাঁর সাধু দর্শন এবং তাঁদের সাধন-উপলব্ধ অনুভবের যে বিবরণ যে শ্রদ্ধা ও যত্নে সংগ্রহ করে তিনি পাঠকের নিকট উপস্থিত করেছেন তা পাঠ করলে আমরা আচার্যদেবের গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় লাভ করি। কিন্তু সে বিবরণেও তিনি সবিশেষ সংযম রক্ষা করে চলেছেন। যা প্রকাশ যোগ্য নয় তা প্রকাশ করতে তাঁর উদ্যম কখনও দেখা যায় নি। মনে হয় তিনি ভারতীয় পরম্পরাই সর্বতোভাবে অঙ্গীকার করে চলছেন।

অভিনবগুপ্তপাদ বলেছেন—'ন অতিরহস্যং একত্র খ্যাপ্যং, ন চ সর্বথা গোপ্যম্'। অতিরহস্য বিষয় এক জায়গায় সবটা বলা উচিত নয়, আবার একেবারে গোপনও করবে না।

আচার্যদেব তাঁর বিভিন্ন রচনায় বহু বিবরণ রহস্য কথা উন্মোচনের প্রসংগে বলেছেন, সে সব বিবরণ যে শাস্ত্র ব্যাখ্যার এক বিশেষ শৈলী তা নয়, বা নতুন দৃষ্টিতে দেখা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যা তাও নয় কিন্তু অধিকাংশ তত্ত্ব প্রসংগ তাঁর নিজ অনুভবে প্রাপ্ত অর্থাৎ যে আলোক তিনি একদিন ভগবৎকৃপায় লাভ করেছিলেন সেই আলোকে প্রকাশ পেয়েছিল।

আমার এই কথার সমর্থনে আমি দু-একটি উদাহরণ উপস্থিত করলে পাঠকগণ আমার কথার তাৎপর্য যথাযথ হৃদয়ংগম করতে পারবেন।

আচার্যদেব একদিন কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি সাধুর সঙ্গে তত্ত্ব প্রসংগ করছিলেন। উক্ত মহাপুরুষ নাগাবাবা নামে পরিচিত ছিলেন। একদিন যখন তত্ত্বপ্রসংগ চলছিল তখন সেখানে একজন মহাপুরুষ আসেন। তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর হয়েছিল। নাগাবাবা তাঁকে কখনো দেখেন নি, এমন কি তাঁর নামও পূর্বে শোনেন নি। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র নাগাবাবা মস্তক অবনত করে তাঁর চক্ষুর বা মুখের দিকে একাগ্রভাবে তাকাতে লাগলেন। আচার্যদেব তখন বাবাজীকে তাঁর ঐরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, 'পুরুষটি জ্ঞানী বটে, জীবন্মুক্ত বলা চলে। কিন্তু এখনও মাতৃঋণ শোধ হয় নি।'

মাতৃঋণ শব্দে বাবাজী দেহশুদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। দেহ সম্যক্ শুদ্ধ না হলে জীবন্মুক্তি লাভ হতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্মলাভ ঘটে না। অর্থাৎ মাতৃঋণ শোধ হয় না, মায়াপাশ ছিন্ন হয় না এবং পঞ্চতত্ত্বের আকর্ষণ অটুট থাকে। সেই জন্য সোঽহংভাব জাগে না।

সেদিন আরো প্রসঙ্গ হয়েছিল কিন্তু আমরা সে সব কথার বিস্তারে যাব না। আচার্যদেব এই যে সেদিন শুনলেন মাতৃঋণ শব্দ এর গভীর তাৎপর্য কি তা জেনেছিলেন প্রায় দু বছর পর। নাগাবাবা মাতৃঋণ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ১৯২৩ সালে, আর ১৯২৫ সালে আচার্যদেব স্বসংবেদনে পেলেন এর রহস্য। সে রহস্য কি নীচে উল্লেখ করছিঃ

যার ঋণ শোধ না করিয়া আমি শূন্যে যাব, সে আমাকে টানিয়া বাহির করিবে। বস্তুতঃ প্রকৃত শূন্যে আমার প্রবেশ হবে না। অন্যের জিনিস সঙ্গে নিয়া শূন্যে প্রবেশ চলে না। নিজের জিনিস রাখিয়াও যাওয়া চলে না। যে আমাকে টানে, তাতে আমি আছি, আমাতে সে আছে। নতুবা আকর্ষণ অসম্ভব হত।

সব ঋণ তো শোধ হবে। মাতৃঋণ শোধ হবে কি? বাকি সব ঋণ-শোধে নিত্য-ধামে বাস। মাতৃঋণ শোধে নির্বাণ। আমার সবই মা হতে—আদ্যাশক্তি

হতে। তাঁর ঋণ শোধ হলে আমার কিছুই ত থাকিল না। শুধু আমিও না। কারণ, তাও আদ্যাশক্তি-প্রসূত।

মাতৃঋণ শোধ মানে আমি মা-তে ফিরিয়া গেলাম—ডিজল্ভ্ড্ হলাম। মা ত চিরনির্বাণেই আছেন, তাই আমিও নির্বাণ পেলাম। কিন্তু তবু মার কোলে শুইয়া। মাকে না ধরিয়া হয় না।

এ কথারই আবার বিস্তৃত বিবরণ পাই 'অখণ্ডমহাযোগের পথে' পুস্তকে (পৃঃ ৩৬-৩৭)।

আচার্যদেবের সাধনার কথা বলতে গিয়ে আমরা বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, তা হলেও তাঁর সাধনার পূর্বপীঠিকা যথাযথ না জানলে তার স্বরূপ জানার সুবিধা হবে না বলেই আমাদের এত কথা বলতে হল।

আচার্যদেব বিশুদ্ধবাণী নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে নবমুণ্ডী মহাসনের তাৎপর্য নিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুদেব কর্তৃক তাঁকে লিখিত পত্রের অংশ উল্লেখ করেছেন। পত্রাংশটি নিম্নপ্রকারঃ

'জগৎপ্রসবিনী প্রত্যক্ষ মা যোগে ব্রহ্মাতীত মা মহাভাব-তত্ত্বের সারমর্ম ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়ে সর্বদাই গ্রহণ কর।'

তিনি এই কথা কয়টির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে যে অর্থ প্রতিভাত হয় তা হল জীব, ঈশ্বর ও জড় যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে তিনিই হলেন জগৎ-প্রসবিনী। যোগী সন্তানরূপে এই মাকেই প্রত্যক্ষ করে থাকেন এবং এই প্রত্যক্ষের ফলে এই মায়ের সঙ্গেই যোগী যুক্ত হয়ে অভিন্নতা লাভ করেন। কিন্তু মায়ের যেটি পরম স্বরূপ তাহার সাক্ষাৎকার ঐ সময়ে হয় না। কারণ তিনি ব্রহ্মের অতীত। তিনিই ব্রহ্মাতীত মা। তিনি বলেছেন, 'ক্রিয়ার মধ্য দিয়া পরাভক্তির উন্মেষের ফলে, যে প্রেমের উদয় হয় তাহারই প্রভাবে পরমাদ্বৈতের আস্বাদন হয়। এই পথে চলিতে গেলে জগৎপ্রসবিনী প্রত্যক্ষ মায়ের সাহায্য আবশ্যক, যাহার প্রভাবে মহাভাবরূপা মাকে স্পর্শ করিতে সামর্থ্য জন্মে। জ্ঞানের পরিপূর্ণ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যময় অখণ্ড অদ্বৈতে সব পর্যবসিত হয়।'

এখানে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে বক্তার আশয় স্পষ্ট নয় বলে আমরা আচার্যদেবের বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করছি।

আমরা অখণ্ডযোগের যে বিবরণ পূর্বে দিয়েছি তাতে দেখানো হয়েছে যে অখণ্ড-মহাযোগী আরোহণের পথে নানা তত্ত্ব জয় করে শিবত্ব পর্যন্ত আয়ত্ত করেন। তারপর তিনি মহাশক্তি পর্যন্ত স্তরও নিজ অধিকারে আনেন। কিন্তু এখানেও তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ হয় না।

আচার্যদেব বলেছেন যে জগদ্গুরু হতে হলে জীবকে মায়ার শেষ সীমা পর্যন্ত সব তত্ত্ব জয় করা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ভগবৎ কৃপাশক্তিরও অধিকারী হতে হয়। কৃপা ও কর্মে মিলন ভিন্ন এই মহান্ কার্য সম্ভব নয়। এই কর্ম ব্যষ্টিরূপে অথবা সমষ্টিরূপে হতে পারে। সমষ্টির কর্ম

সমাপ্ত হলে তাতে যে কৃপার সঞ্চার ঘটে তার ফলে সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু সেখানেও একটি প্রশ্ন থাকে। সে প্রশ্ন হল সমষ্টিতে যে অনুগ্রহ প্রাপ্তি যোগীর সে বিষয়ে অনুভব থাকা প্রয়োজন, তা না হলে অর্থাৎ অনুভবহীন প্রাপ্তিতে পূর্ণত্বের সম্ভাবনা কোথায় ?

এজন্য যোগীকে মহাশক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে, স্বয়ং মহাশক্তিরূপে হয়েও মহাপ্রকাশে প্রবেশ করার চেষ্টা পরিহার করতে হয়। কেননা যোগী স্বভাবতঃই পরার্থপ্রবণ বলে অনন্ত বিশ্বের কল্যাণ সাধনের জন্য মহাপ্রেম সাধনা রূপে লক্ষ্য সম্মুখে রেখে অবতরণ করেন।

এই অবতরণের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ প্রেমের সাধনা। প্রথমে যোগীর যে যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা ছিল মহাশক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য সিদ্ধির সাধনা, আর এবার যে লক্ষ্য তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে তা হল অনন্ত মাধুর্যময়ী মহাভাবরূপিণী মহাশক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভের সাধনা অর্থাৎ যোগীর সত্তা যা মহাশক্তিভাবাপন্ন তাকে এবার মহাপ্রেমসিদ্ধ সত্তার সঙ্গে একাত্ম করার সাধনা। যেদিন এই দুইয়ে মিলন ঘটে সেদিন তাঁর কার্য অনেক অগ্রসর হয়েছে বুঝতে হবে।

মহাপ্রেমসাধনা যেদিন পূর্ণ হয় সেদিন মহাপ্রকাশে প্রবেশের সময় আসে। তা অবশ্য অকস্মাৎ ঘটে না। একদিকে এই যে মহাপ্রেমময় মহাশক্তিসম্পন্ন সত্তা আর অন্যদিকে মহাপ্রকাশ তাদের মিলন ঘটে হৃদয়ে। এই প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলেছেন :

'হৃদয় হবে দুটি বিন্দুর মিলন স্থান। এই বিন্দু দুটির একটি আছে মূলাধারের নীচে যেখানে একটি রক্তসহস্রদল কমল, আর উপরে আছে ঊর্ধ্ব-সহস্রদল কমল তাতে আছে একটি বিন্দু। সেই বিন্দুটাকে আকর্ষণ করতে হবে। এই দুটি বিন্দুর যোগ হবে। এই দুটি বিন্দু আসবে কাম-রাজ্যকে ভেদ করে। তখন যেখানে সেটা মিলিত হবে, মিট্ করবে, সেটা করবে হৃদয়েতে। এই দুটো তখন এক হয়ে যাবে, সেখানে অখণ্ড মহাপ্রকাশ হবে। সেই অখণ্ড মহাপ্রকাশ সাকার, নিরাকার নয়। সমস্ত জগতের মধ্যে সেই অখণ্ড মহাপ্রকাশ প্রকাশিত হবে।'

আচার্যদেব যে যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন তা সব এক জায়গায় করলে আমরা তাঁর বর্ণিত অখণ্ড মহাযোগের সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। আমাদের যোগিজনের মতো ধারণাশক্তি নেই। কিন্তু যেটুকু আমার মতো ক্ষুদ্র আধারে প্রকাশিত হয়েছে তাই এখানে উল্লেখ করব। মনীষীজনের বিচারে এই বিবরণ কতটা যথাযথ তা তাঁরাই বিচার করবেন।

আচার্যদেব তাঁর গুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের নিকট থেকে যে পথ পেয়ে-ছিলেন তিনি তাঁরই উত্তরসাধক বলে গুরু যা নিজ কর্মে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর উপযুক্ত শিষ্যে তার সবই সংক্রান্ত হয়েছিল মনে করতে পারি। শিষ্য নিজ কর্মে তাঁর আরব্ধ কার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

আচার্যদেব নানা নিবন্ধে কর্মের মাহাত্ম্যের কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন

এবং এই কর্ম দেহাবস্থানকালেই শেষ করা একান্ত কর্তব্য এ কথাও বারম্বার বলতেন। দেহপাত হয়ে গেলে কর্ম করা সম্ভব নয় এ কথা ভেবে দেহের এই মহত্ত্ব নয়, কিন্তু দেহপাতের পরও আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করার ক্ষেত্র বর্তমান। যে সিদ্ধভূমিতে দেহপাতের পর আরব্ধকর্ম সমাপ্ত করতে হয় সেখানে যা দীর্ঘকালে সম্পন্ন হয় লৌকিক দেহে সে অপেক্ষায় অল্প সময়ে কর্ম সমাপ্তি লাভ করে। এইজন্য লৌকিক দেহের এই মহত্ত্ব। মরদেহে কর্ম তীব্র সংবেগসম্পন্ন হয়, অমরদেহে নয়।

আচার্যদেব তাঁর গুরুদেবকে মহাখণ্ডযোগীরূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ভাব থেকে মহাভাবে উন্নীত হয়ে নাভিমার্গের ক্রিয়া কৌশলে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং পরমাপ্রকৃতির রাজ্যের দিকে গতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরমাপ্রকৃতির রাজ্যও তাঁর দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

এই পরমাপ্রকৃতির রাজ্য আনন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি স্থান এবং ঐ স্থানে কর্মের অবসান ও গতিরও অবসান। কিন্তু যাত্রার এখানেই শেষ নয়। এখানে গতি না থাকলেও গতি আছে। বিন্দাত্মক গতিই এখানে গতি। এই গতি হয় অন্তর্জগতে। এখানে বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশের ফলে কি হয় সে কথায় বলছেন, যখন অন্তর্মুখী গতিরও অবসান হয় তখন কর্মের অবসান এবং বিশ্বের অন্তরাত্মাও সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত। এর পর যা তা হল ব্রহ্ম—উহা অসঙ্গরূপে অনাসক্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান। কর্মদ্বারা উহার উপলব্ধি হয় না, মহালক্ষ্যরূপী যে সম্যক্ জ্ঞান তাহা দ্বারা উহার উপলব্ধি হয় না, ভক্তি ঐ স্থানে পোঁছে না। কোনো উপায়েই উহাকে আয়ত্ত করা যায় না। জীবের পুরুষকার উহাকে আপন করিতে পারে না এবং পরমাত্মার কৃপা দ্বারাও উহাকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এই ব্রহ্মবস্তুকে বোধের সঙ্গে আয়ত্ত করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

তিনি এই সাধনক্রমের আরও যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আবার উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

'অন্তর্গতির পর্যবসান হৃদয়ের মধ্যবিন্দুতে হইয়া থাকে। তারপর আর অন্তর্গতি থাকে না। ভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বাহ্যজগতের নিরোধ হইয়া যায় তেমনি মহাভব অথবা পরমাপ্রকৃতি ভেদ করার পর আন্তর জগৎও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন ভিতর ও বাহির এক হইয়া বা সমান হইয়া প্রকাশমান না হইলে অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা ধারণ করা সম্ভবপর হয় না।

এই প্রসঙ্গই অন্যভাবে আচার্যদেব বলতেন, বলতেন, পঞ্চদশী ষোড়শী সপ্তদশীর কথা। এই যে লক্ষ্য তার প্রথমটি পরাশক্তির রূপ। মহাশক্তি জগদম্বার পরমরূপ অখণ্ড ও স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য। একে সিদ্ধযোগিগণ সংবিৎ বা প্রতিভা বলে বর্ণনা করেন। উহা দেশ কাল ও আকারের দ্বারা অপরিচ্ছন্ন। একে আশ্রয় করে সমগ্র বিশ্ব ভাসমান হয়। তাঁর স্বাতন্ত্র্য হতেই সমগ্র বিশ্ব তাতে ফুটে ওঠে। বিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যা নিবৃত্তি হলে

অর্থাৎ যোগ অবস্থা প্রাপ্ত হলে ঐ সংবিৎরূপে তত্ত্ব দ্বৈতাকার বর্জিত কিম্বা নির্বিকল্পক রূপে প্রতিভাত হয়।

ভগবতী জগদম্বার পরম রূপ অখণ্ড একরস চৈতন্য, কিন্তু তাঁর অপর রূপও আছে। সে রূপ সাকার। যে পরম ধামে প্রধান অপর রূপ বিদ্যমান তাহা চিদাকাশের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান যেখানে নিরাকার সংবিৎই নিত্য যুগল রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহাই সৃষ্টির আদি ও তাহা বিশ্বের শিখরদেশে অবস্থিত। ইহাই শিব-শক্তির যুগলরূপ। এখানে যে শক্তির কথা বলা হল তাকে যোগিগণ পঞ্চদশী বলেন। কালচক্রের আবর্তনে অর্থাৎ মধ্যে বিন্দুকে রক্ষা করে কর্ম বা উপাসনা রূপ আবর্তন শেষ হলে বিন্দুতে প্রবেশ ঘটে। একে পঞ্চদশী প্রাপ্তি বলে। এর প্রাপ্তি ঘটলে আর আবর্তন থাকে না। পঞ্চদশী যুগলরূপ। এই যুগলরূপ হতে ক্রমশঃ অদ্বয় স্বরূপে যাওয়াই গুহ্য সাধনার ইতিহাস।

পঞ্চদশী কালের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও ক্রিয়াত্মক, কেননা কালের পঞ্চদশ কলা থেকেই ক্রিয়া ও পরিণাম সংঘটিত হয়। কিন্তু ষোড়শী যাকে নিষ্ক্রিয় ও অমৃতকলারূপে বর্ণনা করা হয় তা কালাতীত ও নিত্য স্থির। কিন্তু পঞ্চদশী ও ষোড়শী পূর্ণত্বের একদেশ মাত্র। কিন্তু যথার্থ পূর্ণত্ব যেখানে সেখানে অনন্ত ক্রিয়ার মধ্যে নিষ্ক্রিয়ত্ব অখণ্ডভাবে বিদ্যমান থাকে এবং যাহা নিষ্ক্রিয় তাহাই অনন্ত ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়। এ সময় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়ের কোনও বিরোধ থাকে না। এই স্থানে পূর্ণ হইতে নিরন্তর ক্ষরণ হইলেও অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা পূর্ণত্বই। সপ্তদশী অথবা কুমারী-তত্ত্বের ইহাই স্বরূপ।

মায়ার জগতে শক্তিসাধনার অন্তর্গতভাবে প্রেম পর্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত এ দুরূহ পথে কেহ বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কালের রাজ্যে থাকিয়া এবং কালের মর্যাদা রক্ষা করিয়া যতটা শক্তির অভিব্যক্তি সম্ভব ততটা অবশ্য হইয়াছে। কালের রাজ্যে কোন কোন মহাজন পঞ্চদশী এবং এমন কি ষোড়শী পর্যন্তও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সপ্তদশীর সন্ধান পান নাই।

এই সপ্তদশীর বর্ণনা প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলছেন, পঞ্চদশী কালরূপা, কিন্তু ষোড়শী কালাতীত অমৃতস্বরূপ এবং ইহাই পূর্ণত্বের স্বরূপ, তাই ইহা পূর্ণা, আবার ইহা রিক্তাও বটে। তাই ষোড়শীতেও পূর্ণত্ব আসে না। যেরূপ কলাবৃদ্ধি ক্রমে চন্দ্রে পূর্ণতা আসে সে পূর্ণতাও এক হিসাবে আপেক্ষিক, কেননা তাতে কলার ক্ষয় আছে, তাই তিনি রিক্তা। কিন্তু সপ্তদশীতে এই অভাব নেই। তা কিরূপ সে কথায় বলছেন ঃ কালচক্রে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রূপে যে দুইটি প্রান্তবিন্দুর অভিব্যক্তি হয় তাহার একীকরণের ফলে যাহা ফুটিয়া ওঠে তাহারই নাম সপ্তদশী। উহা পূর্ণাও বটে, রিক্তাও বটে, আবার পূর্ণাও নয়, রিক্তাও নয়। ইহার চারিটি কোটি আছে, কিন্তু

স্বরূপ অন্বয়—তাই ইহাকে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত বলা চলে। ইহা নিরাকার ও সাকার, সগুণ ও নির্গুণ, সকল ও নিষ্কল যাবতীয় বিরুদ্ধ ভাবেরই সমন্বয় স্বরূপ।

শৈব পরিভাষা নিয়া বলা যায় ষোড়শী শিবের শিবানী শক্তি, কিন্তু সপ্তদশী শিবের জননীস্বরূপা। বাস্তবিক পক্ষে ষোড়শী জীব ও জগদাত্মক সমগ্র বিশ্বের জননী এবং বিশ্বের জনক স্বয়ং শিব। কিন্তু সপ্তদশী শুধু জীব ও জগতের জননী নহেন। শিবেরও জননী। এঁকে অন্য স্থানে অখণ্ড মা রূপে বর্ণনা করেছেন, শিব পরমশিব অবস্থায়ই তাঁকে চিনতে পারেন, অথবা তাঁকে চিনতে পারলেই শিব পরমশিবরূপে পরিণত হন, তৎপূর্বে নহে। তিনি পরমা কুমারী—এক ও অদ্বিতীয়।

এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হল এটি পরাবস্থা, কিন্তু তারও পূর্বে অর্থাৎ পূর্ণসত্তায় প্রবেশ করার পূর্বে মহাকাল অবস্থা উত্তীর্ণ হতে হয়, তারপর পরপ্রমাতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ক্রমের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ আদিত্যের পর রুদ্রাবস্থা এবং রুদ্রের পর ভৈরব। ইহাই ক্রম। ভৈরবের যে রূপ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে তাহার নাম মহাকাল ভৈরব। কালে পরিণাম আছে এবং এই পরিণাম ইদংভাবকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। মহাকালে কালের পরিণাম নাই বটে কিন্তু ইদংভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। তারপর মহাকালও থাকে না। এটিই পরমসত্তা এখানে ইদংভাব নাই এবং পরিণামও নাই। সুতরাং কাল ও মহাকালের অতীত এই স্থিতি। প্রাসাদবিদ্যার ক্রিয়া নিঃশেষ হইয়া গেলে প্রতিযোগিহীন নিত্য কুমারীসত্তা থাকে। সপ্তদশী ইহারই নামান্তর। ইহা অদ্বৈতস্থিতি। এই অদ্বৈতস্থিতির পর প্রকৃত নির্বিকল্পস্থিতি আসিয়া পড়ে, যাহা এই অদ্বৈতস্থিতিরই পরিপক্কতম অবস্থা। কিন্তু সেই অদ্বৈত সত্তাও এক হিসাবে বিকল্পরূপে ভাসমান হয়। তাই পরাস্থিতি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত।

আচার্যদেব বলেছেন যে এই সপ্তদশীরূপিণী কুমারীই ব্রহ্মাতীত মা। তবে এই কুমারী যে ইচ্ছা শক্তিরূপা। সে কথা 'ইচ্ছাশক্তিরুমা কুমারী' এই প্রসিদ্ধ শিবসূত্রটিকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন এবং তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এই ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়ারূপ মূল ত্রিকোণের ইচ্ছা নয়, এ ইচ্ছা তারও উর্ধ্বে স্থিত। সংবিৎ রূপিণী ও মহাস্বাতন্ত্র্যময়ী যে ইচ্ছা ইহা সেই ইচ্ছা। একেই মহা ইচ্ছা বলা হইয়া থাকে। এই ইচ্ছার সঙ্গে যোগী যেদিন তাদাত্ম্যলাভ করেন সেদিন তিনি স্বয়ং পরমশিব স্বরূপ হন যেখানে ইচ্ছা তার স্বভাবের সঙ্গে অভিন্ন।

এই যে যাত্রার বিবরণ তা অখণ্ডযোগেই সম্ভব। খণ্ডযোগে শিবত্ব লাভ অবশ্য ঘটে। কিন্তু পরমশিবত্ব অখণ্ডযোগেই সম্ভব।

উপসংহার

আচার্যদেবের সাধন রহস্যের কথা এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা হল। এ বিষয়ে সবিস্তারে বলার অধিকার যাঁর তিনি আজ লোকচক্ষে তিরোহিত। এই সাধনার ক্রম কি এবং কিভাবে এই যোগ সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করে আপন করবে তা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

আমরা তাঁর অসংখ্য রচনা থেকে এবং তাঁর সান্নিধ্যে বসে যতটা জেনেছি এখানে সে সব অবলম্বন করে তাঁর সাধনা ও যোগের স্বল্প পরিচয় উপনিবন্ধ করেছি। তাঁর রচিত নিবন্ধসমূহে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার নানা অজ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্ব যেমন একদিকে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব সাধন-রহস্যও ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। কিন্তু ইঙ্গিত ইঙ্গিতই—রহস্য যেন প্রকাশের আলোয় ধরা পড়েই অকস্মাৎ ঢাকা পড়েছে, তিনি অতি সাবধানে পরমগোপন বস্তু সংগোপনে রক্ষা করেছেন। তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য চন্দ্রশেখর স্বামী যিনি আজ অকালে তিরোহিত হয়েছেন তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর মাধ্যমে প্রতিদিন তাঁর যাত্রার অগ্রগতির কথা আগ্রহে শুনতেন। চন্দ্রশেখর স্বামীজী প্রতিদিন যে 'বাণী' পেতেন তা আসত কোনো দিব্যস্তর থেকে। আচার্যদেব ঐ বাণীর নাম রেখেছিলেন 'গুরুবাণী'। ঐ বাণী আসত শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট থেকে। তাতে থাকত কিভাবে মহাপ্রকাশের অবতরণ ঘটছে নানা স্তর অতিক্রম করে। সে সব বিস্তীর্ণ ক্রমের বিবরণ এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে তার রহস্য কেবল আচার্যদেব স্বয়ং বুঝতে পারতেন।

আমরা শুধু শুনতাম, তাও তাঁর জীবনের শেষ দিকে। তাঁর আশার কথা। জগতে যে মঙ্গলময় পরিবর্তন আসন্ন সে কথা সরবে ঘোষণা করতেন। তিনি নিজে ছিলেন কৃপাশূন্য কর্মে ব্রতী—তাই নিজে কৃপার অবতরণের কোনো ইঙ্গিত নিজের অনুভবে লাভ করতে চাইতেন না বলেই চন্দ্রশেখরজী প্রভৃতির মাধ্যম লাভ করেছিলেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনি বলতেন—মহাপ্রকাশ ঘটবে তাঁরই মাধ্যমে। আমরাও সে আশা হৃদয়ে পোষণ করতাম। কিন্তু যাঁরা সন্দিগ্ধ তাঁরা বলতেন—শাস্ত্রে তো এমন কথা কোথাও নেই? সর্বমুক্তির মহাস্বপ্ন কি কখনো সম্ভব হবে?

এই ছিল তাঁদের সন্দেহের স্বরূপ। আচার্যদেব শাস্ত্রের কোনো প্রমাণ নিজ দৃঢ়বিশ্বাসের সমর্থনে বলতে চাইতেন না। শুধু বলতেন প্রাচীন ও নবীন মহাজনদের কথা। আর বলতেন নিষ্কাম কর্মের কথা। যাঁরা যুগ

যুগ ধরে নিষ্কাম কর্ম করেছেন ফলের কোনো আশা না রেখে তাঁদের কথা। তাঁদের মনে ফলের প্রতি কোনো কামনা না থাকলেও সে কর্ম তো মিথ্যে হতে পারে না, সে ফল দেবেই, বলতেন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যে ফল জগৎ কল্যাণে নিয়োজিত—তা কখনো ব্যর্থ হবে না, হতে পারে না।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষার কথা বলেছেনঃ 'কি যেন কি একটা মহাক্ষণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—একমাত্র সেই দিকেই সচেতন লক্ষ্য রহিয়াছে।'

তাঁর এই পরম অভীপ্সা তাঁকে জগৎ কল্যাণের পথে অগ্রসর করেছে এবং তাঁকে নানা সাধুজনের সন্নিধানে উপস্থিত করেছে। প্রথম জীবনে সাধু সন্দর্শন আরম্ভ হয়েছিল পরমার্থ-পথের ইঙ্গিত লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে। সেদিন সে পথ কোনো দূরে যাত্রার কথা হয়ত মনে করায়নি। সেদিন হয়ত মনে হয়েছে সে সব সাধু জীবনের পথও তো একটা পথ। তত্ত্বরূপী ভগবান্ এক ও অখণ্ড, তা সত্ত্বেও মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে খণ্ডভাবে তাঁকে ধারণা করার চেষ্টা করে। এ স্বাভাবিক, এজন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হবার পথও এত বিচিত্র.

সাধক ও যোগী চিরকাল সেই পথে চলেছে। তাঁদের সাধনার শেষে তাঁরা লাভ করেছেন নিজ নিজ সাধনার লক্ষ্য বস্তু। সে লক্ষ্য মোক্ষ বা ব্রাহ্মী-স্থিতি যাই হোক্ না কেন, সে তো ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত শান্তিলাভ থেকে বড়ো আদর্শ আচার্যদেবকে চালিত করেছে ভিন্ন পথে, যে পথ যোগ বা মহাযোগের। আমরা তার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পূর্বেও আলোচনা করেছি।

তিনি নিজ গুরুর বাণী অনুসরণ করে বলেছেন যে, জীব নিজ কর্ম বলে যতই উৎকর্ষ সম্পন্ন হোক না কেন কখনো জগৎ গুরু পদ লাভ করতে পারেন না। কর্ম বলে তিনি যে তত্ত্ব পর্যন্ত অধিগত করেন তারও গুরু তিনি হতে পারেন না। কিন্তু নিম্ন তত্ত্বে অবস্থিত হয়েও যদি জীবে মলপাক অথবা ভগবৎ কৃপাশক্তি লাভ ঘটে তাহলে তিনি সেই তত্ত্বে অবস্থিত হয়েও শিবভাবাপন্ন ও গুরুপদবাচ্য হতে পারেন। অভিমানমূলক কর্মের উৎকর্ষ অনুসারে তিনি যে স্তর পর্যন্ত নিজ অধিকারে আনতে পারেন তিনি তত দূর পর্যন্ত স্থিত জীববর্গের উদ্ধার সাধন করতে পারেন। কিন্তু এতেও তাঁকে কর্মে উৎকর্ষসম্পন্ন হতে হয় এবং সেই সঙ্গে ভগবৎ কৃপাশক্তির অধিকারীও হওয়া প্রয়োজন। কর্ম ও কৃপা এ দুয়ের মিলন না হলে তিনি সীমিত ক্ষেত্রেও জীবোদ্ধারে ব্রতী হতে পারেন না।

এখানে একটি গভীর রহস্য বর্তমান। অনন্তকাল ধরে বিশিষ্ট যোগী নিজ নিজ যোগ ও সাধন বলে কালরাজ্য অতিক্রম করে অখণ্ড পূর্ণ স্বরূপে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বে কালজগৎ পূর্ববৎ বর্তমান রয়েছে। আচার্যদেব যে ধারা ধরে চলেছিলেন তাতে উদ্দেশ্য ছিল গুরুশক্তির প্রভাবে

কালের নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তি কি ভাবে সম্ভব হতে পারে ক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় আমরা সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি।

এখন প্রশ্ন হল যোগী যখন কাল রাজ্য অতিক্রম করে পূর্ণ স্বরূপে প্রবেশ করেন এবং পূর্ণ ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদভাবাপন্ন হন তখন তাঁর পক্ষে ফিরে আসার উপায় কোথায়? তিনি যে স্থিতি গ্রহণ করেন সে স্থিতি থেকে অবতরণ তো সম্ভব নয়, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অখণ্ড যোগীর স্বপ্ন তো চিরকাল স্বপ্নই থাকে, সত্য বা বাস্তব হয়ে ওঠে না।

এ কথার উত্তরে আচার্যদেব বলেছেন: 'যোগী মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্নতা সম্পাদন করার পর এবং স্বয়ং মহাশক্তি স্বরূপ হয়ে মহাপ্রেম সাধনার জন্য অবতরণ করেন।' মহাপ্রকাশে প্রবেশ করেন না। তাঁর সম্মুখে তখন একটাই লক্ষ্য থাকে, সে লক্ষ্য হল তাঁর মহাশক্তি-সম্পন্ন-সত্তার সঙ্গে মহাপ্রেম-সিদ্ধ সত্তার মিলন এবং তারপর প্রাকৃত বিশ্বে অনুপ্রবেশ। কিন্তু তারও আগে মহাপ্রকাশে অনুপ্রবেশ প্রয়োজন। মহাশক্তি তখন ঐশ্বর্যময়ী হয়েও অনন্ত প্রেমময়ী ও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময়ী, তখন মহাপ্রকাশে প্রবেশ হলে তাতে বিলীন হবার আর কোন প্রশ্ন থাকে না। তখন তাতে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ থাকায় তিনি অনন্তরূপে অনন্তবৈচিত্র্যের লীলায় বিকশিত হয়ে ওঠেন। সমগ্র বিশ্ব তখন এক পরম অদ্বৈতে বিলসিত, কাল ও অভাব সে সময় চির অস্তগত।

আচার্যদেবের মনে যে ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ছবি ছিল তার একটা ইঙ্গিত হয়ত এতে মিলতে পারে ভেবে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে নিতে চাই। আচার্যদেবের তিরোধানের প্রায় তিন বছর আগে, ১৯৭৩ সালের কোনো সময়ে, তাঁর গুরুভাইয়ের পুত্র এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে তিনি কয়টি কথা সংক্ষেপে বলেছিলেন। তিনি কানাডাতে ছিলেন চার বছর। অ্যাডমিনিসট্রেটিভ ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডক্টরেট করে ফিরে এসেছেন দেশে। তিনি একটি সেবা প্রতিষ্ঠানে দীক্ষা নিয়ে তাতেই যোগ দেবেন—হবেন ত্যাগী সন্ন্যাসী। আচার্যদেবকে প্রণাম জানিয়ে চলে যাবেন সেবাব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করতে। তাঁর পিতা এ সংকল্পে প্রসন্ন নয় অথচ শিক্ষিত যুবক পুত্রকে বাধা দেওয়ার শক্তিও নেই। আচার্যদেব শুনে বললেন—দীক্ষা নেবে, ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা আছে। শ্রীগুরুদেব মা নবমুণ্ডীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আশ্রমে। যুগ যুগ ধরে যা কখনো হয়নি সংসারে নবমুণ্ডীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাবা তাই করতে চেয়েছিলেন। সে কাজ জগৎকল্যাণ। কালের জগৎ থেকে, বিধি নিয়ম, লোভ হিংসার ক্ষেত্র থেকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে বিশ্বকে সঞ্চালন করবেন বলেই তাঁর এই চেষ্টা। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে তাঁর জীবনকালে এসেছিলেন, তাঁরা এর তাৎপর্য সেদিন ধরতে পারেন নি। আজও দু-তিনজন অন্তরঙ্গ ছাড়া প্রেমের রাজ্যের কোনো খবরই কেউ রাখে না। এই প্রেম কি এবং এর অবতরণের ফলে কি পরিবর্তন সংঘটিত হবে তা এখনও বিস্তৃত করে বলার সময় আসেনি। তবে একথা স্পষ্ট করে তোমাকে

আশ্বস্ত করার জন্য বলি, যতটুকু আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, আর দেরী নেই। যাঁর মাধ্যমে এই ব্যাপার সংঘটিত হবে তাঁকে কেন্দ্র করে এই প্রেমের হবে পরম প্রকাশ। শুধু প্রতীক্ষা ও উন্মুখ হয়ে থাকাই হবে এখন জীবের পরম কর্তব্য।...যুগ যুগ ধরে অনেক জ্ঞানী যোগী এই প্রেমের পথকে উপেক্ষা করে মুক্তির আদর্শ বড় বলে মেনে সে পথে চলেছে। তাদের সে ধারণা মিথ্যা, একথা আমি বলি না। তাতেও সত্য আছে, আপেক্ষিক সত্য। নিরপেক্ষ সত্যকে পেতে হলে এই প্রেমের পথের ইংগিত চাই। তাকে পরম আপন ভেবে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করা চাই। যিনি পরম প্রেমে এই নশ্বর জগৎকে অবিনশ্বর দিব্য জ্যোতিতে ভরে তুলবেন তাঁকে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা—উজাড় করা ভালবাসার দ্বারা বরণ করে নিতে হবে। সে-ই তো পরম আপন এই ভাবটি হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

আমরা এই উপসংহারে আচার্যদেবের আলোচিত বিভিন্ন তত্ত্বের সার সংগ্রহ করে এখানে বলি তা সম্ভব নয় বলে তন্ত্র ও আগমের যে ধারা ও তত্ত্বক্রম তাঁকে সর্বদা দিব্য চমৎকার রসে আপ্লুত রাখত সে সব তত্ত্বের একটা বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

আচার্যদেব কাশ্মীর আগমের রহস্যবেত্তা মনস্বী রূপে সর্বত্র স্বীকৃত হলেও, তিনি শাক্তাদ্বৈত মতকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করতেন। তিনি মাতৃরূপিণী শক্তিরই জয়গান নিজ নানা নিবন্ধে করেছেন এবং পরিশেষে সমগ্র তত্ত্বের অতীত অথচ সবকে অংগীভূত করে বিরাজমানা আদিশক্তি কুমারীর স্থান নির্দেশ করেছেন। আমরা সাধনক্রমের আলোচনা প্রসংগে একথা বলেছি।

তাঁর বিস্তীর্ণ বিচার ধারায় ভারতীয় যোগ সম্বন্ধে যে সব পথ ও মত পরিজ্ঞাত আচার্যদেব পুংখানুপুংখ রূপে তার আলোচনা করেছেন। বৈষ্ণব সাধনা ও সহজিয়া সাধনার মৌলিক তাৎপর্য নির্ণয় করার প্রয়াসে তিনি ভাবসাধনা, রসসাধনা ও প্রেমসাধনার মর্ম অধিগত করে নিজ সাধনার পুষ্টির জন্য কিছু কিছু যে অংগীকারও যে না করেছেন তা নয়। তবে এ সব তাঁর স্বরূপে নিজ স্বভাবেই এসেছে। অভিনিবিষ্ট অনুসন্ধানী হয়ত তাঁর অখণ্ড যোগে বিভিন্ন মত ও পথের সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা কল্পনা করলে ভুল হবে যে আচার্যদেব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত ও সিদ্ধান্তের দ্বারা অবশ্য কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর দ্বারা বিধৃত এই যোগ অখণ্ড বলেই সব পরিচিত মত ও ধারণার সংগে এক ব্যাপক ও সর্বানুগামী সম্বন্ধের দ্বারা সম্পর্কিত। তাই কোথাও সাদৃশ্য থাকলেও কোনো মতের সংগে এ ধারা সদৃশ নয়, আবার কোথাও বিরোধ দেখা দিলেও সে বিরোধ আপাতদৃষ্টিতেই লক্ষিত হয়ে থাকে, মৌলিক বিরোধ কোথাও নেই।

আচার্যদেব অনুসন্ধানের যে দৃষ্টি দিয়ে কাশ্মীর শৈবাগম অধ্যয়ন করে-

ছেন এবং পাঠ দিতেন তাতে মনে হত এই-ই বুঝি আদর্শ। তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন সেকথা। শাম্ভব উপায়, শাক্ত উপায় ও আণব উপায় যে জীবকে একদিন শিববোধে জাগ্রত করে তিনি তাঁর অমূল্য প্রবচন সে কথা বার বার বলেছেন, আবার বলেছেন দীক্ষার মহত্ত্বের কথা, গুরু-কৃপার আবশ্যকতার কথা। এই কৃপা কিভাবে জীবে সঞ্চারিত হয়ে এবং বদ্ধ জীবকে শিব স্বরূপে উপনীত করে তারও প্রসঙ্গ কতভাবে বিভিন্ন মানুষকে, জিজ্ঞাসু ভক্তকে বলেছেন।

শাস্ত্রের নানা নিগূঢ় রহস্য তাঁর নিকট যেন একটি খোলা পটে আঁকা ছবি ছিল। বহু রহস্যের চাবিকাঠি তিনি পেয়েছিলেন, নিজ গভীর অধ্যয়ন ও মননে আবার বহু তত্ত্ব তাঁর স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে স্বতঃই প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর দর্শন শাস্ত্র পাঠ ও গবেষণা যদিও ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থান ধরে চলেছিল তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে, কিন্তু তা ক্রমশ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র উত্তীর্ণ হয়ে আগম ও শাক্তদর্শনে এসে বিশ্রান্ত হয়েছিল। দর্শন ও সাধনার সমন্বয় দেখেছিলেন কাশ্মীর শৈবাগমে, আবার শাক্ত অদ্বৈতবাদ গ্রন্থসমূহে তিনি পরাসংবিদ্ রূপিণীর তত্ত্ব হৃদয়ে গ্রহণ করে পরম প্রশান্তি লাভ করেছিলেন।

তাঁর নিজ সাধনার আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি একদিকে যেমন পরমশিবের প্রসঙ্গ এসেছে বার বার, আবার সেই সঙ্গে এসেছে পরাসংবিতের কথা। তাঁর মনে হয়েছে এ দুয়ের সমরসতা আসে কিভাবে এবং এলে কি হয়?

মনে হয়েছে শক্তিহীন শিব তো প্রকাশ মাত্র! আগমে ছত্রিশ তত্ত্বের অন্যতম এই তত্ত্বকে শিবতত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিবের অন্য নাম অনাশ্রিত শিব এবং একে বিশ্বোত্তীর্ণ প্রকাশ রূপে বর্ণনা করা হয়। তাঁকে আবার প্রমাতাও বলা হয়ে থাকে, তবে তিনি জীবপ্রমাতা নয়—শিবপ্রমাতা। প্রকাশমাত্রতা তাঁর স্বভাব এবং তাঁর প্রমেয়রূপ ভাববর্গও প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই প্রকাশ এক অখণ্ড মায়ের ভাষায় 'ঢালা আলো'। এই প্রকাশকে বিশ্ব যদি বলি তাহলে সে বিশ্ব শিবের স্বরূপ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। একেই আগম বিশ্বোত্তীর্ণ শিবরূপে বর্ণনা করে থাকে। এই স্থিতিতে পৃথক্‌ভাবে বিশ্বের কোনো ভান থাকে না বলে বিশ্ব তখন অব্যক্ত থাকে। এই স্থিতিই বিমর্শহীন শিবাবস্থা।

এই শিব স্বরূপে অনুষঙ্গী হয়ে আছেন শক্তি, যিনি চিদ্রূপিণী এবং শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ। এই শক্তি জগৎরূপে অথবা বিশ্বরূপে পরিণত হল না। অথচ তাঁর প্রসার ও সংকোচ ঘটে, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে শক্তি উন্মেষিত হয়ে বিশ্বরূপে ফুটে ওঠে আবার তার নিমেষ হয়, একটি স্থিত শান্ত দশা, অন্যটি উদিত। একবার অনন্ত অপার জলধির ন্যায় প্রকাশদর্পণে জগৎ প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে, আবার তা

বিলীন হয় তাতেই—তখন ফুটে ওঠে এক প্রশান্ত স্থিতি। যদি প্রশান্ত স্থিতিকে শিব বলি তাহলে তার যে অনন্ত বিলাসে ফুটে ওঠা তাকে বলি শক্তি। নিস্তরঙ্গ সিন্ধু যখন তরঙ্গিত হয়ে ওঠে তখন সেই তরঙ্গ যেমন শক্তি, যে সব ইনার ফোর্স যাকে আগম ইচ্ছা বলে তাও তেমনি শক্তি। আবার ইচ্ছারও পৃষ্ঠভূমিতে যে আনন্দ ও চিৎ তাও তেমনি শক্তি। যদিও শিব ও শক্তি অভিন্ন, তা সত্ত্বেও সৃষ্টির উন্মেষ এবং তার বিকশিত রূপকে যখন ধারণায় আনতে হয় তখন তন্ত্র দৃষ্টি অবলম্বন করে বলতে হয় যেন এই অভিন্ন স্থিতিতে দুটি ভাগের খেলা চলে। যেটি শিবাংশ তাকে নিষ্ক্রিয় স্বীকার করা হয় এবং তাকে সাক্ষী রূপে মেনে শক্তি অংশ পঞ্চকৃত্য সম্পন্ন করে।

আচার্যদেব তান্ত্রিক সাধনার রহস্যের কথা বলতে গিয়ে কিভাবে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় শক্তি ও শিব ব্যাপৃত রয়েছেন নানা নিবন্ধে আলোচনা করেছেন। সমগ্র সৃষ্টির পৃষ্ঠভূমিতে যে অনির্দেশ্য পরমসত্তা বর্তমান সেই তত্ত্বাতীত বস্তু যদিও বিচার করে হৃদয়গত করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে যতটা বিচার করা সম্ভব তাতে মনে হয় ঐ পরমবস্তু একদিকে যেমন প্রকাশরূপ অন্যদিকে তাই আবার বিমর্শময়। তিনি বলেছেনঃ স্বরূপ দৃষ্টিতে ইহা একপ্রকার পরব্রহ্ম ভাবেরই নামান্তর বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে ইহার স্বরূপভূত স্বাতন্ত্র্য বর্তমান আছে বলিয়া ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ। মহাশক্তি সর্বাতীত হইয়াও এবং পরমপদের সঙ্গে অভিন্ন ও পরমসাম্যে স্থিত হইয়াও স্বাতন্ত্র্য স্বরূপে নিজ বিলাসে নিত্য স্থিত। তাঁতে বৈষম্য না থাকিলেও অর্থাৎ তাহা ভগ্ন না হইয়াও ভগ্নের ন্যায় স্থিতির উদয় হয় এবং বৈষম্যের ফলস্বরূপে গৌণ ও মুখ্যরূপে ছত্রিশ তত্ত্বের উদয় হয়।'

আচার্যদেব মহাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে তান্ত্রিক দৃষ্টিতে জগদ্ ব্যাপারে দার্শনিক বিচার করেছেন। আবার নিজ সাধনতেও আগম ও তন্ত্র সাধনার সমন্বয় করার প্রয়াস করেছেন। তিনি দেখেছেন যোগী কিভাবে উন্মনা উত্তীর্ণ হয়ে মহাবিন্দু রূপে পূর্ণাহন্তা অবস্থায় উপনীত হন, কিন্তু সেখানেও তাঁকে শিবভাব ত্যাগ করে, বিন্দুকে শূন্যে পরিণত করে মহাশক্তি রূপে ধারণ করতে হয়। আবার রিক্ত এই অবস্থা থেকে পূর্ণ হয়ে উঠতে হয়, তার ফলে পরমশিবভাব প্রকটিত হয়ে ওঠে। এই যে মহাবিন্দুর রিক্ত ও পূর্ণ হয়ে ওঠা এ চলে নিরন্তর, কেননা শিবশক্তি দুই বিভিন্ন স্থিতি নয়। যে পরমচৈতন্য স্বরূপ দৃষ্টিতে পরমপদরূপে কোথাও কোথাও তিনি উল্লেখ করেছেন তা বস্তুতঃ পরম অদ্বয় সামরস্য স্বরূপ। তাহাই প্রকৃত জাগ্রৎ অবস্থা কিন্তু তাতে স্বাতন্ত্র্য বশতঃ আংশিকভাবে সুষুপ্তি আসে। চৈতন্যের স্বেচ্ছাগৃহীত এই সুষুপ্তভাব আভাসমাত্র, এবং এই আভাসময় সত্তার দুইয়ের প্রকাশ ঘটে যাদের একটিকে আচার্যদেব বিন্দু ও বিসর্গরূপে বর্ণনা করেছেন। একটি শিবভাব ও অপরটি শক্তিভাব, শিব বিন্দু এবং শক্তি বিসর্গ। বিন্দুই

আত্মপ্রসারণে বিসর্গভাব গ্রহণ করে আবার বিসর্গের অন্তর্মুখ গতির প্রভাবে তার বিন্দুরূপে স্থিতি ঘটে। এই খেলা চলে নিরন্তর। লীলা, ভাব ও অভাব সব স্তরই এই বিন্দু বিসর্গের খেলায় প্রকাশ পায়।

মায়ারাজ্যে অর্থাৎ যাকে তিনি অভাবের রাজ্য বলেছেন তা থেকে উদ্ধার লাভের পথ কোথায় ? তিনি দেখেছেন গুরুকৃপায় জীবে যখন চিৎশক্তির জাগরণ সম্পন্ন হয় তখন তা ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন হয়ে বিভিন্ন স্তর ভেদের মাত্রা অনুসারে জাগরণ অথবা চৈতন্য বিকাশ ঘটে, কিন্তু বিকাশ পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যোগী মহাচৈতন্য স্বরূপে স্থিতি লাভ করতে পারে না। তাই অভাবের জগৎ থেকে আধারের যোগ্যতা অনুসারে ভাবে প্রবেশ, লীলা-রসের আস্বাদন এবং পরিশেষে মহাভাব স্বরূপ লাভ হয় লীলায়িত স্বরূপে স্থিতি লাভ ঘটে। তিনি নিজে যেরূপে এই পথের বিবরণ নানা নিবন্ধে প্রকাশিত করেছেন আবার নিজ সাধনায় তা গ্রহণ করেছেন আমরা তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের বিবরণ প্রসংগে এ কথার উল্লেখ করেছি।

আচার্যদেবের লিখিত একখানি পত্র হঠাৎ আমাদের হাতে আসে। এ পত্র ১৯১৪ সালে লিখিত। তখন তাঁর বয়স অল্প কিন্তু তখনই তাঁর ভাবনায় পরমসাম্য লাভে উন্মুখতার যে ছবি ফুটে উঠেছে সে ছবি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এ চিঠিটি তাঁর অন্তরংগ পরিচয় বহন করে বলেই সর্বশেষে এই পুস্তকের ২০৭—২১০ পৃষ্ঠায় সংযোজিত হল। মূল পত্রখানির প্রথম তিন পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এবং চতুর্থ পৃষ্ঠা অস্পষ্ট থাকায় সেটি ছাপার হরফে মুদ্রিত হল।

আচার্যদেবের জীবন-কথায় ইতি টানতে গিয়ে একটি কথাই মনে আসে: সে কথাটি তাঁর নিজের সম্বন্ধে একটি উক্তি, বলেছেন: 'আমার জীবন কথা: অচিন্ত্য মহাশক্তির এক লীলা।'

সংযোজন

(১৩৬ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তির পর)

১৯৬১ সালে আচার্যদেবের শরীরে অস্ত্রোপচার হয় বম্বে-টাটা ক্যান্সার ইন্সিটিটিউটে। এই অস্ত্রোপচারের পর বিশ্রাম ও আরোগ্যলাভের জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় পুণায়। তিনি তখন শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের আশ্রমের অনতি দূরে একটি বাড়ীতে। আচার্যদেবের সঙ্গে সে সময় এবং তার সঙ্গে অনেক তত্ত্ব প্রসঙ্গ দিলীপবাবু করেছেন। আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে সে সব কথার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

দিলীপবাবু শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ও ভক্ত বলে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক বিচার ধারার সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় রাখতেন, তাই আচার্যদেবের অখণ্ড মহাযোগের সঙ্গে ঐ সিদ্ধান্তের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখতে পান। ফলে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উঠত। তিনি এ বিষয়ে অসংকোচে তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন করতেন। সে সব প্রশ্ন কি আমরা সে বিষয় উহ্য রেখে আচার্যদেব সম্বন্ধে তাঁর নিজ ধারণার কথাই এখানে বলছি।

১৯২৮ সালের কোনো সময়ে দিলীপবাবু প্রথম তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। তখন তাঁর আচার্যদেব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা অনেকটা এইরূপ।

'তাঁর পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিকতা, পুণ্যচরিত্র, বিবেক, বৈরাগ্য, বদান্যতা প্রভৃতি নানা গুণের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম—বিশেষ করে তাঁর অসামান্য বিনয় ও ঔদার্যের নানা কাহিনী। কাজেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।'

সেদিন ঐ দুজনে কি কথা হয়েছিল আমরা সে কথা না বলে আচার্যদেবের সাধনধারার অনুগামী কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। দিলীপবাবু বলেছেন: অবতরণকে কবিরাজ মহাশয় একদিন কেবলমাত্র 'ভাগবতী কৃপার সাধ্য' বলে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, শুধু যে কৃপা ছাড়া যথার্থ দিব্যজীবনলাভ অসম্ভব, তাই নয়—প্রতিপদে কৃপা এসে আমাদের নানা অশুদ্ধির মালিন্য মোচন করে বলেই আমরা সাধনায় অগ্রসর হতে পারি।'

আচার্যদেব প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে কোনো বিভেদ আছে বলে স্বীকার করতেন না। তিনি একটি পত্রে দিলীপবাবুকে লিখেছিলেন: 'মানবদেহধারী যোগীও যোগাবস্থাতে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারেন, অবশ্য ইহাও সেই মহাশক্তির কৃপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার ইহাও

বিবেচ্য—প্রাকৃত নিয়মের গণ্ডী কোথায় কে বলিবে? আজ যাহা অতিপ্রাকৃত বলিয়া মনে হয় কাল তাহা সকলে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতে পারে।'

আবার এই কথারই অনুবৃত্তি অন্য একটি চিঠিতে করেছেন, 'আমারও মনে হয় প্রকৃত মিরাক্ল হইতেছে মানুষের জীবনের পরিবর্তন, যে-পরিবর্তন মহা-করুণার ফলে কোনো মহামুহূর্তে অকস্মাৎ তাহার সমগ্র সত্তাকে রূপান্তরিত করে। কার্যকারণের শৃঙ্খলাতে উহা ধরা পড়ে না। অহেতুক কৃপার আকস্মিক উল্লাস ব্যতীত উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?'

আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁর নানা প্রসঙ্গ হত, চিঠিপত্রের যোগাযোগ তো ছিলই। শ্রীঅরবিন্দের সাধনধারা সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশ্বাস ছিল গভীর, কিন্তু আমরা সে প্রসঙ্গ না করে দিলীপবাবু তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার উল্লেখ করছি।

'তিনি অসুস্থ হয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন নিজের দেহে একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের পরে। কিন্তু দেহের দুঃখ তাঁর ভক্তিবিশ্বাসকে যেন চতুর্গুণ উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। কতবারই না তিনি আমাদের বলেছেন যে, দুঃখও ভগবানের করুণা, কেননা বেদনার ফলে চেতনার রূপান্তর হয়ই হয়—যদি সত্যি সত্যি বেদনাকেও আমরা ভগবানের করুণার বিধান বলে মেনে নিতে শিখি। আমার কাছে উদাহরণ দিয়েছিলেন সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসির। সেন্ট ফ্রান্সিস জীবজন্তু প্রভৃতি সবাইকে 'ভাই বোন' সম্বোধন করতেন...

দেহের দুঃখকে কীভাবে তিনি নিয়েছেন সত্যিই দেখবার জিনিস। কিন্তু শুধু দুঃখকেই নয়—গুরুকে, করুণাকে, অতীন্দ্রিয় নানা উপলব্ধিকে—জীবনের প্রতি পদেই তিনি বাহ্য ঘটনাকে দেখেছেন আন্তর আলোর যৌগিক প্রভায়। এই প্রজ্ঞা তাঁর অতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাধনায়। তাই তাঁর মধ্যে এসেছে পরমদীনতা ও অভীপ্সা—মনে হয় যেন কবচ-কুণ্ডলের মতনই তাঁর সহজাত।'

একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে আচার্যদেব কিভাবে নিজেকে উপস্থিত করেছেন তা পড়লে তাঁর সারাজীবনের একটি স্পষ্ট ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। চিঠিটি দিলীপবাবুকে লিখেছেন ৯ই জুন, ১৯৬০ সালে।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সস্নেহ অনুরোধ পাইলাম। আপনি আমাকে আপনাদের মন্দিরে একদিন কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি বক্তা নই, উপদেষ্টাও নই—অতি ক্ষুদ্র একজন শুশ্রূষু মাত্র। আমি কোথাও কিছু বলি না—সে-অভিমান কোনো দিনই আমার ছিল না। এখনও নাই। শক্তিও নাই। শুনিবার ইচ্ছা চিরদিনই ছিল—অবশ্য যদি শুনিবার মতন কথা হয়—এখনও আছে। তবে এখন সে-

ইচ্ছাও অতি ক্ষীণ ভাব ধারণ করিয়াছে। কি যেন একটা **মহাক্ষণের** প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে বসিয়া আছি—একমাত্র সেইদিকেই সচেতন লক্ষ্য রহিয়াছে। সেই **মহাক্ষণ**...যে কোন সময়ে ফুটিতে পারে। সন্ধিক্ষণ অখণ্ড মহাকালের মধ্যে যে কোনো মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে যখন বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সন্ধি ও সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। আশীর্বাদ করুন এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করুন যেন সেই **মহাক্ষণের** প্রকাশে আমি ধন্য হইয়া যাই। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের মহাসন্ধিরূপে সেই **মহাক্ষণ** পুরুষোত্তমের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।···কালের অতীত সর্বকালময় সেই মহাক্ষণেই যাত্রার অবসান ও একমাত্র বিশ্রাম।

কিন্তু সে-অবসানও অবসান নয়। সেই অবসানের মধ্যেই অসীম স্পন্দনের অভিনব লীলার প্রারম্ভ—যে লীলার অবসান নাই। তখন হয়ত বলার সময় আসিবে, বলাও হইবে। এখন 'স্তাবক' থাকিয়া সেই লক্ষ্যের প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছি।

কিছুই শিখিতে পারিলাম না। সুখদুঃখে উদাসীন হইতে শিখিলাম কই, মৈত্রীকরুণা মুদিতা উপেক্ষা রূপ ভাবনা চতুষ্টয়ের সাধনা করিতে শিখিলাম কই, নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে শিখিলাম কই? একমাত্র যা শিখিলে আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন থাকে না—ভালবাসার শিক্ষা—কই তাহাও ত এতদিনে শিখিতে পারিলাম না। হৃদয় বড়ই তরল হইয়া পড়িয়াছে, একটু সুখেই একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, একটু দুঃখের আঘাতেই নুইয়া পড়ে। ছোট জিনিষকে বড় করিয়া তোলে, বড় জিনিষকে ভুলিয়া যায়। কিছুরই স্বাভাবিক পরিমাণ ঠিক রাখিতে পারে না।

আলোচিত গ্রন্থসূচী

১· অমরবাণী ঃ প্রকাশক—আনন্দময়ী সংঘ, কাশী
২· অখণ্ড মহাযোগ ঃ ম· ম· গোপীনাথ কবিরাজ
৩· অখণ্ড মহাযোগের পথে ঃ ঐ
৪· আচার্যদেব রচিত দিনপঞ্জী ঃ অপ্রকাশিত
৫· আনন্দবার্তা ঃ প্রকাশক আনন্দময়ী সংঘ
৬· এক সংস্করণ—আচার্য নরেন্দ্রদেব ঃ ম· ম· গোপীনাথ কবিরাজ
৭· কাশী কী সারস্বত সাধনা ঃ ঐ
৮· তান্ত্রিক সাহিত্য ঃ ভূমিকা ঃ প্রকাশক ঃ উত্তরপ্রদেশ সরকার (হিন্দী সমিতি)
৯· তান্ত্রিক সংস্কৃতি ঃ প্রকাশক ঃ বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
১০· তান্ত্রিক বাঙ্‌মহ মে' শাক্তদৃষ্টি ঃ প্রকাশক ঃ বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্
১১· দিনপঞ্জী ঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১২· পত্র-প্রসাদ ঃ ডঃ শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
১৩· পরমার্থ প্রসঙ্গে (১ম—৩য় ভাগ) ঃ পশান্তী প্রকাশনী
১৪· পূজা ঃ শ্রীকৃষ্ণ সংঘ
১৫· ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা (১ম ও ২য় ভাগ) ঃ বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্
১৬· ভারতীয় সাধনার ধারা ঃ সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা
১৭· ভূমিকা কিরণাবলী ভাস্কর ঃ ভূমিকা ম· ম· গোপীনাথ কবিরাজ
১৮· ঐ কুসুমাঞ্জলি বোধনী ঃ ঐ
১৯· ঐ ত্রিপুরা রহস্যম্ ঃ ঐ
২০· ঐ যোগিনীহৃদয়ম্ ঃ ঐ
২১· ঐ বিম্বংচরিত পঞ্চকম ঃ ঐ
২২· মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ অভিনন্দন গ্রন্থ
২৩· মনীষী কী লোকযাত্রা ঃ ড· ভগবতীপ্রসাদ সিংহ
২৪· Mother as seen by Her devotees : Anandamayi Sangha
২৫· Bibliography : Nyaya Vaisesika Literature
২৬· Saraswati Bhawan Studies : Sanskrit College, Varanasi
২৭· বিশুদ্ধ বাক্যামৃত ঃ ম· ম· গোপীনাথ কবিরাজ
২৮· বিশুদ্ধবাণী ঃ ঐ
২৯· বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ ঃ ঐ
৩০· যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ঃ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত
৩১· সাহিত্য চিন্তা ঃ ম· ম· গোপীনাথ কবিরাজ
৩২· সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ঃ ঐ
৩৩· স্বসংবেদন (১ম ও ২য়) ঃ ঐ

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ		শুদ্ধরূপ
আচার্যদেবের	পৃঃ ২	আচার্যদেবের মাতামহের
জানতন	পৃঃ ৩০	জানতেন
সচীব	পৃঃ ৩৪	সচিব
উইনভিস	পৃঃ ৬৮	উইনডিস
প্রাসংগতকা	পৃঃ ৬৮	প্রাসংগিকতা
আমার	পৃঃ ১৭০	আমরা
অতিপ্রকৃত	পৃঃ ১৭২	অতিপ্রাকৃত
যাত্রারূঢ়	পৃঃ ১৮৩	যন্ত্রারূঢ়